একক 1 ❑ বাঙালি জাতির উদ্ভব বাংলা ভাষার উদ্ভব

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য
1.2 প্রস্তাবনা
1.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস
1.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
1.5 অনুশীলনী 1
1.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) বাংলা ভাষার উদ্ভব
1.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
1.8 অনুশীলনী 2
1.9 উত্তর সংকেত
1.10 গ্রন্থপঞ্জি

1.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে পাঠ করলে আপনি বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকদের মতামত জানতে পারবেন এবং বাংলা ভাষা কিভাবে সৃষ্টি হ'ল তার রূপ-রেখাটি স্পষ্ট ধরতে পারবেন।

1.2 প্রস্তাবনা

এই একক পাঠে বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ঐতিহাসিক, গবেষক ও ভাষাবিদ্‌গণের মূল্যবান তথ্যাদি জেনে উভয় বিষয় সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হবে তার সাহায্যে আপনি দু'টি বিষয়েই নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

1.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে বাঙালি জাতির বাসস্থানের সীমারেখা নিম্নরূপ চিহ্নিত করেছেন—

উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য, উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারকা পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণসমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্চর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—এই ভূখণ্ডেই ঐতিহাসিকগণের মতে বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং কর্ম-ধর্ম-নর্মভূমি।

গবেষক ও বিশিষ্ট সমালোচকের বক্তব্য থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি, শুধু পশ্চিমবাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই বাঙালি জাতির বসবাস নয়। এই দুই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আসামের গোয়ালপাড়া, কাছাড়, বিহারের পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলও প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইতিহাসের গতিপথে বহুবার রাজনৈতিক কারণে বাংলার সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। সুপ্রাচীন এই দেশের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত, বৈদিক ধর্মসূত্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। আর্যভূমির প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত বঙ্গভূমির প্রাচীনতম স্বীকৃতি রয়েছে 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে। আর্যদের গ্রন্থে ও সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' শব্দটি আছে। 'বঙ্গ' শব্দটির অর্থ নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। অনেকের মতে এই শব্দটির মূলে ছিল চীন-তিব্বতীগোষ্ঠীর শব্দ এবং শব্দটির 'অং' অংশের সঙ্গে গঙ্গা, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদী নামের 'অং' অংশের মিল দেখে অনুমান ভিত্তিক 'বঙ্গ' শব্দের মৌলিক অর্থ 'জলাভূমি' ধরেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সঙ্গে মৌলিক অর্থটির সামঞ্জস্য আছে। 'বঙ্গ' শব্দ ঋগ্বেদে নেই—আছে 'ঐতরেয় আরণ্য'কে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশের নাম জাতিনাম থেকে এসেছে। যেমন 'বঙ্গ' থেকে 'বঙ্গদেশ' 'বগধ' থেকে 'মগধ' হয়েছে। অস্ট্রিক শ্রেণীভুক্ত কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল এদেশে। এদের প্রিয় দেবতার নাম 'বোঙ্গা'। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই 'বোঙ্গা' শব্দ থেকেই 'বঙ্গ' শব্দের উদ্ভব। 'বঙ্গ' শব্দজাত বিশেষণরূপে 'বঙ্গাল' শব্দটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। অনেকের ধারণা 'বঙ্গ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, এর সঙ্গে 'আল' প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে 'বঙ্গাল' হয়েছে। নদীমাতৃক, কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে নদী ও সমুদ্রের জল যাতে জমির ধান নষ্ট করতে না পারে তার জন্য বড় বড় 'আল' বা বাঁধ দেওয়া হ'ত। এই কারণেই বঙ্গ + আল = 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল' হয়েছে। কিন্তু ড. সুকুমার সেন 'বঙ্গাল' শব্দটিকে অর্বাচীন বলে চিহ্নিত করে 'রাখাল' ' গোয়াল' ' ঘোষাল' 'সাঁওতাল' ইত্যাদির মত 'পাল' অন্তক সমাস নিষ্পন্ন শব্দের তদ্ভব রূপ হিসেবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে প্রাচীন বঙ্গদেশের নানা অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন উত্তরবঙ্গ-পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ-রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণবঙ্গ -সমতট ও হরিকেল এবং পূর্ববঙ্গ বঙ্গালা। উত্তরপ্রদেশের এক হুগালিপিতে 'বঙ্গ পাল' অধিচ্ছত্রার রাজারূপে পাওয়া যায়। 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে 'গৌড় বঙ্গাল' কথাটির উল্লেখ আছে। বৌধায়নের 'ধর্মসূত্রে' লিখিত আছে—'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ। তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কারমর্হতি'। এই সমস্ত স্থানে তীর্থ যাত্রা ছাড়া গমন করতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। বিজয়ী আর্যজাতি এই সব অঞ্চলের মানুষদের সম্পর্কে নানা কটূক্তি করেছে। জৈনগ্রন্থে এমনকী মহাভারতেও এরূপ ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখা যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশ ও সেন-বর্মণ রাজবংশের কালে রচিত সাহিত্য, শিলালিপি ও সরকারি প্রমাণপত্রে 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। মোগল আমলে 'বঙ্গ'-পৃথক সুবা রূপে চিহ্নিত হয়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে 'বঙ্গাল' শব্দের উল্লেখ আছে। পালবংশের রাজত্বকালে বাঙালি জাতি পৃথক জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বাঙালি জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করলে যে সত্যটি ধরা পড়ে তা হ'ল নৃতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালি, আর্য ব্যতিরিক্ত অস্ট্রিয়, কোল, মোঙ্গল রক্তপ্রবাহের বিচিত্র সংকর। ফলে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেও প্রত্যন্তবাসী—'বঙ্গে'র জনগণ নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা আর্য সংস্কৃতিকে

পরিবর্তিত করে এক 'মিশ্র সংস্কৃতি' গড়ে তোলে। এই সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই 'বঙ্গ' 'গৌড়' 'বঙ্গাল' নামে ভূখণ্ডের অধিবাসীরাই বাঙালি জাতিরূপে চিহ্নিত এবং মিশ্র শোণিত বাঙালি জাতি আপন স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হ'য়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

1.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস আপনি পাঠ করলেন। আসুন, এখন আমরা দেখি আলোচ্য অংশে—এ সম্পর্কে মূল তথ্যাদি কি আছে।

মূলপাঠে বাঙালি জাতির বাসস্থানের ভৌগোলিক বিবরণ আছে। এ সম্পর্কে গবেষকদের বক্তব্যও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। উত্তরে হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাঙালির ধর্ম-কর্ম ধারা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবাংলা ও অধুনা বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিহার, আসামের বিভিন্ন অঞ্চলও বাঙালি জাতির কর্মধারার সাক্ষ্য বহন করছে। এই সব অঞ্চল প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের সীমানা বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে বাংলাদেশের নাম পাওয়া যায়। 'বঙ্গ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। 'বঙ্গ' শব্দজাত—'বঙ্গাল' শব্দের অর্থও নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলার জনজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস অনুসন্ধান করলে যে সত্যটি ধরা পড়ে তা হ'ল আর্য-জাতি ভিন্ন দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়-অস্ট্রিক জাতির মিশ্রণেই আদি বাঙালি জাতির উৎপত্তি। নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালি—মিশ্র জাতি।

1.5 অনুশীলনী 1

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর দানের পর 14 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. 'বঙ্গ' শব্দটির উদ্ভব ও প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষকদের মতামত আলোচনা করুন।
2. নিম্নের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য 3টি উত্তর থেকে বেছে (✓) টিক চিহ্ন দিন এবং এককের শেষে দেওয়া 14 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।
   (ক) কোন্ কোন্ জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে?
      (1) আর্য ও অনার্য জাতির মিশ্রণে
      (2) আর্য ও দ্রাবিড় জাতির মিলনে
      (3) দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়-অস্ট্রিক জাতির মিশ্রণে
   (খ) বাঙালি জাতিকে কি জাতীয় বলে চিহ্নিত করা যায়? সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দিন।
      (1) মিশ্র জাতি
      (2) মৌলিক বা অবিমিশ্র জাতি

(গ) বাঙালি জাতি পৃথক জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে—

(1) মোগল আমলে

(2) সেন রাজাদের সময়

(3) পাল রাজত্বকালে

(4) গুপ্তযুগে

3. নিম্নের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ ক(ন।

(ক) 'বঙ্গ'কে পৃথক সুবারূপে চিহ্নি(ত করা যায়.....।

(খ) 'বঙ্গাল' শব্দটির উল্লেখ আছে.....।

(গ) 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক.....।

(ঘ) 'গৌড়-বঙ্গাল' কথাটির উল্লেখ..... গ্রন্থে আছে।

4. নীচের প্র(গুলির সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য 3টি উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্((✓) দিন। উত্তর শেষে এই এককের 14 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) 'বোঙ্গা দেবতা' প্রিয় ছিল—
(1) আর্য জাতির
(2) দ্রাবিড় জাতির
(3) অস্ট্রিক জাতির

(খ) 'বঙ্গাল' শব্দটি ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়—
(1) একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে
(2) মধ্যযুগে
(3) আধুনিক কালে

(গ) 'বঙ্গপাল' নামটি পাওয়া যায়—
(1) অজন্তায়
(2) উত্তরপ্রদেশের এক গুহালিপিতে
(3) বৌদ্ধবিহারে

1.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষার উৎস ও যুগবিভাগ

সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত সমস্ত ভাষাকে যে কয়েকটি ভাষাবংশে বর্গীকৃত (Classification) করা হয়েছে তাদের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য-ভাষাবংশটি নানা কারণে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা। তবে বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষা-বংশ থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই জন্ম নেয়নি। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন এবং ত্র(মবিকাশের ধারায় মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর পেরিয়ে বাংলা ভাষা জন্মলাভ করেছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দশটি শাখায় ভাগ হ'য়ে যায়, তাদের মধ্যে 'আর্য' নামে নিজেদের অভিহিত করে ইন্দো-ইরানীর ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী। এই ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি আবার দুটি শাখায় ভাগ হ'য়ে যায়—(1) ইরানীয় এবং (2) ভারতীয়। ভারতীয় আর্য উপশাখাটি ভারতে

প্রবেশ করে আনুমানিক 1500 খ্রিঃ পূঃ। সেই দিন থেকে ভারতীয় আর্য ভাষার সূচনা এবং আজ পর্যন্ত এই আর্য ভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করে চলেছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের এই বিবর্তনের স্তরভেদকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়।

(1) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (O.I.A.) আনুমানিক 1500 খ্রিঃ পূঃ — 600 খ্রিঃ পূঃ

(2) মধ্য ভারতীয় আর্য (M.I.A.) আনুমানিক 600 খ্রিঃ পূঃ—900 খ্রিঃ

(3) নব্য ভারতীয় আর্য (N.I.A.) আনুমানিক 900 খ্রিঃ—আধুনিক কাল পর্যন্ত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ ছিল। (1) সাহিত্যিক বা ছান্দস্ ভাষা এবং (2) কথ্যভাষা। কথ্য রূপটির চারটি আঞ্চলিক রূপ দেখা যায়। সেগুলি হলো—(ক) প্রাচ্য, (খ) উদীচ্য, (গ) মধ্যদেশীয়, (ঘ) দাি(ণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে সাধারণ পরিবর্তন লাভ করে যখন প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল, তখন থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ সূচিত হ'ল। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে চারটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্য রূপগুলি থেকে প্রাকৃতের এই কথ্য উপভাষাগুলির জন্ম অনুমান করা হয়। এই ভাবে (ক) প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা প্রাকৃত এবং প্রাচ্য-মধ্যাপ্রাকৃত। (খ) উদীচ্য থেকে উত্তর পশ্চিমা প্রাকৃত। (গ) মধ্যদেশীয় ও দাি(ণাত্য থেকে পশ্চিমা বা দি(ণ-পশ্চিমা প্রাকৃত।

প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যখন প্রবেশ করল, তখন মূলত এই চার রকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচ রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হ'ল। যেমন

(ক) উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত থেকে পৈশাচী প্রাকৃত। (খ) পশ্চিমা বা দি(ণ পশ্চিমা প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রিক প্রাকৃত। (গ) প্রাচ্যা প্রাকৃত থেকে—মাগধী প্রাকৃত। (ঘ) প্রাচ্য-মধ্যাপ্রাকৃত থেকে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত। পৈশাচী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত।

প্রাকৃতের তৃতীয় স্তরে এই সব সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় প্রাকৃতের কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হল। এই অপভ্রংশের শেষ স্তরে এলো অবহট্ঠ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাকৃত থেকে সেই স্তরের অপভ্রংশ অবহট্ঠের জন্ম। এ ভাবেই মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠের জন্ম।

অপভ্রংশ-অবহট্ঠের পর ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করল। সময়কাল আনুমানিক 900 খ্রিঃ। এই সময় এক একটি অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করল। মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি ভাষার জন্ম হ'ল।

সাধারণের ধারণা হ'ল সংস্কৃত থেকে বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষার জন্ম। এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ সংস্কৃত হ'ল বৈদিকের পরবর্তী একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ভাষার বিভিন্ন কথ্য রূপকে অবলম্বন করে বৈয়াকরণ পাণিনি যে শিষ্টরূপ নির্দিষ্ট করেন, সেই শিষ্ট বা সংস্কৃত রূপটিই 'সংস্কৃত' ভাষা নামে পরিচিত। ফলে কথ্যভাষার মতো তার কোনো বিবর্তন হয়নি এবং তা থেকে কোনো ভাষার জন্মও হয়নি। বস্তুত কথ্য বৈদিকের বিবর্তন ধারার মধ্যবর্তী স্তর হয়ে বাংলা প্রভৃতি আর্য-ভাষাগুলির জন্ম। সুতরাং বাংলা ভাষার অব্যবহিত জন্ম-উৎস কথ্য বৈদিক ভাষাকে বলা যায় না। ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ-অবহট্ঠই হ'ল নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অব্যবহিত উৎস। এর মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

তবে বাংলা ভাষার উৎস যে স্থানীয় মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠে লিখিত তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি অনেক (ে ত্রেই কল্পনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্ম-উৎসকে নিম্নোত্ত(চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

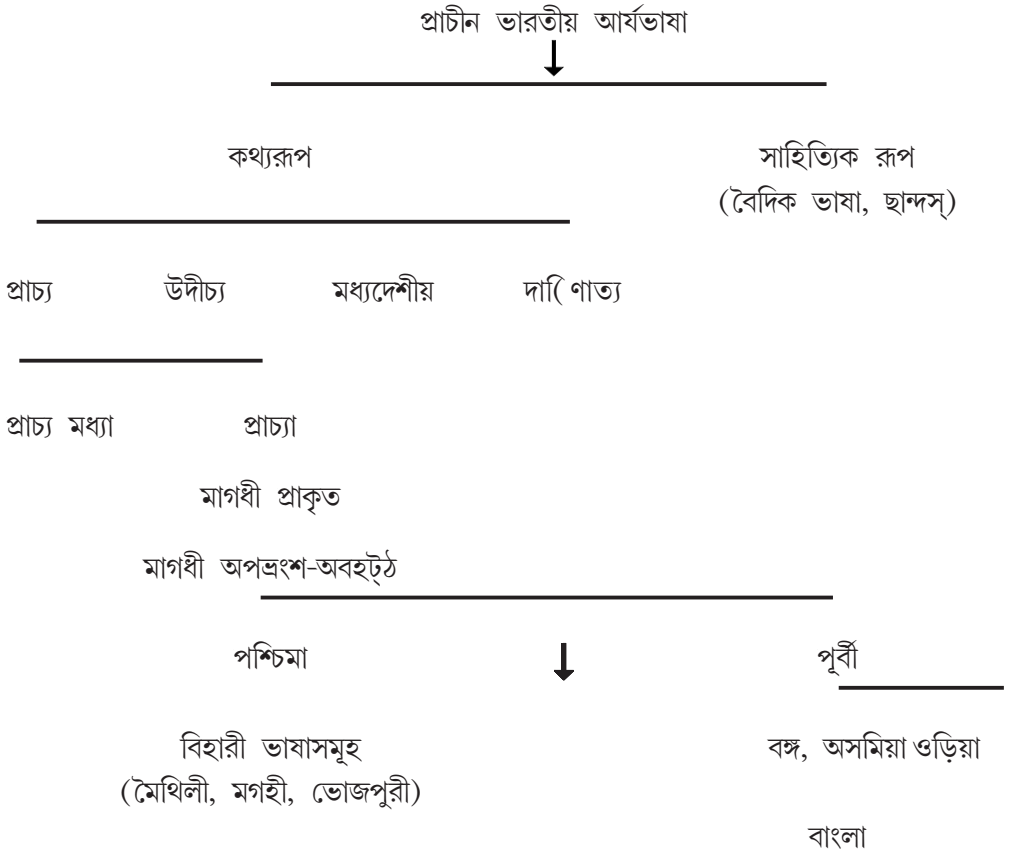

1.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা—বাংলাভাষা। এই ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—নানা বিবর্তনের পথ ধরে মাগধী-অপভ্রংশের পূর্বধারা অর্থাৎ 'পূর্ব মাগধী' থেকেই নবম-দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। এই ভাষা পালবংশীয় রাজাদের আমলেই সৃষ্টি হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরে পৌঁছায়। এই স্তরই হ'ল—নন ভারতীয় আর্যভাষার উৎস।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষা 10টি শাখায় ভাগ হয়। এদের মধ্যে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের 'আর্য' নামে চিহ্নি(ত করে। এরা দুটি ভাগে বিভত্ত(। একটির নাম 'ভারতীয় আর্য'। এই 'ভারতীয় আর্য' উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক 1500 খ্রিঃ পূর্বাব্দে। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এই

আর্য ভাষা নানা পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলে। বিবর্তনের স্তর অনুসারে (১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য, (২) মধ্য ভারতীয় আর্য, (৩) নব্য ভারতীয় আর্য—এই তিনটি যুগে আর্য ভাষা বিভক্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় সাহিত্যিক ও কথ্য—এই রূপ পাওয়া যায়। কথ্য ভাষা চারটি আঞ্চলিক রূপ নেয়। লোকমুখে এই ভাষা প্রাকৃত রূপ গ্রহণ করে। এই প্রাকৃত ভাষা প্রথমে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা এবং দ্বিতীয় স্তরে সাহিত্যিক ভাষার জন্ম দেয়। পরে প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম। এই স্তরের মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

1.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক ( ) চিহ্ন দিয়ে দেখান। 14 পৃষ্ঠার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি ভাষা।	☐	☐
(খ) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সময় আনুমানিক 600 খ্রিঃ পূর্ব—900 খ্রিস্টাব্দ।	☐	☐
(গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুই রূপ।	☐	☐
(ঘ) প্রাচ্যা প্রাকৃত থেকে মাগধী প্রাকৃতের জন্ম।	☐	☐
(ঙ) ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ।	☐	☐
(চ) বাংলা ভাষার উদ্ভব শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে।	☐	☐

2. নিম্নের কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য তিনটি উত্তর থেকে বেছে টিক ( ) চিহ্ন দিন। উত্তর করার পর এককের শেষে দেওয়া 14 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত থেকে জন্ম—	1. মাগধী প্রাকৃত
	2. পৈশাচী প্রাকৃত
	3. শৌরসেনী প্রাকৃত
(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কাল—	1. আনুমানিক 900 খ্রিস্টাব্দ
	2. আনুমানিক 600 খ্রিঃ পূর্ব—900 খ্রিস্টাব্দ
	3. আনুমানিক 1500 খ্রিঃ পূর্ব—600 খ্রিঃ পূর্ব
(গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার 'কথ্য ভাষার' আঞ্চলিক রূপ ছিল—	1. দু'টি
	2. তিনটি
	3. চারটি
(ঘ) বাংলা ভাষার জন্ম—	1. পৈশাচী প্রাকৃত থেকে
	2. মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে
	3. মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে

1.9 উত্তর সংকেত

1.5 অনুশীলনী 1

1. কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির প্রিয় দেবতার নাম—'বোঙ্গা'। ঐতিহাসিকদের মতে এই 'বোঙ্গা' শব্দ থেকেই 'বঙ্গ' শব্দের উদ্ভব।
2. (ক) 1, (খ) 1, (গ) 3।
3. (ক) মোগল আমলে।
   (খ) আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।
   (গ) ড. নীহাররঞ্জন রায়।
   (ঘ) মান মোল্লাস গ্রন্থে।
4. (ক) 3, (খ) 1, (গ) 2

1.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল।
2. (ক) 2, (খ) 3, (গ) 3।

1.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ড. সুকুমার সেন।
2. ভাষার ইতিবৃত্ত ড. সুকুমার সেন।
3. বাঙলা ভাষা পরিত্র(মা পরেশচন্দ্র মজুমদার।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ড. ভূদেব চৌধুরী।
5. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
6. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
7. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. ে(ত্র গুপ্ত।

একক 2❑ বাঙালির লেখা সংস্কৃত—অপভ্রংশ কবিতা ও চর্যাপদ

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য
2.2 প্রস্তাবনা
2.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
2.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
2.5 অনুশীলনী 1
2.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
2.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
2.8 অনুশীলনী 2
2.9 উত্তর সংকেত
2.10 গ্রন্থপঞ্জি

2.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাঙালি সংস্কৃত ও অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষায় যা যা লিখেছিলেন তার পরিচয় পাবেন। এই সব লেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের বিস্তৃত তথ্যাদি জানতে পারবেন।

2.2 প্রস্তাবনা

প্রাক্ তুর্কী বিজয় যুগে সংস্কৃতে লেখা অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, শরণ-ধোয়ী-গোবর্ধন—উমাপতি ধরের কাব্য-কবিতা, জয়দেবের গীত গোবিন্দ, প্রাকৃত পৈঙ্গল, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ও সদুক্তি(কর্ণামৃত ইত্যাদির মধ্যে আর্য ব্রাহ্মণ্য ও অনার্য অব্রাহ্মণ্য—বাংলার এই পৃথক দুই ধারার মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি বয়ে চলেছিল তার রূপরেখা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। অবহট্‌ঠ ভাষায় লিখিত প্রাকৃত পৈঙ্গলে বীর রসাত্মক ও প্রেমবিষয়ক ছড়ার মধ্যে ভাষামাধুর্য ল(ণীয়। প্রেম ও প্রকৃতির একাত্মতায় সমৃদ্ধ। চর্যাপদে—রূপকের মোড়কে গীতিধর্মী মূর্ছনায় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধন সংগীতগুলি সমৃদ্ধ। ধর্মমত, সমাজজীবন চিত্র, সাহিত্যিক মূল্য, ভাষাগত বি(-ষণের মধ্য দিয়ে চর্যাপদের নানাদিক উদঘাটিত হয়েছে।

2.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

আদিযুগে উন্মেষপর্বের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বাঙালির সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টিসম্ভার সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। এই সময় বাংলা ভাষার প্রথম উদ্ভব ঘটেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই ভাষাকে সাহিত্যরচনার উপযুক্ত(ভাষা বলে গ্রহণ করেননি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত(উপরতলার মানুষ বিশেষ করে

রাজসভাকবি ও শি(ত সমাজ ভাষাকেই উপযোগী মনে করেছেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছিল—তা বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা শক্তি(শালী হয়ে রাধাকৃষে(র লীলাসংগীত, অনুবাদসাহিত্য, সাধনগীতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তবে এই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবার (ে ত্রে বাঙালির লেখা সংস্কৃত-অপভ্রংশ রচনার অবদান রয়েছে। নিম্নে এই শ্রেণীর সৃষ্টির সং(প্ত আলোচনা করা হ'ল।

পাল-সেন বংশের রাজত্বকালে অনুশাসন ও স্তম্ভলিপিতে ছোট ছোট প্রশস্তিমূলক কবিতার সন্ধান মেলে। পাল রাজাদের আমলে বিশিষ্ট কবি অভিনন্দ দেবপালের সভাকবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে 'রামচরিত' লেখেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুখে নয়, কবি হনুমানের মুখে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীও পাল রাজাদের সভাকবি ছিলেন। তিনিও 'রামচরিত' কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনায় কাব্যিক সুষমা ও কলা-কৌশলের নিদর্শন আছে। রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের তথ্যাদি মিশ্রিত করে কাব্যের (ে-াকগুলি রচিত। দ্ব্যর্থবোধক (ে-াকগুলিতে কবির লেখনী-দ(তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধোয়ীর প্রধান কাব্য 'পবনদূত'। মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য 'মেঘদূতম্'-এর ছন্দ-আদর্শে এটি রচিত। এছাড়া কবির 20টি (ে-াক—শ্রীধর দাস সংকলিত 'সদুক্তি(কর্ণামৃত'-এ পাওয়া যায়।

উমাপতি ধর—তিন পু(ষ ধরে সেন রাজাদের রাজমন্ত্রী ছিলেন বলেই তাঁর হাতে একাধিক রাজার প্রশস্তি প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের পূর্ববঙ্গে পলায়নের পর তিনি তুর্কী-রাজাদেরও স্তুতিমূলক (ে-াক রচনা করেছেন। শৃঙ্গাররসের বাড়াবাড়ি থাকলেও তাঁর লেখায় কবিচিত গুণাবলি দেখা যায়। শ্রীধর দাসের সদুক্তি(কর্ণামৃতে উমাপতি ধরের 91টি (ে-াক আছে। কাব্যসৃষ্টিতে কবির শব্দচেতনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জয়দেব—কবি জয়দেবের সঙ্গে সেন-রাজসভার নিবিড় যোগ ছিল। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'গীতগোবিন্দ' 24টি সংস্কৃত পদ—সংস্কৃত (ে-াকের দ্বারা গ্রথিত। রাধা-কৃষ(-দূতী এই তিন পাত্র-পাত্রীর সংগীত-সংলাপে কাব্যখানি রচিত। প্রাচীন লোকপ্রচলিত নাট-গীতির আদর্শে এটি রচিত। জয়দেব সংস্কৃত কাব্য-ভাষাকে প্রাকৃত ছন্দের সাহায্য নিয়ে গীতগোবিন্দ রচনা করেছেন। এছাড়া পদরন্ধের (ে ত্রেও কবি সংস্কৃত রীতির (ে-াকের বদলে বাঙলা ও অপভ্রংশের আদর্শে—কাব্যখানিতে ভিন্ন স্বাদ এনেছেন। তাঁর কাব্য—প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নব্য সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। অলৌকিক দেব-কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক প্রেমের সার্থক সমন্বয় এই কাব্যে আছে।—এই সমন্বয়ের ওপর দাঁড়িয়েই মধ্যযুগে গড়ে ওঠে মানবিক মূল্যবোধ। 'সদুক্তি(কর্ণামৃতে' জয়দেবের 31টি (ে-াক যুক্ত(আছে।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়— এই গ্রন্থে 111 জন কবির 525টি (ে-াক আছে। সর্বভারতীয় কবিদের সঙ্গে বহু বাঙালি কবির কবিতাও এতে সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে গৌড়-অভিনন্দ, ধর্মকর, বিনয়দেব, শুভংকর প্রমুখ কবি আছেন। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীবনছন্দের জীবন্ত চিত্র এতে আছে। এছাড়া 'ব্রজলীলা'কে কেন্দ্র করেও কয়েকটি (ে-াক রচিত হয়েছে—যার মধ্যে পরবর্তী বৈষ(ব-কাব্যধারার সেতুসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

সদুক্তি(কর্ণামৃত—শ্রীধর দাস 1206 খ্রিস্টাব্দে এই (ে-াকগ্রন্থ সংকলন করেন। 485 জন কবির লেখা

(-াক এতে আছে। মোট (-াকের সংখ্যা দুই হাজার তিনশ'র বেশি। এই সংকলনে 80 জন বাঙালি কবির কবিতা আছে। এঁদের মধ্যে মহানিধি কুমার, কল্প দত্ত, ইন্দ্রদেব, শ্রীধর নন্দী, ঈ(ের ভদ্র, বসুসেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।—রাজসভার শৃঙ্গার রসের আধিক্য ও প্রশস্তির ভিড়ের মধ্যেও বাংলাদেশের বর্ণাঢ্য প্রকৃতি ও জীবনলীলার চিত্র সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কতকগুলি (-াকে বীররসের অভিসিঞ্চন আছে।

প্রাকৃত পৈঙ্গল—প্রাকৃত পৈঙ্গল ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ। ড. সুকুমার সেন এই গ্রন্থকে "মূলতঃ প্রাচীন বাঙালা অথবা বাঙালার ঠিক পূর্ববর্তী অপভ্রংশ" বলে চিহ্নি(ত করেছেন। গ্রন্থটি চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সংকলিত হলেও এতে নবম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বহু কবিতাও আছে। বীররসের পাশাপাশি প্রেমের মধুররসের ধারাও বহমান।

প্রেম-বিষয়ক ছড়ার দৃষ্টান্ত—

"সোমহ কন্তা
দূরদিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চলাএ।।"

(আমার সে কান্ত এখন দূরদিগন্তে, প্রাবৃট আসে, চিত্ত হয় চঞ্চল।)

রাধা-কৃষে(র প্রেমলীলার পাশাপাশি বইটির একটি (-াকে হর-পার্বতীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পারিবারিক চিত্রও আছে। প্রেম ও প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধনে এবং ভাষামাধুর্যে কবিতাগুলি যেমন শ্রুতিমধুর তেমন হৃদয়স্পর্শী। এই গ্রন্থখানিই একমাত্র অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষায় লিখিত। বাকি সব গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

2.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

সংস্কৃতে লেখা পাল রাজাদের সভাকবি অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী রামায়ণ গ্রন্থ অবলম্বনে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অভিনন্দের রামচরিত দেবী মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। তবে সে মাহাত্ম্য কীর্তন রামচন্দ্রের পূজার মাধ্যমে নয়—হনুমানের মুখে স্তবের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' রামায়ণের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সমকালের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের (-াকগুলি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। 'সদুক্তি(কর্ণামৃত' কুড়িটি (-াকের সংকলন গ্রন্থ। ধোয়ীর 'পবনদূত'—কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের আদর্শে রচিত। চিত্র-সৌন্দর্য ও কল্পনামাধুর্যে গ্রন্থখানি ভরা। সেন রাজাদের নিয়ে উমাপতি ধর প্রশস্তি কাব্য রচনা করেছেন। সদুক্তি(কর্ণামৃতে লেখকের 91টি (-াক আছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'—রাধা-কৃষ(ও দূতী এই তিন পাত্র-পাত্রীর সংগীত-সংলাপে প্রাণবন্ত। রাধা-কৃষ(কে কেন্দ্র করে এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নব্য সাহিত্যের সেতুবন্ধন করেছেন জয়দেব। অলৌকিক দেব কাহিনীকে কবি লৌকিক প্রেমগাথার সঙ্গে সার্থকভাবে একাত্ম করে তুলে ধরেছেন। দুই ঐতিহ্যের সমন্বয়ে জয়দেবের সৃষ্টি দৃষ্টি আকর্ষণীয়। 'কবিন্দ্রবচনসমুচ্চয়' 'সদুক্তি(কর্ণামৃত'-সংস্কৃত খণ্ড (-াকের প্রাচীন সংকলন গ্রন্থের দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীবনছন্দের পাশাপাশি যুদ্ধাদির বর্ণনাও আছে। কৃষ(লীলা-সম্পর্কিত (-াকগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। অবহট্ঠ ভাষায় রচিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' কবিতা সংকলনে বীররসের

পাশাপাশি প্রেমমাধুর্যও ছড়িয়ে আছে। রাধাকৃষে(র প্রেমলীলার সঙ্গে একটি ে(-াকে হর-পার্বতীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পারিবারিক চিত্রও আছে।

2.5 অনুশীলনী 1

1. নীচের দেওয়া তথ্যগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্(দিয়ে চিহ্নি(ত ক(ন।

	ঠিক	ভুল
(ক) উমাপতি ধরের সদুক্তি(কর্ণামৃতে 91টি ে(-াক আছে।	☐	☐
(খ) জয়দেবের সঙ্গে সেন রাজাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না।	☐	☐
(গ) জয়দেবের কাব্যখানি প্রাচীন নাট-গীতির আদর্শে রচিত।	☐	☐
(ঘ) প্রাচীনতার দিক থেকে শ্রীধর দাসের ে(-াক সংকলন গ্রন্থ প্রথম।	☐	☐
(ঙ) কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে 111 জন কবির 525টি ে(-াক আছে।	☐	☐
(চ) প্রাকৃত-পৈঙ্গল সংস্কৃত ভাষায় লেখা।	☐	☐

2. মূলপাঠ গভীরভাবে পাঠ করে সংে(পে নিম্নের টীকাগুলি নিজের ভাষায় লিখুন।
   প্রাকৃত-পৈঙ্গল, গীতগোবিন্দ, রামচরিত, সদুক্তি(কর্ণামৃত।

2.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়

ভূমিকা সাহিত্য গবেষকদের মতে শুধু বাংলা ভাষা নয়—সমগ্র পূর্ব ভারতের নব্য ভাষার প্রথম গ্রন্থ হ'ল—'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। আদিযুগের ধর্মপ্রধান বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ চিহ্নি(ত। বাংলা ভাষায় রচিত বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থাদির মধ্যে এটি যে প্রাচীনতম গ্রন্থ এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 1907 সালে নেপাল রাজদরবারে পুঁথি সংগ্রহশালায় তিনখানি দোঁহাগ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথির সঙ্গে টীকাকার মুনি দত্তের সংস্কৃত টীকা ছিল। এই টীকার সাহায্যেই পরবর্তিকালে বৌদ্ধ-সহজিয়া-সিদ্ধাচার্যদের রহস্যময় ভাষায় লেখা পদগুলির গূঢ় অর্থ উদ্ধার কিছুটা সহজ হয়েছে।

1916 সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে নিজের সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নামে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', সরহবজ্রের দোঁহা, কৃষ(াচার্যের দোঁহা এবং ডাকার্ণব—এই চারখানি পুঁথি একত্রে প্রকাশ করেন। তবে এই চারখানি গ্রন্থের মধ্যে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'-এর ভাষা প্রাচীনতম বাংলার নিদর্শনরূপে বিশিষ্ট ভাষাবিদ্গণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অপর গ্রন্থগুলি অপভ্রংশ-অবহট্ঠে রচিত।

গ্রন্থ-পরিচয় চর্যা সংগ্রহটিতে মোট 51টি পদ ছিল। তার মধ্যে মুণি দত্ত একটি পদের ব্যাখ্যা করেননি। এ ছাড়া পুঁথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ অর্থাৎ 24,

25 এবং 48 সংখ্যা পদ পাওয়া যায়নি। আর 23 সংখ্যক পদের শেষাংশ খণ্ডিত। এর ফলে মুণি দত্তের সংস্কৃত টীকা অনুসারে মোট 50টি পদ-এর সাড়ে ছেঁচল্লিশটি পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তিকালে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ গ্রন্থ থেকে টীকাকারের বাদ দেওয়া পদটির পরিচয় উদ্ধার করেন। তবে চর্যাপদের মূল পুঁথিতে 24টি বিভিন্ন ভণিতায় লিখিত $46^{1}/_{2}$ পদের পরিচয় আমরা পাই। মোট 24 জন কবির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া গেলেও ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে পদগুলির ভণিতা অনুযায়ী পদকর্তাকে চিহ্নিত করা সঠিক নয়। তাঁদের মতে কেউ কেউ গুরুর ভণিতা দিয়েছেন। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নামের সঙ্গে গৌরবসূচক 'পা'-এর যোগে। কতকগুলি স্পষ্টতই ছদ্মনাম বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ কুক্কুরী(বীণা, তন্ত্রী, ডোম্বী, তাড়ক, কঙ্কণ, শবর ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। তাড়ক, কঙ্কণ—অলংকারের নাম আর 'তন্ত্রী' অর্থাৎ 'তাঁতি' জাতি নামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মোট যে 24 জন সিদ্ধাচার্য্যের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে লুইপাদ দু'টি, ভুসুকুপাদ আটটি, কাহ্নপাদ তেরোটি, সরহপাদ চারটি এবং শান্তিদেব ও শহরপাদ দু'টি করে পদ রচনা করেছেন। অন্যান্য কবি-সাধকগণের একটি করে পদ আছে। তাঁদের কয়েকজনের নাম—বিরুআ, চাটিল, কামলি, কঙ্কণ, ডোম্বী, শবর প্রমুখ। মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে শান্তিদেব, ভুসুকু এবং রাউতু একই ব্যক্তি(ছিলেন। ড. সুকুমার সেন লুইপাদ ও মীননাথকে একই ব্যক্তি(রূপে চিহ্নিত করেছেন।

শ্রীযুক্ত(রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বত থেকে তালপাতার পুঁথিতে কয়েকজন নূতন কবির চর্যাগীতি এবং চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের পরিচিত দু-একটি চর্যাগীতির পাঠান্তরও পেয়েছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের পুঁথিতে বিনয়শ্রী, সরহ, অবধূ—এই তিনজন নূতন কবির নাম পাওয়া যায়। তবে নবাবিষ্কৃত এই পদসমূহের ভাষা অর্বাচীন এবং প্রাচীন চর্যাপদের রূপ ও রূপকের অন্ধ অনুকরণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই পদগুলি প্রাচীন চর্যাগীতিকারদের পরবর্তিকালে রচিত।

চর্যার ভাষা চর্যাপদের ভাষারীতি রহস্যময়। গ্রন্থখানি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত হ'লেও, আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চর্যাপদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করে প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এর রচনাকাল দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। সংকলনের প্রথম পদকর্তা 'লুইপাদ'—দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পদের ভাষা দেখেও মনে হয়, এ ভাষা দশম শতাব্দীর অথবা তার সামান্য পূর্ব সময়ের। মাগধী-অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার যে মুহূর্তে জন্ম হয় ঠিক সেই মুহূর্তের অপরিণত ভাষায় সিদ্ধাচার্যগণ সহজিয়াপন্থীদের জন্য এই পদগুলি লিখেছেন। চর্যাপদের ভাষার ভিত্তিমূলে মাগধী-অপভ্রংশ থেকে জাত প্রাচীন বাংলা থাকলেও এতে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব ল(্য করা যায়। তবে চর্যাপদের বেশিরভাগ শব্দই যে মাগধী-অপভ্রংশজাত এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। শৌরসেনী-অপভ্রংশ ছিল সর্বভারতীয় গণ-সাহিত্য রচনার সাধারণ মাধ্যম। এই ধারার প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই চর্যাপদের ভাষাতেও দেখা যায়। তবে চর্যার ভাষায় এমন কতকগুলি 'শব্দ' ও 'ব্যবহার' পাওয়া গেছে যার দ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যায় এইসব 'শব্দ' ও 'ব্যবহার' একমাত্র বাংলা ভাষাতেই সম্ভব। এইজন্যই ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা ভাষার 'আদিসুরী'—বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে চর্যার ভাষা 'বঙ্গালী' না 'রাঢ়ী' এ নিয়েও মতভেদ আছে। মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যার 49 নং পদে— "বাজনাবপাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ" চরণের 'পঁউআ' খালকে বর্তমানের মহানদী বা 'পদ্মানদী'র আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। 'ভুসুকুপাদ'কে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বিক্র(মপুরের লোক বলে

চিহি(ত করেছেন। এ ছাড়া ভুসুকু'র একাধিক পদে 'বঙ্গালী' শব্দটির ওপরও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদ মূলত পশ্চিমবঙ্গের অর্থাৎ 'রাঢ়ী' উপভাষার ওপর নির্ভর করেই রচিত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো—কতক অন্ধকার। কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। অর্থাৎ হেঁয়ালি ভাষা। কিন্তু কোথাও কোথাও টীকাতে 'সন্ধ্যা' ভাষা বলা হয়েছে। 'সন্ধ্যা' শব্দটি সম-ধ্যৈ ধাতু থেকে এসেছে—যার অর্থ—সম্যকরূপে ধ্যান করে বোঝা। দুর্বোধ্য-রহস্যময় হেঁয়ালি এই 'সন্ধ্যা ভাষা'র মর্মার্থ দুর্বোধ্যই থেকে যেত, যদি না মুণি দত্তের টীকা পাওয়া যেত। সহজিয়া বৌদ্ধদের বিরোধী গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও অন্যান্য প্রতিকূল শক্তি(র তী্ম দৃষ্টি থেকে সহজিয়া বৌদ্ধদের গূঢ় ধর্মাচারকে বাঁচাতেই সিদ্ধাচার্যগণ এইরূপ অস্পষ্ট—কুহেলিকাচ্ছন্ন ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চর্যার ভাষাগত দিকটি অনুধাবনের জন্য নিম্নে 15 নং পদাংশ তুলে ধরা হ'ল।

"বাম দাহিন দোবাটা ছাড়ী শান্তি বুল থেউ সংকেলি উ
ঘটনাগুমা ঘড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাই উ।।"

[বাম-ডানের দুই পথই বাদ দিয়ে (সোজা পথে) শান্তি কেলি করে ফিরছে—এই পথে ঘাট-তৃণ-গুল্ম কিছুই নেই, চোখ বন্ধ করে সোজা চলে যাও।]

এই ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্যই উড়িয়া ও মৈথিল ভাষিগণ চর্যা সাহিত্যের দাবিদার হয়েছেন। তবে ভাষাবিদ্‌গণ তত্ত্ব-তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, চর্যাপদ বাংলার ও বাঙালির সম্পদ। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নেই।

ছন্দ চর্যাপদে মোটামুটি তিন রকমের ছন্দ পাওয়া যায়। অধিকাংশই 16 মাত্রার 'চৌ পাই' ছন্দে লেখা। বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের আদি নিদর্শন এর মধ্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—

= – x x x x – x x – –
কাঅ/ত(বর/পঞ্চবি/ডাল।
– x x – – x x – – –
চঞ্চল/চীত্র/পইঠো/কাল।।　　　　১নং চর্যা
[x=১ মাত্রা(–= দুই মাত্রা বা দীর্ঘ মাত্রা]

পয়ার ছন্দের পূর্বে প্রাকৃত প্রভাবিত মাত্রা প্রধান পাদাকুলক ছন্দের নিদর্শন এটি। চর্যার সব পদই এই ছন্দে রচিত। এই ছন্দে প্রতিটি চরণে 16 মাত্রা থাকে। চর্যার প্রতিটি চরণ প্রধানত চারটি ভাগে বিন্যস্ত। মাত্রা প্রধান ছন্দ থেকে বাংলা ছন্দে যখন অ(র প্রাধান্য পায়—তখনই 16 মাত্রার পরিবর্তে 14 অ(রের পয়ারের সৃষ্টি। এই জাতীয় পয়ারের উৎস চর্যাপদ।

ধর্মমত চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধন-সংকেতই রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যখন নানা আবর্ত সৃষ্টি হয়, তখনই রহস্যময় সাধন পদ্ধতি মহাযান বৌদ্ধধর্ম সাধনার বিবর্তিত রূপ সহজযান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। হীনযানী দার্শনিক মতবাদ র(ণশীল ছিল। শূন্যতাময় নির্বাণ লাভ ছিল হীনযানীদের মূল ল(্য। মহাযানী সাধন পন্থার আদর্শ ছিল বুদ্ধত্ব লাভ অর্থাৎ বোধি-চিত্তের অধিকার লাভ। এই মতবাদে উদারতা ও ব্যক্তি(প্রাধান্য দেখা যায়। মতবাদটি জনপ্রিয় হলেও এর মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার শিথিলতা দেখা দেওয়ায় মহাযান মতবাদ

বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি হয়। বজ্রযানের পরবর্তী স্তরটিই হ'ল সহজযান। বজ্রযানীদের মতো মন্ত্র-তন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বি(্বাস ছিল না। গু(নির্দেশিত গুহ্যপথ ধরে কায়া-সাধনার ব্যক্তি(গত মুক্তি(ও সিদ্ধির প্রতিই এঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সহজিয়া কবিগণ বেদ-পুরাণ-ধর্মাচারের নিন্দা করলেও তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ধর্মমত-বিদ্বেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোথাও প্রকাশ পায়নি। কোনো কোনো পণ্ডিত চর্যাপদে তীব্র ধর্ম বিদ্বেষের উল্লেখ করে 10 নং পদের—

"নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছই ছই যাই সো ব্রাহ্মণ-নাড়িআ।" অংশটিতে

'নাড়িয়া' অর্থাৎ 'নেড়ে' শব্দটির মধ্যে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষের চিহ্(দেখতে পেয়েছেন। তবে সম্পূর্ণ পদটি গভীরভাবে পাঠ করলে দেখা যায় কাহ(পাদ এই পদটিতে আন্তর-সাধনার গভীর বাসনাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

লুইপাদের 22 নং চর্যাপদে দেখা যায়—

"জাহের বাণ চিহ্(রূপ ণ জানী
সো কই সে আগম-বেএঁ বখানী।।"

("যার বর্ণ চিহ্(কিছুই জানা যায় না, বেদ—আগম দ্বারা তার ব্যাখ্যা হবে কি করে?") এই পদেও বেদ-আগমের প্রতি উপে(ার চেয়ে কবির তন্ময়-মন্ময় চিত্তের অনির্বচনীয়তা বিশেষভাবে তুলে ধরার দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং বলা যায় সহজযানী ভাবনায় পর-ধর্ম বিদ্বেষ কোথাও প্রকাশ পায়নি। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, আনন্দ-বেদনার তালে তালে বহমান বাস্তব জীবনের জরা-মরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র(পেরিয়ে নির্বাণ লাভই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এই পথেরই পথিক। তবে মূল ল(্য পৌঁছাতে তাঁরা নির্বাণলাভের জন্য গূঢ়-তান্ত্রিক-আচার-আচরণের কথাই চর্যাপদে বলেছেন।

চর্যার সাহিত্যিক রূপরেখা ভাব জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় মিলন সাধনই প্রকৃত সাহিত্যের মূল ল(্য। চর্যা গীতিকারগণও তাঁদের অন্তরের গভীর উপলব্ধিজাত সম্পদকে সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। সহজিয়া সাধকগণ সাধন-ভজনের তত্ত্বকথা বললেও তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে কবি প্রতিভার স্বা(র রেখেছেন। চর্যায় তত্ত্বের কূল ছাপিয়ে তত্ত্বগত উপলব্ধির আনন্দই প্রাধান্য পেয়েছে। লোক-জীবনের সাধারণ-ভাষায় সমাজচিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে সহজিয়া তত্ত্বকে সার্বিক রূপ দিয়েছেন। এক কথায় চর্যাপদে সত্য ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। ভাষা, শব্দ ও রূপ নির্মিতিতে চর্যাকারগণ দ(ছিলেন। দুরূহ দার্শনিকতা ও রহস্যময়-আচার-আচরণকে তাঁরা কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করেছেন। ভুসুকু পাদের—

"ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।।"

27 নং চর্যার এই পদাংশে মহাখুসলীলার যে বার্তা ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃত সাহিত্যের পরিবেশ—পরিমণ্ডল। সিদ্ধাচার্যগণ তন্ময়চিত্তের অনুভূতিকে সকলের গ্রহণীয় করে তুলতেই বাস্তব জীবনের পটভূমিকে গ্রহণ করেছেন। স্বচ্ছ-স্বাভাবিক জীবনের ভাষায় ডোম-ডোমনির জীবনচিত্র—নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌকাবাওয়া, সাঁকো তৈরি, চ্যাঙ্গাড়ী বোনা, 'তুলোধুনা', নাচ-গান, শবর-শবরীর অনন্ত প্রেম ইত্যাদি

চিত্রের মাধ্যমে গূঢ় ধর্ম-সংকেতকে কবিগণ আভাসে-ইঙ্গিতে তুলির টানে ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন। রূপকের মধ্য দিয়ে ধর্ম সংকেতকে প্রকাশ করেছেন। নানা শব্দের মালা গেঁথে, যমক, ে(-য, অনুপ্রাস, রূপক ইত্যাদি নানা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সাহায্যে বাস্তব জীবন ও ব্যক্তি(গত জীবনানুভূতিকে সার্থকভাবে রূপদান করেছেন। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ভিত্তিভূমিতে বাস্তব-জীবনমুখী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা গীতি কবিতার মিষ্টিক-অনুভূতির কাব্যধর্মও চর্যাপদে আছে। এর বাক্-বিন্যাস ও ছন্দরীতি বহু স্থানেই বর্তমান যুগের কবিতাকে স্মরণ করায়।

সমাজ চিত্র বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অন্তরের গভীরতায় ধর্মের নিবিড় উপলব্ধিকে পেতে চেয়েছেন। এই অমূর্ত উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা যে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন—তার উপাদান সাধক কবিগণ সংগ্রহ করেছেন লোক জীবন থেকে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন্ত চিত্র এতে ধরা পড়েছে। ভুসুকুপাদের (49 নং পদে) রূপকের মোড়কে বাংলাদেশের বিখ্যাত নদী পদ্মা ও নৌ-সৈন্য অথবা জলদস্যুদের লুণ্ঠনের চিত্র আছে।

"বাজ-ণাব-পাড়া পঁইআ খাঁলে বাহি উ
অদয় দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।
আজি ভুসু[কু] বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।"

[বজ্র নৌবাহিনী পদ্মার খালে বয়ে চলল। নিষ্ঠুরভাবে ডাকাত দেশ লুঠ করল। আজ তুই ভুসুকু বংগালী হ'লি, নিজ ঘরনি চণ্ডালের দ্বারা অপহৃত হ'ল।]

ডোম-ডোমনির নৌকা বাওয়া, নদী-নালার বুকে সেতু ইত্যাদির চিত্রও চর্যাপদে আছে। কিছু পদে নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীব(ডাকাতি ইত্যাদির মধ্যে নদী ও নৌকা প্রসঙ্গ দেখা যায়। 5 সংখ্যক পদে চাটিল পাদ বলেছেন—

"ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী
দু আন্তে চিখিল-মাঝে ন থাহী।।"

ভুসুকুপাদের একটি পদে হরিণ শিকারের বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পদেই কবি বলেছেন—

"আপনা মাংসে হরিণা বৈরী"

সেকালের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চিত্র ঢেন্ন পাদের গানে—

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।" অংশে জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

পেটের জ্বালায় কেউ কেউ পদ্মের ডাঁটা খেয়ে (ুধা নিবৃত্ত করত। কেউ বা অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হ'ত। চুরির ভয়ে গৃহস্থের ঘরে তালা লাগানোর কথাও আছে। সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। অস্পৃশ্য অন্ত্যজশ্রেণীর বাস ছিল নগরের বাইরে, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা নগরে বাস করত। সবর পদের ভণিতাযুক্ত(28 নং পদে দেখা যায়—

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।"

[উঁচু উঁচু পর্বত— সেখানে বাস করে শবরী বালিকা] শবরদের উপজীবিকা ছিল হরিণ শিকার। ডোমজাতি বেত বা বাঁশের ধামা, কুলো তৈরি করে কিংবা খেয়া-নৌকার মাঝিগিরি করত। তবে এ ব্যাপারে ডোমনিরা

ছিল পারদর্শিণী। এদের কেউ কেউ নৃত্যবিদ্যায় নিপুণা ছিল। সমাজের সচ্ছল পরিবারের বিবাহাদি ধূমধাম করে হ'ত। বাসরঘরে মেয়েরা বরকে ঘিরে হাস্য-রসের প্লাবন বইয়ে দিত সারারাত ধরে। অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কার্পাসের চাষ হ'ত, এই কার্পাস দিয়ে বস্ত্র ও মাদুর তৈরি হ'ত। কাঠের নৌকা ছিল। জলপথে নৌকাই ছিল একমাত্র সম্বল। খেয়া পারাপারের জন্য কড়ি লাগত। জলপথ ও স্থলপথে দস্যুদের আত্র(মণ ঘটতো। নানা স্থানে শুল্ক সংগ্রহকারীদের উপদ্রবও ছিল। শান্তির(কদের উৎপীড়নের দৃষ্টান্তও আছে। হাঁড়ি, ঘড়া, গাড়ু ইত্যাদি ব্যবহৃত হ'ত। ধার্মিক লোক পুঁথি পড়ত, পূজা করত, মালাও জপত। নাচ, গান ও নাটকাদির অভিনয় হ'ত। কাহ(পাদের একটি পদে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

"একসো পদুমা চৌসঠ্ঠী পাখুড়ী।
তাই, চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।"

সাধক কবি চৌষট্টি পাঁপড়ির এক পদ্মফুলের ওপরে বাউলি ডোম্বীর অপূর্ব নৃত্যলীলার রূপটি কল্পনা করেছেন। 'বুদ্ধ নাটক' অভিনয়ের কথাও আছে। 'হে(য়াবীণা' অর্থাৎ এক জাতীয় একতারা বাজিয়ে একশ্রেণীর গায়ক গান গেয়ে বেড়াত।

মেয়েরা আয়না, কাঁকন, মুক্ত(াহার, কুন্তল ব্যবহার করত। দাবা খেলার প্রচলন ছিল। ধনী ব্যক্তি(রা খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেতো। মদ্যপানের রেওয়াজও ছিল।

চর্যাপদে বৃহত্তর বাংলাদেশের আদি মৃত্তিকাশ্রয়ী নরগোষ্ঠীর জীবনচিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে কামনা-বাসনাকীর্ণ পারিবারিক জীবনপ্রবাহ—অন্যদিকে আদিবাসী অস্ট্রিক জীবন চিত্র শবর-শবরীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এদের নারীসমাজের স্বাধীন বিচরণের স্পষ্ট চিত্রও আছে। ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জাফুলের মালায় সাজসজ্জার কথাও আছে। বিবাহ উৎসবে নানা বাদ্যযন্ত্রসহযোগে বরযাত্রার দৃশ্য বর্ণনাও আছে। সংসারে শাশুড়ির সঙ্গে বধূর ভীত চকিত সম্পর্কের কথাও আছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ তেমন প্রভুত্ব না করলেও তাঁরা ব্রাত্যদের স্পর্শ বাঁচিয়ে পথ হাঁটত। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় চর্যাপদে বাংলার প্রান্তিক-ভূখণ্ডের জীবন্ত সমাজচিত্র পাওয়া যায়। সাধক কবিগণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হয়েও সমাজজীবনের মূলস্রোতকে বিস্মৃত হতে পারেননি।

উপসংহার রূপকের মোড়কে সাধনতত্ত্বের জটিলতার মধ্যেও সিদ্ধাচার্যগণ যে কাব্য সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়িয়েছেন তা বিস্ময়কর। গীতিধর্মী পদ ও সাধনসংগীত শাখার উৎস চর্যাপদ আবিষ্কৃত হবার ফলেই বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজের লোকজীবনাশ্রিত রচনারীতি ও ভাব জগতের সঙ্গে আমাদের প্রত্য(সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়েছে। বাংলা ছন্দের বিবর্তন ইতিহাস, ভাষার ত্র(ম অনুসন্ধান, বাংলার প্রাচীন সমাজচিত্র ইত্যাদির জীবন্ত দলিল হ'ল চর্যাপদ।

2.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

বাংলা সাহিত্যে আদিযুগে বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতা সংকলন চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার থেকে 1907 খ্রিস্টাব্দে একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধনসংগীত চর্যাপদ। পদ রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান কবিরূপে লুইপাদ, কাহ(পাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদের

নাম উল্লেখযোগ্য। কবিগণ পদসমূহে প্রত্য(সমাজজীবন থেকে বহু রূপ ও রূপক গ্রহণ করেছেন। ধর্মতত্ত্ব ও সাধন পথের পরিচয় দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পরিচিত স্থান-কাল-প্রথা-বিধি ও সংগ্রামের সাহায্যও নিয়েছেন। বাংলার লোকজীবনের বাস্তবচিত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। সাধক কবিগণ সাধনার একান্ত আত্মগত অনুভবকে গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বাংলা গীতি-ধর্মী পদ রচনার সূচনা এই চর্যাপদ থেকেই আলো-আঁধারি-ভাষায় চর্যাপদগুলি রচিত। ধর্মমত, সমাজচিত্র, ভাষা, ছন্দ ও অলংকারে সমৃদ্ধ চর্যাপদগুলি—ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ধারার উৎস।

2.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন এবং 25 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের দেওয়া তথ্যগুলির মধ্যে যেটি সঠিক তার ওপর টিক চিহ্((✓) দিন

   (ক) চর্যাপদ [সংস্কৃত] [অবহট্‌ঠ] [বাংলা] ভাষায় রচিত।

   (খ) চর্যাপদের মূল পুঁথিতে মোট [60] [$46^{1}/_{2}$] [50] টি পদ পাওয়া যায়।

   (গ) চর্যাপদে [হীনযানী] [মহাযানী] [সহজযানী] দের সাধনপন্থা প্রকাশ পেয়েছে।

   (ঘ) চর্যাপদে মোটামুটি [দুই] [তিন] [চার] রকমের ছন্দ পাওয়া যায়।

2. নীচের বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্((✓) দিয়ে চিহ্নি(ত ক(ন

	ঠিক	ভুল
(ক) চর্যার যুগে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা নগরে বাস করত।	☐	☐
(খ) চর্যার যুগে চুরি-ডাকাতি ছিল না।	☐	☐
(গ) চর্যার গীতগুলি সাধন-সংগীত।	☐	☐
(ঘ) চর্যাপদে তৎকালীন সামাজিক জীবনের চিত্র আছে।	☐	☐
(ঙ) চর্যাপদে কাহ(পাদের 14টি পদ আছে।	☐	☐

3. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ ক(ন। উত্তর সংকেত দেখুন।

   (ক) চর্যাপদের টীকাকার _____।

   (খ) 1316 সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় _____নামে চারটি গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থ চতুষ্কের মধ্যে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় _____।

(ঘ) চর্যাপদের বেশির ভাগ শব্দই _____ _____ জাত।

(ঙ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদ মূলত _____ উপভাষার ওপর নির্ভর করেই রচিত হয়েছে।

(চ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে _____ নামে অভিহিত করেছেন।

4. (ক) চর্যাপদের সমাজ চিত্র সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।

(খ) চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করুন।

(গ) বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম কী? কে এই গ্রন্থটি কোথা থেকে আবিষ্কার করেন? এই গ্রন্থে কাদের সাধন-সংগীত দেখা যায়?

(ঘ) চর্যাপদের চার জন পদ রচয়িতার নাম উল্লেখ করুন।

2.9 উত্তর সংকেত

2.5 অনুশীলনী 1

2.5 1. (ক) ঠিক
(খ) ভুল
(গ) ঠিক
(ঘ) ভুল
(ঙ) ঠিক
(চ) ভুল

2.8 3. (ক) মুণি দত্ত
(খ) হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা
(গ) চর্যাচর্য বিনিশ্চয়
(ঘ) মাগধী-অপভ্রংশ
(ঙ) রাঢ়ী
(চ) সন্ধ্যা ভাষা

অনুশীলনী 2

2.8 1. (ক) বাঙলা
(খ) $46^{1}/_{2}$
(গ) সহজযানী
(ঘ) তিন

2. (ক) ভুল
(খ) ভুল
(গ) ঠিক
(ঘ) ঠিক
(ঙ) ভুল

2.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ) ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড) ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. ে(ত্র গুপ্ত।
5. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক 3 ❑ তুর্কী আত্র(মণ—বিজয় ও বাঙালির সমাজজীবন ও সাহিত্যে তার ফলাফল

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য
3.2 প্রস্তাবনা
3.3 মূলপাঠ
3.4 সারাংশ
3.5 অনুশীলনী
3.6 উত্তর সংকেত
3.7 গ্রন্থপঞ্জি

3.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী—এই দুশো বছরে তুর্কী আত্র(মণ—তাদের বিজয়, বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দুর কর্তৃত্বের অবসান, মুসলমান রাজশক্তি(র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানবেন। তুর্কী আত্র(মণে পুরাতন সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়ার ফলে, ধর্মীয় বিপর্যয় শু(হলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শক্তি(দুর্বল হয়ে পড়ে—ধর্মান্তরিত বরণ শু(হয়। তবে এই দুর্যোগের মধ্যেও দুশো বছর ধরে বাঙালি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের পটভূমিকা তৈরি করে কি ভাবে সমন্বয়ী সংস্কৃতির বীজ বপন করল তা জানতে পারবেন।

3.2 প্রস্তাবনা

'অন্ধকার যুগ' নামে চিহ্নি(ত—দুশো বছরে বাংলা সাহিত্যের লিখিত নিদর্শন—খুঁজে পাওয়া যায় না। তুর্কী আত্র(মণ ও বিজয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙালি সমাজ স্তম্ভিত-বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় জীবনের সর্ব(ত্রে দেখা দেয় র(ণশীল পলায়নী মনোবৃত্তি। যার ফলে সাহিত্য জগতের ঘটল বন্ধ্যা-দশা, আর সংস্কৃতি হ'ল পঙ্গু। কিন্তু অন্ধকারের পরই আলোর ঠিকানা পাওয়া গেল। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে হুসেন শাহ, নস্‌রৎ শাহের আমলে ধীরে ধীরে মুসলমান শক্তি(র মধ্যস্থতায় আর্য-অনার্য জাতির মিলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির নবজন্ম ঘটে। সংহতি শূন্য জাতি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি গড়ে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টি হয় মিলনমুখী সাহিত্য-সম্ভার।

3.3 মূলপাঠ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুর্কী আত্র(মণ ও তাদের বিজয়বার্তা খুবই গু(ত্বপূর্ণ। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত গৌড় বঙ্গকে 606 খ্রিস্টাব্দের সমকালে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর উপযুক্ত(শাসনকর্তার

অভাবে দেশে প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। ইতিহাসে এই সময়কাল 'মাৎসন্যায় যুগ' বলে চিহ্নি(ত। প্রায় 100 বছর অরাজকতা চলার পর জনগণ 'গোপাল'কে গৌড়ের রাজারূপে নির্বাচন করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে 1160 খ্রিঃ পর্যন্ত পাল বংশের রাজাগণ রাজত্ব করেন। এই পর্বেই বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় এবং যার সা(্য বহন করছে চর্যাগীতিগুলি। পাল বংশের পতনের সমকালে এবং পরবর্তী স্তরে বৌদ্ধমতাবলম্বী 'খড়্গ বংশ' এবং বৈদিক ধর্মে বি(্বাসী 'বর্মণ বংশ' স্থানিক শক্তি(রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 'সেন বংশ'ই সমগ্র বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জগতে প্রকৃত শাসক রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সেন বংশের নৃপতি 'লক্ষ্মণ সেনে'র আমলেই তুর্কী নেতা মহম্মদ-বিন্-বখ্তিয়ার (খিলজি) 1202 অথবা 1203 খ্রিস্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের শেষ বয়সের বাসস্থান এবং নদীয়া আত্র(মণ করে। বৃদ্ধ রাজা রাজধানী ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে পলায়ন করেন। কিংবদন্তি আছে যে—বখ্তিয়ার মাত্র 'সপ্তদশ' মতান্তরে 'অষ্টাদশ' অ(্বারোহী সৈন্যের দ্বারাই নদীয়া জয় করেন এবং ভী(অ(ম রাজা লক্ষ্মণ সেন স্ত্রীলোকের বেশ ধরে গোপনে পলায়ন করেন। তবে তুর্কী নেতার বিজয় অভিযান ও লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন বৃত্তান্ত বর্তমানে অতিরঞ্জিত বলে ঐতিহাসিকগণ সহমত জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ল(ণীয় বিষয় এই যে, রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমি তুর্কী শাসনের অধীনস্থ হলেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বেশ কিছু সময় রাজত্ব করেছেন।

বাংলা ভাষা সাহিত্যের নবযুগের সূচনা দেখা দেয় তুর্কী আত্র(মণের পরবর্তী সময়ে। তুর্কী আত্র(মণে প্রাচীন জাতীয় জড় চেতনার মূলে তীব্র আঘাত আসে। এই আঘাতের ফলেই জাতির আত্মপ্রকাশের আকাঙ(া তীব্ররূপ নেয়। এর ফলস্বরূপ বাংলার জাতীয় জীবনে নূতন যুগের সূচনা হয়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—"বখ্তইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তি(র প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম।" গবেষকের বক্ত(ব্যটি যথার্থ এ যুগের বাংলার লোক জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের নানা প্রকার রহস্যময় আচার-আচরণ, ডাকিনী-যোগিনী তন্ত্রের অদ্ভুত ক্রি(য়াকাণ্ড, পুরোহিত-তন্ত্রের দাপট। দুর্বল রাষ্ট্রশক্তি(, সমাজে ঐক্য সংহতির অভাব, অন্ধকারাচ্ছন্ন অনৈক্যে ভরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশই তুর্কী বিজয়ের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। অতর্কিত আত্র(মণে দিশেহারা জাতি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা চিন্তা করতে না পেরে আত্মগোপনের পথ বেছে নেয়। এ সময় বাংলার সামাজিক কাঠামো ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। শু(হয় অমানবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। জোর-জবরদস্তি করে ধর্মান্তরকরণ শু(হয়। বাঙালির মনে-প্রাণে দেখা দেয় ভীতি বিহ্বলতা। অত্যাচারী আমীর ওমরাহ ও হাবসিদের নগ্ন আত্র(মণে দেবালয়, শি(ায়তন, সমৃদ্ধ গ্রাম লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। দিকে দিকে বিজিত জাতির ওপর অকথ্য অত্যাচারও চলতে থাকে। প্রায় দু'শ বছর ধরে তুর্কী আত্র(মণ ও বিজয়ের তাণ্ডবলীলায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে নেমে আসে অমানিশার ঘনান্ধকার এই জন্যই এই দু'শ বছর বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকারময় যুগ' রূপে চিহ্নি(ত।

তুর্কী বিজয়ের পর সংস্কৃতিগত, ধর্মবি(্বাসগত, আচার-আচরণ ও ভাব-ভাবনাগত বিচ্ছিন্ন-খণ্ডিত বাঙালিজাতি আত্মর(া ও আত্ম উদ্বোধনের তাগিদে অখণ্ড বাঙালিজাতি রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য মোড় ফিরে দাঁড়ায়। তাই প্রাথমিক স্তরে তুর্কী বিজয় জাতীয় জীবনে অভিশাপরূপে দেখা দিলেও, পরবর্তীকালে আশীর্বাদের রূপ হয়েই দাঁড়ায়।

তুর্কী আত্র(মণ বাঙালির মূল অস্তিত্বের ওপর হানে চরম আঘাত। গুপ্ত শাসন থেকে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে 'শিষ্ট' ও 'দেশীয়'—এই দুটি স্তর গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্পর্ক, আচার-ব্যবহারে সেতুবন্ধন থাকলেও আভিজাত্য ও শি(া-সংস্কৃতির দিক থেকে দুটি স্তরের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। এই পার্থক্য দূর করে অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল বাইরের আঘাত। সেই আঘাত এসেছিল—তুর্কী আত্র(মণের মধ্য দিয়ে। এই আঘাতের ফলেই দুই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মিলনমঞ্চ গড়ে ওঠে। যার ফলে আভ্যন্তর শক্তি(র উদ্বোধন ঘটে। সুতরাং তুর্কী আত্র(মণের প্রত্য(ফলেই বাংলার জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় "মুসলমান শক্তি(র মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্য মিলন হইয়া বাঙালী জাতি বিশিষ্টরূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।" এর ফলেই দেখা দিল অন্ধকারের বুকে নূতন আলোর রেখা, ঘটল জাতীয় জীবনে সর্বাত্মক বিপ্-ব। এই বিপ্-বের ফল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ধারা, বৈষ(ব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য ধারা।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে নিষ্ঠুর অত্যাচারী হাবসি শাসনের অবসান ঘটে এবং সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যোৎসাহী ধর্মমতে উদার হুসেন শাহ 1493 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুর্কী বিজয়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রথম পর্যায়ের পর হুসেন শাহের আমল অর্থাৎ 1493-1519 খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে নবপ্রাণ সঞ্চার হয়। তাঁর আমলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং হুসেন শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহের কাল অর্থাৎ 1519 খ্রিঃ-1532 খ্রিঃ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবাদর্শের প্-াবন ধারা বহমান। তুর্কী আত্র(মণের আঘাতে জাতীয় জীবনে মিলন-আকাঙ(ার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হ'ল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সার্বজনীন জীবন-সাধনার পবিত্র স্পর্শে।

তুর্কী বিজয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহার, সংস্কার বি(াসের (ে ত্রে দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে নূতন চেতনার জগৎ সৃষ্টি হ'ল বাংলার বুকে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল নাগরিক সংস্কৃতি। এ সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্ত(ব্যটি তথ্যবহ। তিনি বলেছেন—"...ইসলামের ভূমিচারী জীবনাদর্শ, ওমরাহদের ভোগ-সুখের উদ্দামতা ইত্যাদির ফলে বাঙালীর স্নেহচ্ছায়া-শীতল গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইল।" বিদেশি শাসক গোষ্ঠীর চেষ্টাতেই-গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, দেবকোট, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র ও অভিজাত শ্রেণীর সংস্কৃতিকেন্দ্ররূপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে, সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকেই, বাংলাদেশে অনেকটা সুসংস্থিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালেই বাংলার জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির পুন(জ্জীবন শু(হয়। শুধু তাই নয়, রাজশক্তি(র আনুকূল্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

বাংলাদেশের ধর্মীয় জগতে ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-চেতনার (ে ত্রে তুর্কী বিজয়ের অবদান রয়েছে। ভারতবর্ষের ভক্তি(সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যের পুরাণ-শাস্ত্রাদির সঙ্গে ইসলামি চেতনার মিলন দেখা যায়। এ ব্যাপারে সূফি ধর্ম, সূফি সাহিত্য, লোকায়ত সাহিত্য, পির-দরগা সম্পর্কে ভক্তি(-শ্রদ্ধা ইত্যাদি এই ধর্ম-মিলনে প্রত্য(ভাবে সাহায্য করে।

উপসংহার তুর্কী আত্র(মণের ও বিজয়ের প্রত্য(ও পরো(প্রভাবেই বাংলাদেশের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক চেতনা মিলনমুখী হয়ে ওঠে এবং সেই চেতনা ধীরে ধীরে নবজাগরণের অভিমুখে পরিচালিত হয়।

এর পরিপূর্ণরূপ প্রকাশ পায় ষোড়শ শতাব্দীতে। এ সময় "বলতে গেলে 'বাঙালা'র একটা রাষ্ট্র বা নেশন হয়ে ওঠার মত অনুকূল অবস্থা দেখা দিয়েছিল। তখন থেকে বাংলা সাহিত্য হচ্ছে অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির সমবেত সৃষ্টি। যদিও তার বনিয়াদ হিন্দুভাষা, ফল ও ভাব।" ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী এই নবজাগরণের আলো-অন্ধকার মিশ্রিত প্রস্তুতি পর্বরূপে চিহ্নিত।

3.4 সারাংশ

গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেশে প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। সেনবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কী নেতা মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার (খিলজি)—রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিকে দখল করে—শুরু করে অমানবিক অত্যাচার, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। জোর করে ধর্মান্তকরণ শুরু হয়। দিকে দিকে অসহায় মানুষ আত্মরক্ষার জন্য দেশান্তরী হ'তে শুরু করল। বিজিত জাতির ওপর বিজয়ী জাতির অকথ্য আক্রমণে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে নেমে আসে অন্ধকার। কিন্তু জাতীয় জীবনের ইতিহাস এই অন্ধকারেই হারিয়ে যায় না। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে আত্মরক্ষা ও নিজেকে প্রকাশের তাগিদে নূতন পদক্ষেপ নেয়। খণ্ডিত বাঙালি জাতি অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা গড়ার প্রয়োজন অনুভব করে। 'শিষ্ট' ও 'দেশীয়'— ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মিলনমঞ্চ গড়ে তোলে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে নিষ্ঠুর হাবসি শাসনের অবসানের পর সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে নসরৎ শাহের কাল পর্যন্ত এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহার, সংস্কার-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নূতন চেতনা সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় নাগরিক সংস্কৃতি। জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল বাতাবরণ প্রস্তুত হয়।

3.5 অনুশীলনী

নিম্নের সমস্ত প্রশ্ন থেকে একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পরপৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

(ক) সেনবংশের নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কী নেতা আক্রমণ করেছিলেন	1. হুসেন শাহ 2. মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার 3. ইলিয়াস শাহ
(খ) গৌড়বঙ্গকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছিলেন	1. গোপাল 2. লক্ষ্মণ সেন 3. শশাঙ্ক
(গ) বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারময় যুগ হ'ল	1. নবম-দশম শতাব্দী 2. সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী 3. ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী

(ঘ) হুসেন শাহ ছিলেন
1. অত্যাচারী
2. র(ণশীল
3. উদার

(ঙ) তুর্কী বিজয়ের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে
1. নাগরিক সংস্কৃতি
2. বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি
3. অপসংস্কৃতি

2. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (x) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) লক্ষ্মণ সেন মহম্মদ বিন বখতিয়ারকে পরাস্ত করেন।	☐	☐
(খ) শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেশে মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়।	☐	☐
(গ) হাব্সিগণ উদার ছিল।	☐	☐
(ঘ) মুসলমান শক্তি(র মধ্যস্থতায় আর্য-অনার্যের মিলন ঘটে।	☐	☐
(ঙ) চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে নস্রৎ শাহের আমলে।	☐	☐

3.6 উত্তর সংকেত

অনুশীলনী 3.5

1. (ক) মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার
   (খ) শশাঙ্ক
   (গ) ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী
   (ঘ) উদার
   (ঙ) নাগরিক সংস্কৃতি

2. (ক) ভুল
   (খ) ঠিক
   (গ) ভুল
   (ঘ) ঠিক
   (ঙ) ভুল

3.7 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পূর্বার্ধ ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড) ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (ে ত্র গুপ্ত।

একক 4❑ শ্রীকৃষ(কীর্তন ও ইসলামি সাহিত্য—'ইউসুফ-জোলেখা'

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য
4.2 প্রস্তাবনা
4.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) শ্রীকৃষ(কীর্তন
4.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
4.5 অনুশীলনী 1
4.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ইসলামি সাহিত্য 'ইউসুফ-জোলেখা'
4.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
4.8 অনুশীলনী 2
4.9 উত্তর সংকেত
4.10 গ্রন্থপঞ্জি

4.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্য সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবেন এবং এই কাব্যের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- মহম্মদ সগিরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য সম্পর্কে সব কিছু জেনে এই কাব্যের বিষয়বস্তু ও সাহিত্যশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

4.2 প্রস্তাবনা

তুর্কী আত্র(মণ ও বিজয়ের পর বাংলা সাহিত্য জগতে যে বন্ধ্যা দশা দেখা দিয়েছিল, সমাজজীবনে হতাশার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, সেই মুহূর্তে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্যের আলোর বিচ্ছুরণে বাংলা সাহিত্য জগতে নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। ঁবসন্ত রঞ্জন রায় কাব্যখানি আবিষ্কার করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে 1916 সালে প্রকাশ করেন। এই কাব্যের বিভিন্ন খণ্ডের বিষয়বস্তু ল(ণীয়—প্রথম 11টি খণ্ডে ধূলি-মলিন লৌকিক জীবনের স্থূল রসের অভিসিঞ্চন থাকলেও শেষের দুটি খণ্ডে দেহাতীত প্রেমের আর্তি বিশেষভাবে ল(্য করার বিষয়। তৎকালীন সমাজজীবন চিত্র, নাটকীয় চমৎকারিত্ব, চরিত্রচিত্রণ, ভাষা ভঙ্গিমা ইত্যাদিও ল(ণীয়। বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কবি শাহ মহম্মদ সগিরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যখানিতে প্রণয় কাহিনী—যা পাওয়া যায় তা প্রাচীন গ্রন্থের প্রণয় কাহিনীর আ(রিক অনুবাদ নয়। লোকজীবনে ছড়িয়ে থাকা কাহিনী-কাঠামো সংগ্রহ করে কবি স্বকীয় প্রতিভার আলোয় কাব্যখানিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিবেশ-পটভূমি রচনায় এবং ভাষা-শৈলীর দিক থেকেও জোলেখার

চরিত্র রূপায়ণে কবি সার্থক। নারী-প্রেমের উগ্রতা এবং তার বিনম্র পরিণতিতে কাব্যখানি বাস্তবধর্মী ও সার্থক হয়েছে।

আদি মধ্যযুগের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' ও 'ইউসুফ-জোলেখা' এই দু'খানি কাব্য পাঠ করে শি(ার্থীরা 'অন্ধকার যুগে'র পর বাংলা সাহিত্যের নূতন গতিপথের সন্ধান পাবেন।

4.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) শ্রীকৃষ(কীর্তন

ভূমিকা

তুর্কী বিজয়ের প্রথম পর্বে দু'শ বছরব্যাপী বাংলার জাতীয় জীবনে ও সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে দেখা দেয় বন্ধ্যা দশা। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির বিশৃঙ্খল অন্ধকারাচ্ছন্ন দিগন্তেই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র মতো দেখা দেয় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যখানি। 1909 খ্রিস্টাব্দে বঁসন্ত রঞ্জন রায় মহাশয় বিষু(পুরের কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে অযত্নর(িত গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন এবং 1916 সালে তাঁর সম্পাদনায় পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক পুঁথিখানির নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ(কীর্তন', কিন্তু এর যথার্থ নাম অন্য। আবিষ্কৃত গ্রন্থের গোড়ার দুটি ও শেষে একটি পাতা নেই। সুতরাং কাব্য ও কবি পরিচয় অংশটি অজ্ঞাত। কবির ভণিতা 'চণ্ডীদাস', তবে বেশির ভাগই 'বড়ু চণ্ডীদাস'। পুঁথির মধ্যে একখানি চিরকুট পাওয়া যায়। তাতে এটিকে 'শ্রীকৃষ(সন্দর্ব' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ(সন্দর্ভ) বলা হয়েছে। অনেক গবেষক মনে করেন, জীব গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ(সন্দর্ভ' নামাঙ্কিত গ্রন্থ থাকার জন্যই কবি গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীকৃষ(সন্দর্ব' দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রন্থমধ্যের কাগজের টুকরো অংশ থেকে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' থাকাতে এবং এই গ্রন্থের ভাষা, উপস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় এটি পদাবলির চণ্ডীদাসের লেখা নয়। গ্রন্থকর্তা 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভিন্ন ব্যক্তি(। পুঁথিমধ্যে বহুস্থানে কবি নিজেকে 'বাশুলীর গণ' অর্থাৎ শাক্ত(দেবী বাশুলীর উপাসক বলে স্বীকার করেছেন। এই পরিচিতি ছাড়া গ্রন্থমধ্যে আর কোথাও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই।

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের কৃষ(লীলাবিষয়ক কাহিনীকে কিছুটা অনুসরণ করে, জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ'র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এবং অমার্জিত গ্রামীণ প্রচলিত কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই বড়ু চণ্ডীদাস এই কাব্যখানি লিখেছেন।

গ্রন্থ পরিচিতি 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে' মোট 13টি খণ্ড আছে। এটি সংলাপ গীতিময় নাট্য-গীতি শ্রেণীর কাব্য। ড. সুকুমার সেন এইজন্যই গ্রন্থখানিকে 'নাটগীতি পাঞ্চালী' বলে অভিহিত করেছেন। খণ্ডগুলি—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ নামে চিহ্নি(ত। শেষেরটিতে 'খণ্ড' শব্দ যুক্ত(হয়নি। রাধা, কৃষ(ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাব্যখানির মূল কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। নিম্নে কাব্যখানির বিভিন্ন খণ্ডের কাহিনী সূত্রাকারে বর্ণিত হ'ল।

জন্মখণ্ড কংসের অত্যাচারে পৃথিবী যখন নানা পাপে জর্জরিত হয়, তখন তার হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত(করার জন্য ভগবান নারায়ণ রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর লীলা সম্ভোগের জন্যই 'সাগরের ঘরে পদুমা উদরে'—লক্ষ্মীদেবী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাধার জন্মবৃত্তান্তই এই খণ্ডের মূল বিষয়।

তাম্বুলখণ্ড এই খণ্ডে রক্ত(মাংসে গড়া 'নারী'—রাধার দেখাশুনার জন্য রাধার মাতার পিসি বড়াই চরিত্র

সৃষ্টি। পসারিণী রাধার অনুসন্ধানে বের হয়ে বড়াই গোচারণভূমিতে কৃষ(কে দেখে তার সাহায্য প্রার্থিনী হয়। বড়াই কৃষ(কে রাধার রূপাদি বর্ণনা করার পর কৃষে(র রাধার প্রতি কামভাব প্রবল হয় এবং বড়াই-এর উপদেশ মত কৃষ(রাধার উদ্দেশ্যে, মিলন-ইচ্ছার ইঙ্গিত স্বরূপ 'তাম্বুল' পাঠান। এতে রাধা (ুব্ধ হয়ে তাম্বুল ছুড়ে ফেলে বড়াইকে উত্তম-মধ্যম দেন।

দান ও নৌকাখণ্ড এই দুই খণ্ডে দানী ও খেয়া মাঝি সেজে বড়াই-এর সাহায্যে রাধাকে কৃষ(ডেকে এনে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেন।

ভারখণ্ড কামাতুর কৃষ(কে কৌতুকছলে রাধা তার দধি-সরের পসরা বহনের প্রস্তাব দিয়ে কৃষে(র মনোবাঞ্ছা পূরণের আ(াস দেয়। কৃষ(ভারী সেজে মথুরার হাটে যান এবং ফেরার পথে রাধাকে প্রতিশ্রুতি পালনের কথা বললে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শু(হয়। খণ্ডটি অসম্পূর্ণ।

ছত্রখণ্ড খর রৌদ্রের হাত থেকে রাধাকে বাঁচাতে শ্রীকৃষ(রাধার মাথায় ছত্রধারণ করেছে। উদ্দেশ্য এতে তার কামনা-বাসনা পূর্ণ হবে। এ খণ্ডটিও অসম্পূর্ণ।

বৃন্দাবনখণ্ড বয়ঃপ্রাপ্তা রাধা বড়াই-এর সাহায্যে সংসারের নাগপাশ ছিন্ন করে বৃন্দাবনের পুষ্পকুঞ্জে শ্রীকৃষে(র সঙ্গে মিলিত হন।

যমুনাখণ্ড ও কালীয়দমনখণ্ড যমুনা নদীর বুকে জলকেলি এবং কালীয়দমনের ঘটনাদি আছে।

হারখণ্ড বস্ত্রহরণ এবং শেষে রাধার হার কৃষ(অপহরণ করলে রাধা রাগান্বিতা হয়ে মা যশোদার কাছে কৃষে(র বি(দ্ধে চরম অসম্মানের অভিযোগ আনেন।

বাণখণ্ড মদনবাণে রাধাকে বিদ্ধ করে মোহমুগ্ধা রাধাকে মিলন পাগলিনী করে শ্রীকৃষ(আত্মগোপন করেন। রাধা বড়াইকে সঙ্গে করে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীকৃষে(র সন্ধান পায়। উভয়ের পূর্ণ মিলনে এই খণ্ডের সমাপ্তি।

বংশীখণ্ড দূর থেকে শ্রীকৃষে(র বাঁশীর সুরে রাধার হৃদয়-মন আকুল-ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গৃহকাজে মন নেই। বড়াই-এর পরামর্শে কৃষে(র বাঁশী রাধা চুরি করেন। তারপর নানা কথা কাটাকাটির পর মনোমালিন্য দূর হলে রাধা কৃষে(র বাঁশী ফিরিয়ে দেন।

রাধা বিরহ এই অংশটি খণ্ডিত। প্রিয় মিলনে তৃপ্তা রাধাকে নিদ্রামগ্না অবস্থায় কৃষ(পরিত্যাগ করে চলে যান। নিদ্রাভঙ্গের পর কৃষ(কে দেখতে না পেয়ে রাধার হৃদয়গভীরে যে বিরহের আর্তি দেখা দেয় তারই ক(ণ বর্ণনার মধ্য দিয়েই গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে।

13টি খণ্ড জুড়ে রাধাকৃষে(র যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে,—পদাবলির আধ্যাত্মিক রাগরঞ্জিত মধুর রসাশ্রিত পদসমূহের সমগোত্রীয় বলে এ কাব্যকে চিহ্নি(ত করা যায় না।

কাব্য মূল্যায়ন 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যখানি অবিমিশ্র লোকজীবনতন্ময় কাব্য। লোকজীবন আশ্রিত সার্থক 'লোক-কাব্য'। এ সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়—

"আমাদের অনুমান, শ্রীকৃষ(কীর্তনের কবি সংস্কৃতে প্রাজ্ঞ ও পৌরাণিক সাহিত্যে পণ্ডিত হইলেও কাহিনী নির্মাণে গ্রামীণ রাধাকৃষ(কাহিনীর আদর্শের দ্বারাই অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।" এই কাব্যে অশি(িত অনভিজাত জীবনের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সে যুগে বাল্যবিবাহ প্রথা, সামাজিক ব্যভিচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নি(পায় নারীত্বের আর্তনাদ যেন ধ্বনিত হয়েছে। এর স্পষ্টরূপ ধরা পড়েছে 'রাধাবিরহ খণ্ডে।

নাটকীয় ধরনের সাহিত্যগুণে কাব্যখানি অনন্য। কৃষে(র লাম্পট্য বাদ দিলে, অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে কবি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কৃষ(চরিত্রটি অমার্জিত গ্রাম্য গোঁয়ার জাতীয় যুবকের আদলে রচিত। তাঁর সংলাপ সর্বত্র মার্জিত নয়। গ্রন্থের শেষাংশে হঠাৎ কৃষে(র যোগসাধনের প্রসঙ্গটি নিতান্তই খাপছাড়া।

কবির রাধা—'ত্রিভুবন জনমোহিনী'। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাধার ত্র(মবিকাশ—মনস্তাত্ত্বিক ও বি(ে-ষণ ধর্মী হয়েছে। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে কবি চরম দ(তার ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে। এমনটি প্রাচীন সাহিত্যে দুর্লভ। শু(তে সংসার অনভিজ্ঞা, রূঢ়সত্য ভাষিণী, অল্পবয়সী, অশি(তা গোপ বালিকারূপে রাধিকাকে আমরা পাই। কবি ঘটনা কৌশলের আবর্তে সহজ-সরল মূঢ় বালিকার হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বেলে যেভাবে প্রেম-বন্যায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন এবং সব শেষে অনন্ত প্রেমের আর্তিতে চরিত্রটিকে মুখর করে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহে নিপুণ সাহিত্য-শৈলীর নিদর্শন।

বড়াই-এর চরিত্রটি 'টাইপ' চরিত্র। জ্যোতি(রের 'বর্ণ রত্নাকর'-এ যে কুট্টনীর বর্ণনা পাওয়া যায় তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি যেন বড়াই। তবে কাব্যের প্রথমদিকে কৃষে(র দূতীরূপী বড়াই-এর মধ্যে কুট্টনীর ছায়াসম্পাত ঘটলেও, পরবর্তী পর্যায়গুলিতে তার হৃদয় গভীরে রাধার জন্য মাতৃহৃদয়ের কোমল অভিসিঞ্চন ল(্য করা যায়।

নারদমুনির চরিত্রটি নিছক হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান হিসাবেই স্থান পেয়েছে।

ভাষা-ভঙ্গিমা, চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনীর সংহতরূপ ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের বিচারে শ্রীকৃষ(কীর্তন অনন্য সাধারণ কাব্যরূপে চিহ্নি(ত। জয়দেবের 'গীত গোবিন্দে'র গানগুলি যেমন ে(াকের দ্বারা কাহিনী শৃঙ্খলে সংগ্রথিত, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যও তেমনি ুদ্র ুদ্র ে(াকের যেন সুবিন্যস্ত মালা। পাঞ্চালী কাব্যের মতো নানা খণ্ড-বিভাগ এবং নাটগীতিকাব্যের সৌন্দর্য ও সংহতিও এই কাব্যে আছে।

সমাজচিত্র শ্রীকৃষ(কীর্তনে সমসাময়িক বাঙলাদেশ ও সমাজের নানা বাস্তবচিত্র আছে। রাধার পারিবারিক জীবন ও তার অল্প বয়সে বিবাহের চিত্রে বাল্যবিবাহ প্রথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গোপকন্যাদের স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের চিত্রও আছে। তাদের দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ত্র(য়-বিত্র(য়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের কুমোর, তেলি, নাপিত, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নানা জাতির উল্লেখ আছে। বংশীখণ্ডে রাধার রন্ধনশালার প্রসঙ্গটিতে বাঙালির খাদ্যাভাসের ইঙ্গিত রয়েছে। লোকজীবনের কিছু কিছু সংস্কার প্রসঙ্গ ও দেখা যায়। যেমন

"কোন আসুভ খনে পাতন বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী উবাঁট না মানিল।।
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাএঁর শিআল মোর ডাহিনে জাএ।।"

এখানে হাঁচি, টিকটিকি, শূন্য কলসী, বামদিক থেকে শিয়ালের ডানদিকে যাওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সামাজিক সংস্কার-কুসংস্কারের চিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

সার্বিক মূল্যায়ন গীতিকবি সুলভ রমণীয়তা কাব্যখানিতে ল(্য করা যায়। 'দানখণ্ডে' রাধার রূপ বর্ণনা—এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

"নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা।।"

বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ অংশে রাধার হৃদি-বেদনা গীতি কবিতার মূর্ছনায় বিমথিত।

"বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কহ(াঞি(
বাঁশী বাএ সুললিত ছন্দে।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেয়াগিবোঁ
সুনী তাক বুকে কে বা বান্ধে।"

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা বলে উদ্ধৃত কাব্যাংশটির সব অর্থ বোঝা কঠিন। এখানে কবি বলতে চেয়েছেন—

[বৃন্দাবনে প্রবেশ করে কৃষ(সুন্দর বাঁশী বাজায়। বড়াই, আমার হার, কাঁকন সব ত্যাগ করব। সে সুর শুনে কে বুক বেঁধে ধৈর্য ধরে থাকতে পারে]

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে।।"

এই পদাংশটিতে রাধার হৃদয়মথিত ব্যাকুলতা চিরন্তন রূপ পেয়েছে। এই হৃদয় ব্যাকুলতা প্রকাশে কবি বাস্তব রসস্নিগ্ধ উপমা-অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী।।"

[ওগো বড়ায়ি (যখন) বন পোড়ে জগৎ-জন জানতে পারে। আমার মন কুমোরের তুষানলের মত পুড়ছে।]

দিনের সূর্য রাধার হৃদয়কে দগ্ধ করছে, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারাও বেদনার বাণীবহ হয়ে দেখা দিয়েছে। রাধা কি করে কৃষ(বিহনে জীবনধারণ করবে—তার চোখে 'নাই সে নিন্দে' অর্থাৎ চোখে ঘুম নেই। এই নীরব বেদনার হাহাকার যুগ-যুগান্তর বিরহ বেদনার ব্যাকুল বাণী বহন করে।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যখানি মধ্যযুগের বৈষ(ব পদাবলি সাহিত্যের নকীব হিসাবে যেন ভূমিকা পালন করেছে। এ ব্যাপারে বংশীখণ্ড ও রাধা-বিরহ অংশটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আখ্যান কাব্য থেকেই পরবর্তী পালাগানের সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। শুধু অ(ীলতার দোহাই দিয়ে কাব্যখানিকে কালিমালিপ্ত ও অবহেলা করা উচিত নয়। ড. সুকুমার সেন এই কাব্যের সঠিক মূল্যায়ন করে বলেছেন"শ্রীকৃষ(কীর্তনে প্রবেশে বাধা আছে। বানান অপ্রচলিত, ভাষা কিছু দুর্বোধ্য। তবে অনুনাসিকের খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ ধ্বনির কন্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের ঝোপঝাড় ডিঙ্গাইয়া একবার যিনি এই কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিবেন তিনি ঠকিবেন না।"

4.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

বাশুলী দেবীর উপাসক 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' গ্রন্থ আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রামাণ্য নিদর্শন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরই চণ্ডীদাস সমস্যার সৃষ্টি। জয়দেবের পরবর্তী ও চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী সময়ে কবির জন্ম। শাস্ত্র-পুরাণাদিতে পণ্ডিত বড়ু চণ্ডীদাস মোট তেরোটি খণ্ডে কাব্যখানি লিখেছেন। এই কাব্যের ভাগ্যে নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই জুটেছে। রাধা, কৃষ(ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাব্যের ঘটনাধারা নাটকীয় গতিতে প্রবাহিত। সংলাপ গীতিময় নাট্যগীতি শ্রেণীর কাব্যরূপে দৃষ্টি আকর্ষণকারী। সংস্কৃতে প্রাজ্ঞ ও পৌরাণিক সাহিত্যে পণ্ডিত হয়েও কাহিনী সৃষ্টিতে কবি গ্রামীণ রাধা-কৃষ(কাহিনীর আদর্শের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কৃষ(চরিত্র তৎকালীন অশি(ত, অমার্জিত গ্রাম্য রাখাল বা দুরন্ত কিশোর চরিত্রের আদলে রচিত। বড়াই চরিত্রটি টাইপ-চরিত্র। রাধা চরিত্রের ত্র(মবিকাশ—মনস্তাত্ত্বিক ও বি(-ষণধর্মী। এই কাব্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র আছে। বিশেষভাবে নাটকীয়তা ও গীতিধর্মী-মূর্ছনা কাব্যখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম 11টি খণ্ডে ধূলি-মলিন সমাজজীবনের ছায়া-সম্পাত ঘটলেও শেষের দুটি খণ্ডে অনন্ত প্রেমের মুখরতা বিশেষভাবে ল(ণীয়। কবি ঘটনা কৌশলে সহজসরলা রাধিকার হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বালিয়েছেন। এ ব্যাপারে নেপথ্যে বড়াই-এর ভূমিকা আছে। শ্রীকৃষ(পারানি, ভারবাহী ইত্যাদির নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে রাধিকার দেহ সম্ভোগের জন্য ছলাকলার আশ্রয় নেয়। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড ইত্যাদিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বংশীখণ্ড ও রাধা বিরহখণ্ডে কৃষ(কে একান্তভাবে পাবার জন্য রাধিকার হৃদয়-গভীরে যে বিরহের আর্তি দেখা যায়—তারই ক(ণ পরিণতি ঘটেছে কাব্যের সমাপ্তিতে।

4.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির উত্তর লিখুন। উত্তর লেখা হয়ে গেলে 41 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের প্র(গুলির 4টি সম্ভাব্য উত্তর ডানদিকে দেওয়া আছে। যেটি সঠিক উত্তর তাতে টিক চিহ্((✓) দিন।

(ক) ঁবসন্তরঞ্জন রায় বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য আবিষ্কার করেন
1. 1904 খ্রিস্টাব্দে
2. 1909 খ্রিস্টাব্দে
3. 1917 খ্রিস্টাব্দে
4. 1932 খ্রিস্টাব্দে

(খ) শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্য রচিত
1. 10টি খণ্ডে
2. 8টি খণ্ডে
3. 15টি খণ্ডে
4. 13টি খণ্ডে

(গ) শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্য
1. লৌকিক জীবনের
2. নাগরিক জীবনের
3. পৌরাণিক জীবনের
4. মিশ্র জীবনের

(ঘ) শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্যখানি
1. গীতিকাব্য
2. আখ্যান কাব্য
3. নাট-গীতিকাব্য
4. পত্র কাব্য

(ঙ) শ্রীকৃষ(কীর্তন
1. প্রাচীন যুগের কাব্য
2. মধ্যযুগের কাব্য
3. আধুনিকযুগের কাব্য
4. আদি-মধ্য যুগের কাব্য

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ ক(ন।
(ক) ঁবসন্তরঞ্জন রায় বিষু(পুরের ..... গ্রাম থেকে শ্রীকৃষ(কীর্তন আবিষ্কার করেন।
(খ) ঁবসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনার শ্রীকৃষ(কীর্তন..... থেকে প্রকাশিত হয়।
(গ) শ্রীকৃষ(কীর্তন প্রকাশনার বছর.....।
(ঘ) পুঁথির মধ্যে পাওয়া চিরকুটে নামটি..... পাওয়া যায়।
(ঙ) বড়ু চণ্ডীদাস..... উপাসক ছিলেন।

3. নীচে প্রদত্ত বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট করে টিক চিহ্ন ( ) দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) 'তাম্বুল খণ্ডে' রাধা চরিত্রটি রক্ত-মাংসে গড়া।	☐	☐
(খ) নারদ মুনির চরিত্রটি ক(ণ রস সৃষ্টি করেছে।	☐	☐
(গ) কাব্যে গোপ কন্যাদের স্বাধীন জীবনযাপনের চিত্র আছে।	☐	☐
(ঘ) 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে'— (পদাংশটি দানখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত)	☐	☐
(ঙ) 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' অ(ীল কাব্য।	☐	☐

4.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ইসলামি সাহিত্য 'ইউসুফ-জোলেখা'

ঐতিহাসিক পটভূমিকা 1342 খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকনদার শাহের রাজত্বকাল 1389 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বংশের অবসানে রাজা গণেশ সিংহাসনে বসেন। রাজা গণেশ ও তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে দেশের আর্থ-সামাজিক (ে ত্রে শৃঙ্খলা দেখা দেয়, সুখ-সমৃদ্ধিও ঘটে।

ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায় শু(হয় নাসি(দ্দিন, তাঁর পুত্র (কনুদ্দিন বরবক এবং তাঁর পুত্র সামসুদ্দিনের রাজত্বকালে। এঁরা সকলেই সুশাসক এবং শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। গুণী

ব্যক্তি(দের প্রতি এঁদের গভীর অনুরাগ ছিল। সামসুদ্দিনের মৃত্যুর পর কিছুদিন অরাজকতা চললেও 1943 খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহ বাংলার অধী(রের হলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য চর্চাতেও গতি দেখা যায়।

মোটামুটিভাবে বলা চলে পঞ্চদশ শতকে ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক-ধারার মিশ্রণে বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্য শক্ত(ভিতের ওপর দাঁড়ায়। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্কৃত ভাষার পথ থেকে সরে এসে বাংলা ভাষার স্বয়ং সম্পূর্ণতা দান করতে স(ম হ'ল। হিন্দু লেখকদের পাশাপাশি মুসলমান বাঙালিও কাব্যরচনা শু(করেন। এই সব সৃষ্টির মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন'-এর প্রায় সমসাময়িক লেখক শাহ মহম্মদ সগিরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যখানি গুণগত দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি পরিচিতি ও কাব্যসূত্র আজ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান কবিদের যত প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে মহম্মদ সগিরের লেখা পুঁথিই সব চেয়ে প্রাচীন বলে গবেষকগণ মনে করেন। এই পুঁথি হাতে পাবার আগে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের হাতেই প্রথম রোমাণ্টিক প্রেম-আখ্যান রচিত হয়েছে। কিন্তু এঁদের বহু পূর্বেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহম্মদ সগির 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণয় কাব্যখানি লেখেন। ব্রাহ্মণ্য-লৌকিক ধারার মিশ্রণ, বাংলা ভাষার স্বয়ং সম্পূর্ণতা, ধর্ম ও সমাজের বুকে ঐক্য নিবিড় সুর ইত্যাদি সব মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে নূতন গতিপথ তৈরি হ'ল, সেই পথের বিশেষ ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় সগিরের কাব্যে। তুর্কী বিজয়ের পর যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—দু'শো বছরের মধ্যে সে অন্ধকার কেটে যায়। হিন্দুদের মতো শি(ায় মুসলমানগণও আরবি-পার্সির সাহিত্য জগৎ থেকে দূরে সরে এসে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা শু(করেন। তারই স্বর্ণফসল হ'ল 'ইউসুফ-জোলেখা'। এই কাব্যখানি বৃহৎ আকারের ইসলামি কাব্য। কাব্যের নায়ক 'ইউসুফ' ইসলাম ধর্মচর্চা অনুসারে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি(। আদর্শবাদী 'ইউসুফ' ছিলেন আল্লাহ্তালার একনিষ্ঠ সেবক। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বি(েষণে কাব্যখানিকে প্রণয়-আখ্যান কাব্য বলা যায়।

কাব্য পরিচয় আজ পর্যন্ত মহম্মদ সগিরের কাব্যের পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনখানা পুঁথির সংগ্রাহক আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ। তিনিই প্রথম এই প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কর্তা।

ঢাকা বি(বিদ্যালয় থেকে ড. এনামূল হকের সম্পাদনায় 1984 সালে কাব্যখানি প্রকাশিত হয়েছে। ড. এনামুল হক ও তাঁর সহযোগী আহমদ শরীফ নানা তথ্যাদি তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে মহম্মদ সগির পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। কাব্যে রাজবন্দনা অংশ বি(েষণ করে এঁরা প্রমাণ করেছেন যে, কবি সম্ভবত সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কর্মচারী ছিলেন। ভাষাগত বিচারে কাব্য সম্পাদক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই কাব্যের ভাষা 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র চেয়ে আধুনিক হলেও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ(বিজয়ে'র ভাষার চেয়ে প্রাচীন। এই গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন স্বরূপ কিছুটা কাব্যাংশ তুলে ধরা হ'ল।

"তোহ্মার জথ সখি আছে নৌআলী জৌবন।
তা সব পাঠাই দেঅ জাউ বৃন্দাবন।।
ইছুফকে বোলহ জাউক নিধুবনে।
তুলিয়া আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারণে।।"

এই গ্রন্থে কারক-বিভক্তি(প্রয়োগের (েত্রে শ্রীকৃষ(কীর্তনের কারক-বিভক্তি(প্রয়োগের রূপরেখা স্পষ্ট দেখা যায়।

'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র রচনাকাল নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, 'ইউসুফ-জোলেখা' নিয়েও তেমন বাক্-বিতণ্ডা আছে। তবু সব যুক্তি(জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে বিশিষ্ট গবেষকদের মতানুসারে 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেমন নির্দিষ্ট হয়েছে, ঠিক তেমনি 'ইউসুফ-জোলেখা'ও একই শতাব্দীর হলেও 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র রচনাকালের কিছুটা পরে বলে চিহ্নি(ত হবার দাবি রাখে।

কাব্যকাহিনী ও বৈশিষ্ট্য বাইবেল, কোরাণ ও ফিরদৌসীর লেখায় 'ইউসুফ-জোলেখা'র যে উপাখ্যান আছে, তাকেই অবলম্বন করে মহম্মদ সগির কাব্যখানি লিখেছেন। ঐতিহ্যবাহী কাহিনীকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে প্রাচীন জনপ্রিয় কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু নূতন ঘটনা যোগ করে কিছুটা মৌলিকতার স্বাদ সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউসুফের দিগ্বিজয়, ইউসুফ পুত্রদের বিয়ে, রাজ্যভোগ, ইবনআমীন ও রাজকন্যা বিধুপ্রভার প্রেম-কাহিনী ইত্যাদি।

কাহিনীর ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টিতে, বর্ণনা রীতিতে, অলঙ্কারের সাজসজ্জায় কবি কোমল-পেলব বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ফারসি 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা হয়েছে নায়ক-নায়িকা। সুফীতত্ত্ব রূপকের মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মহম্মদ সগিরের কাব্যে কঠিন তত্ত্বকথার প্রতিফলন নেই, আছে জীবনছন্দ ছন্দায়িত প্রণয়-আখ্যানের নিটোল রূপ।

চরিত্র-চিত্রণ কাব্যখানির কেন্দ্রীয় চরিত্র ইউসুফ একনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ পু(ষ। কিন্তু নীরস ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্যের কাণ্ডারী-ভাণ্ডারী না করে কবি তাঁকে প্রাণময় করে চিত্রিত করেছেন। ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে ইউসুফের পৌ(ষ, ব্যক্তি(ত্ব, চরিত্রনিষ্ঠা, বৈষয়িক বুদ্ধি ইত্যাদি যুক্ত(করে কবি তাঁকে মানবিকগুণে গুণান্বিত করেছেন।

নায়িকা জোলেখার চরিত্রটি অসাধারণ। কামনা-বাসনা-সঘন এই নারী, সমাজের রীতি-নীতি অনুশাসন না মেনে তীব্র রিরংসার তাগিদে প্রেমিককে পেতে চেয়েছে। প্রেম প্রত্যাখ্যানে ভয়ংকরী হয়ে প্রেমিককে আঘাত করেছে। নারীর এমন উদগ্র প্রেম বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। কবি ধীরে ধীরে নায়িকার উগ্রপ্রেম-আকাঙ(াকে স্নিগ্ধ-বিনম্রতায় পরিশুদ্ধ করে পরিণতি দান করেছেন আত্ম-সমর্পণের বেদীতলে।

হিন্দুনারী জোলেখা, প্রতিমা পূজা বর্জন করে ইসলাম ধর্মে দী(া নিয়ে, প্রাণপু(ষ ইউসুফকে লাভ করে।

উপসংহার তুর্কী আত্র(মণে বিধ্বস্ত বাংলার বুকে 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র পাশাপাশি ইউসুফ-জোলেখা কাব্যখানি যে নূতন জীবন-আলোর সন্ধান দিয়েছে, বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা দশা ঘোচাতে সাহায্য করেছে—একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হয়।

4.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

আরাকান রাজসভার কবিদের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান নিরপে(কবি সগির আদি-মধ্যযুগে 'ইউসুফ-জোলেখা' রোমাণ্টিক প্রণয় আখ্যান কাব্য রচনা করেন। ঐতিহ্যবাহী প্রণয় কাহিনীকে গতানুগতিক ধারায় রচনা না করে কবি মৌলিকত্বের স্বা(র রেখেছেন। বাইবেল-কোরাণ ইত্যাদির গল্প-কাহিনীর মধ্যে নূতন সুর-ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। পৌ(ষ চেতনায় দৃপ্ত নানা মানবিক গুণে গুণান্বিত ইউসুফের প্রতি জোলেখার কামনা-বাসনা-সঘন প্রেমের উগ্রতার পাশাপাশি তার স্নিগ্ধ প্রেমের ধারা মিলেমিশে কাব্যখানি রোমাণ্টিক প্রেমের সার্থক কাব্য হয়েছে। 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র মতই এই কাব্যখানি প্রণয়-আখ্যানের অনবদ্য নিদর্শন। প্রেমকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে এই কাব্য শেষে হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে তা অস্বাভাবিক নয়—যুগোচিত।

4.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (x) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) 'ইউসুফ-জোলেখা'—সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।	☐	☐
(খ) ইউসুফ-জোলেখা প্রণয়ধর্মী কাব্য।	☐	☐
(গ) সগিরের কাব্যখানি মৌলিক।	☐	☐
(ঘ) ইউসুফ নাস্তিক ছিলেন।	☐	☐
(ঙ) জোলেখা প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।	☐	☐

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ ক(ন।
   (ক) ইউসুফ-জোলেখা _____ শতাব্দীর কাব্য।
   (খ) সগির প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে _____ এনে ঘটনা ধারায় নূতনত্ব এনেছেন।
   (গ) আরাকান রাজসভার কবি হলেন _____ _____।
   (ঘ) ফারসি ইউসুফ-জোলেখা কাব্য _____ রূপক।

4.9 উত্তর সংকেত

4.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) 1909
   (খ) 13টি খণ্ডে
   (গ) লৌকিক জীবনের
   (ঘ) নাট-গীতিকাব্য
   (ঙ) আদি-মধ্যযুগের
2. (ক) কাকিল্যা
   (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
   (গ) 1916 খ্রিস্টাব্দ
   (ঘ) শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গন্দর্ভ)
   (ঙ) বাশুলী দেবীর
3. (ক) ঠিক
   (খ) ভুল
   (গ) ঠিক
   (ঘ) ভুল
   (ঙ) ভুল

4.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) ভুল
   (খ) ঠিক
   (গ) ভুল
   (ঘ) ভুল
   (ঙ) ঠিক

4.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পূর্বার্ধ ড. সুকুমার সেন।
2. বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ড. (ুদিরাম দাস।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
5. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (েত্র গুপ্ত।

একক 5 ❑ চণ্ডীদাস সমস্যা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য
5.2 প্রস্তাবনা
5.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
5.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
5.5 অনুশীলনী 1
5.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
5.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
5.8 অনুশীলনী 2
5.9 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
5.10 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
5.11 অনুশীলনী 3
5.12 উত্তর সংকেত
5.13 গ্রন্থপঞ্জি

5.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি চণ্ডীদাস সমস্যা কি এবং সেই সমস্যা কিভাবে সৃষ্ট হ'ল ও তার মীমাংসা সূত্রাদি কি—এ সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাছাড়া চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের প্রাক্‌লগ্নে বৈষ(ব পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অবদান সম্পর্কে নানা তথ্যাদি জেনে—

- বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি স্বভাবের পার্থক্য ও তাঁদের রচনা রীতি নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে পারবেন।

5.2 প্রস্তাবনা

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার এবং বৈষ(ব পদাবলিতে দ্বিজ, দীন ইত্যাদি যুক্ত(চণ্ডীদাসের ভণিতায় নানা পদ একই ব্যক্তি(র লেখা কি না—কার সৃষ্টির রস চৈতন্যদেব আস্বাদন করেছেন ইত্যাদি নানা জটিল প্র(ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গবেষকগণ কি মতামত দিয়েছেন, তা জেনে বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি(নন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। ঐতিহাসিকদের অভিন্ন মতামত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সঠিক সমাধানের জন্য প্রতী(া করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈষ(ব পদাবলির স্বর্ণ-ফসলে ভরা। চৈতন্য পরবর্তী যুগে এই সাহিত্য শাখাটি সুসমৃদ্ধ রূপ পায়। কিন্তু প্রাক্ চৈতন্য যুগে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ(ব পদ রচনা করে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন—তা বিস্ময়কর। তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও স্মরণীয়।

বিদগ্ধ রাজসভার কবির হাতে বিচিত্র সৃষ্টি হলেও বৈষ(ব পদ রচনার জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

প্রাক্-চৈতন্য যুগেই গ্রামীণ সাধক কবি চণ্ডীদাসের হাতে সহজ সুরে গভীর প্রেমের বেদনার্তিও শুনতে পাওয়া যায়। তন্ময়-মন্ময় কবির সৃষ্টি সম্ভার অনির্বচনীয় প্রেমালোকে পাঠককে নিয়ে যায়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সংি(প্ত আলোচনাও তাই এ ে(ত্রে প্রাসঙ্গিক।

5.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

চণ্ডীদাস সমস্যা

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' গ্রন্থটি যে আদি-মধ্যযুগের অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্যযুগের—এর প্রমাণ পাওয়া যায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'Origin and Development of Bengali Language' (O.D.B.L.) গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থের ভাষা ও লিপির প্রাচীনত্ব যুক্তি(-তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন কিন্তু 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' গ্রন্থখানির আবিষ্কার ও প্রকাশের পরেই বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' জটিল রূপ নেয়। বৈষ(ব পদাবলির চণ্ডীদাস ও 'শ্রীকৃষ(কীর্তন'-এর চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি(কি না? মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ চণ্ডীদাসের পদ রায় রামানন্দের সঙ্গে আস্বাদন করেছেন?—ইত্যাদি নানা জিজ্ঞাসা 'চণ্ডীদাস' নামটিকে ঘিরে দেখা দেওয়ার ফলেই 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র সৃষ্টি হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই সমস্যা পূর্ণ সমাধান হয়নি।

রাধা-কৃষে(র প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত(বহু কবি পদ রচনা করেছেন। তবে ভণিতা 'চণ্ডীদাস' নামের সঙ্গে বড়ু, দ্বিজ, দীন, দীনহীন, আদি বিভিন্ন বিশেষণযুক্ত(হতে দেখা যায়।

বীরভূমের 'নানুর' অথবা বাঁকুড়া জেলার 'ছাতনা' গ্রামের অধিবাসী চণ্ডীদাস রাধা-কৃষে(র লীলারসের যে পদগুলি রচনা করেছেন, তার ভাব-ভাষা ও ব্যঞ্জনার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র কোনো দিক থেকেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ(বকাব্য ধারা থেকে এ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পৃথক। 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে' স্থূল রসের অভিসিঞ্চন এবং নানা অসঙ্গতি আছে এক কথায় একে রসাভাসযুক্ত(কাব্য বলা যায়। এ ধরনের কাব্যরস কিছুতেই শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করেননি। এর ইঙ্গিত চৈতন্য জীবনী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়। পাশাপাশি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের গান যে মহাপ্রভুর আস্বাদনীয় ছিল তারও কথা আছে। সুতরাং এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, মহাপ্রভু 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যের রস আস্বাদন করেননি। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাসের খ্যাতি হৃদয়গ্রাহী রচনায় মোহাবিষ্ট হয়েই মনে হয় বহু খ্যাত-অখ্যাত বৈষ(ব পদকর্তা তাঁদের রচিত পদে ভণিতায় নানা বিশেষণসহ 'চণ্ডীদাস' নামটি যুক্ত(করেছেন।

'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত রাধা-কৃষ(লীলা বিষয়ক রচনামাত্রই বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয়-গভীরে ভাব-উদ্বেলতা জাগিয়েছে। মধ্যযুগের বৈষ(ব পদকর্তা চণ্ডীদাসের তন্ময়-মন্ময়, নিরাবরণ-নিরাভরণ পদগুলিই জাতীয় জীবনে এনেছিল ভাব-বিহ্বল শ্রদ্ধা-ভক্তি(র প-াবনধারা। সেই সুযোগ গ্রহণ করে এবং চণ্ডীদাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতির অসঙ্গত আবেগে বহু অখ্যাত বাঙালি কবি অসার্থক পদ রচনা করে তার সঙ্গে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত(করে দিয়েছেন। যার ফলে আসল চণ্ডীদাসের রচনাসমূহ খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং 'চণ্ডীদাস

সমস্যা' জটিলতর রূপ লাভ করেছে। পালাগান রচনা করে গায়েনগণ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত(গানগুলি গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেয়। তাঁদের ভাবব্যাকুল হৃদয় বাছ-বিচারের ধার ধারত না, প্রকৃত মূল্যায়নের প্রয়োজনও বোধ করেনি। শ্রোতৃমণ্ডলীও একই পথের পথিক ছিল।

ঁনীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রথম পদাবলি প্রকাশের মুহূর্তেই 'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে প্র(া জাগে। চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত(বিভিন্ন পদাবলির মধ্যে রসগত পার্থক্য ও ত্র(মভঙ্গজনিত ত্রুটিও ছিল। এর সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে চণ্ডীদাস সমস্যা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন—শ্রীকৃষ(কীর্তন কাব্যগ্রন্থকে পদাবলির চণ্ডীদাসেরই অপরিণত বয়সের লেখা বলে চিহ্নি(ত করেন। তবে এ যুক্তি(পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যায়। ঁমণীন্দ্রমোহন বসু 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্যকে চৈতন্য পূর্বযুগে রচিত বলে চিহ্নি(ত করেন এবং এই কাব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আস্বাদন করেছেন বলে অভিমত পোষণ করেন। তিনি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলিকে চৈতন্য-উত্তর যুগের সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস রচিত প্রথম শ্রেণীর পদগুলি এবং অন্যান্য উপাধিধারী চণ্ডীদাসের পদগুলি নিয়েই 'চণ্ডীদাস সমস্যা' সমাধানের জগৎটি এখনও অনিশ্চিত। তবে আধুনিককালে কলিকাতা বি(বিদ্যালয়ের বাংলা গবেষণা বিভাগের প্রেরণায় শ্রীযুক্ত(হরেকৃষ(মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন বর্ধমান জেলার বনপাশ থেকে একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিতে 'দীন' চণ্ডীদাস 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস, শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় নানা পদ পাওয়া যায়। তবে এই গ্রন্থে 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামটি কোথাও নেই।

'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র 'বড়ু চণ্ডীদাস' ও পদাবলির চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি(নন—এ সম্পর্কে বর্তমানে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকলেও 'দীন চণ্ডীদাস' এবং পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' একই ব্যক্তি(কি না, এ ব্যাপারে অভিন্ন মতামত আজও ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' সমাধানে পরবর্তী গবেষণালব্ধ তথ্যাদির জন্য অপে(া করা ছাড়া উপায় নেই।

5.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' গ্রন্থ আবিষ্কার ও রাধাকৃষে(র প্রেমলীলা নিয়ে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত(বহু কবির বৈষ(ব পদসমূহ বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বড়ু, দ্বিজ, দীন, দীন(ীণ ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত(লেখাগুলি একই ব্যক্তি(র কি না—শ্রীকৃষ(কীর্তনের কবি ও বৈষ(ব পদাবলির চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত(পদগুলি একজনেরই রচনা কি না—এ বিষয়ে নানা মুনির নানামত থাকলেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ এই যে, শ্রীকৃষ(কীর্তনের কবি ও পদাবলির কবিগণ একই ব্যক্তি(নন। এই সমস্যার জট ছাড়াতে গবেষকগণ যে সব তথ্য দিয়েছেন তা ইতিহাসভিত্তিক না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার সঠিক সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঁনীলরতন মুখোপাধ্যায়, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ঁমণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ গবেষকদের চিন্তা-ভাবনাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করে এই বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি(নন, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

5.5 অনুশীলনী 1

1. নীচের প্র(গুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে প্রদত্ত সম্ভাব্য 4টি উত্তর থেকে বেছে টিক (✓) চিহ্(দিন উত্তরদানের পর এককের শেষে দেওয়া 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(ক) 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' রচনা করেছেন	1. বিদ্যাপতি
	2. বড়ু চণ্ডীদাস
	3. দ্বিজ চণ্ডীদাস
	4. কৃষ(দাস কবিরাজ
(খ) 'শ্রীকৃষ(কীর্তন'	1. গীতি-কবিতা
	2. নাট-গীতি
	3. প্রবন্ধ
	4. লোক সাহিত্য
(গ) 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্য রচিত	1. চৈতন্য-পূর্ব যুগে
	2. চৈতন্য-পরবর্তী যুগে
	3. অন্ত্য-মধ্যযুগে
	4. চৈতন্য-সমসাময়িক যুগে
(ঘ) চণ্ডীদাস-সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে	1. গবেষকদের ভিন্নমতের জন্য
	2. নানা বিশেষণযুক্ত(চণ্ডীদাসনামাঙ্কিত পদের জন্য
	3. অহেতুক
	4. সময় বিচার-বিভ্রাটের জন্য

5.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ(ব পদাবলি—বিদ্যাপতি

বাংলাদেশের অধিবাসী না হয়েও, বাংলা ভাষায় কাব্য না লিখেও যিনি বাঙালির হৃদয়ের কবিরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন—তিনি হলেন 'কবি সার্বভৌম' 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি। কবি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কবিরূপে তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। তবে, 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত বৈষ(ব পদাবলির জন্যই বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব থেকে বি(েকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিদ্যাপতির সৃষ্টি-ফসল সমাদৃত। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বিদ্যাপতির কবিখ্যাতিকে বাঙালীই পবিত্র হোমাগ্নির মতো র(া করিয়াছে।"

জন্ম ও বংশপরিচয় বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিস্ফী গ্রামে ঠাকুর পরিবারে কবির জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠক্কুর বা ঠাকুর। পিতামহ ছিলেন জয়দত্ত। কবির পিতা ও

পিতামহ পু(ষানুক্র(মে মিথিলার হিন্দুরাজসভার গু(ত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন। এই বংশগত সূত্রেই কবি কিশোর বয়সেই মিথিলার কামে(শ্বর বংশের রাজসভার সান্নিধ্যে আসেন। তিনি মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশের একাধিক রাজা ও তাঁদের পত্নীদের অনুগ্রহভাজন যে ছিলেন তার প্রমাণ 'কীর্তিলতা'র একাধিক ভণিতাংশ। রাজা কীর্তিসিংহের আমলে গ্রন্থখানি রচিত। 1402-1404 খ্রিস্টাব্দের ঘটনা নিয়ে ঐ সময়েই কাব্যখানি লিখিত হয় বলে গবেষকদের ধারণা। এই গ্রন্থে কবি নিজেকে 'খেলন কবি' বা 'খেলুড়ে কবি' বলেছেন। এতে মনে হয় কবি এই গ্রন্থখানিকে তাঁর কিশোর বয়সের সৃষ্টি বলে চিহ্নি(ত করতে চেয়েছেন। কারো কারো মতে গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হয়েছে।

কীর্তিসিংহের পর কবিকে পাওয়া যায় দেবসিংহের রাজসভায়। এই সময় তিনি 'ভূ-পরিক্র(মা' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে আছে কবি শিবসিংহের রাজসভাকবিরূপেই তাঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত অমর বৈষ(ব পদাবলি। বিদ্যাপতি সম্পর্কে সন-তারিখযুক্ত(তথ্যাদি যা কিছু পাওয়া যায় তা সবই শিবসিংহের রাজত্বকালের। 1410 খ্রিস্টাব্দে রাজা শিবসিংহের কবিকে প্রদান করা একটি দানপত্রের ব্যাপার নিয়ে নানা মতামত দেখা দিলেও বর্তমানে দানপত্রটি আগাগোড়া জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে 'বিদ্যাপতিকৃত লিখনাবলী' নামক সংস্কৃত পুঁথিতে 299 লক্ষ্মণ-সংবৎ অর্থাৎ 1418 খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ বারংবার আছে। এ ছাড়াও নানা তথ্য থেকে জানা যায়—কবি 1460 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন এবং শক্ত(সমর্থ ছিলেন। কবির আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে শ্রীযুক্ত(সারদাচরণ মিত্র ও জর্জ গ্রিয়ার্সন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ সমর্থন করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে 1380 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কবির জন্ম এবং 1460 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবি জীবিত ছিলেন। কবি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সার্বিক বিচারে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধের কোনো এক সময়ে আবির্ভূত হন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ-সপ্তম দশক পর্যন্ত কোন সময়ে দেহর(া করেন।

বিদ্যাপতি শিব, শক্তি(, বিষু(, সূর্য ও গণপতির উপাসনা করতেন বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। তবে পঞ্চোপাসক কবি সাধারণভাবে পৌরাণিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বৈষ(ব পদাবলির 'প্রার্থনা' পর্যায়ে বিদ্যাপতির পদগুলি এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে কবির বৈষ(বতা সম্পর্কে ভক্ত(গণ বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ বিদ্যাপতির গ্রন্থাদিতে নানা দেব-দেবীর বিষয় আছে, পৃষ্ঠপোষক রাজার জীবনকথাও আছে। সংস্কৃত, অবহট্ঠ, মৈথিল ভাষায় তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবিপ্রতিভা সম্পর্কে 'কীর্তিলতা'র ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছেন—

"তাঁহার প্রতিভা যে খুব উজ্জ্বল ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। উহা যে সর্বতোমুখী ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মতো স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই (ান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্য যে কত সত্য তা তাঁর গ্রন্থাবলি আলোচনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিদ্যাপতির 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী'—স্মৃতিগ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ে কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারশক্তি(র পরিচয় আছে।

'বর্ষত্রি(য়া', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তি(তরঙ্গিণী', 'শৈবসর্বস্বসার'—ইত্যাদি পৌরাণিক হিন্দুর পূজা-পার্বণ ও সাধনপদ্ধতির সংকলন গ্রন্থ।

'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা'—তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ। অপভ্রংশজাত মিশ্র অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত।

'ভূ-পরিত্র(মা'—ভৌগোলিকের তীর্থ পরিত্র(মা। মিথিলা থেকে নৈমিষ্যারণ্য পর্যন্ত বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা এতে আছে।

'পু(ষ পরী(া'—সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক, লোকায়ত গল্প আছে। উনিশ শতকে উইলিয়ম কেরির প্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য হরপ্রসাদ রায় গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করেন। রাজা শিবসিংহের জীবিতকালেই গ্রন্থখানির রচনা শু(, কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্বেই রাজার দেহাবসান ঘটে।

'গঙ্গাবাক্যাবলী' ও 'শৈবসর্বস্বসার' গ্রন্থ দুখানি শিবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহের পত্নী বি(্বাসদেবীর আশ্রয়পুষ্ট হয়ে কবি লিখেছেন।

এর পর রাজা নরসিংহদেব ও রাণী ধীরমতি দেবীর প(পুট ছায়ায় কবি রচনা করেন—'দানবাক্যাবলী' ও 'দুর্গাভক্তি(তরঙ্গিণী'।

দেশী ভাষায় অর্থাৎ 'মৈথিল' ভাষায় বিদ্যাপতি হর-গৌরী সম্পর্কিত পদাবলি ও সামান্য রাধা-কৃষ(বিষয়ক পদও রচনা করেন। মিথিলা থেকে গ্রিয়ার্সন সাহেব এরূপ কিছু পদ আবিষ্কার করেন।

কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যাপতি রচিত বৈষ(ব পদাবলির যে সব পদ পাওয়া গেছে তার সব পদই বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠ মিশ্রিত এক নূতন ভাষা। এই ভাষা 'ব্রজবুলি' নামে চিহ্নি(ত।

ব্রজবুলি ভাষার স্বরূপ পরিচয় 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির পদাবলির ভাষা কান্ত-কোমল ব্রজবুলি ভাষা। পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেবের মতে এই ভাষা হল—"a kind of bastard language—neither Bengali nor Maithili." অর্থাৎ উৎসহীন এই ভাষা বাংলা বা মৈথিল ভাষা নয়। পূর্বে বাঙালী কীর্তনীয়াদের বি(্বাস ছিল এ ভাষা 'ব্রজধাম'—অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা। কিন্তু বৃন্দাবন বা ব্রজের যে ভাষা—ব্রজভাষা পশ্চিমী অপভ্রংস তথা শৌরসেনী অপভ্রংশ থেকে জাত। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত পদাবলির ব্রজবুলি ভাষা মাগধী অপভ্রংশের বংশধর। কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিদ্যাপতির 'ব্রজবুলি'র প্রধান উপাদান মাগধী অপভ্রংশ হলেও, তাতে শৌরসেনী অপভ্রংশের কিছুটা মিশ্রণ আছে। কাজেই উপাদানের দিক থেকে এই ভাষা মৈথিলী, বাংলা এবং আংশিক হিন্দি তথা শৌরসেনী অপভ্রংশের সংমিশ্রণে গঠিত। এ ভাষাকে কিছুতেই মৌলিক ভাষা বলা যায় না। তিনি এই ভাষাকে একরূপ কৃত্রিম কবিভাষা বলে চিহ্নি(ত করেছেন। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস বৈষ(বপদ এই ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কবি জ্ঞানদাসও এই ভাষায় পদ রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অপরিণত বয়সে ব্রজবুলি ভাষার শব্দতরঙ্গ ও ধ্বনিমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ভানুসিংহের ছদ্মনামে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে উড়িষ্যা ও সুদূর আসামেও বিদ্যাপতির জীবিতকালে বা অল্পকাল পরে এই ব্রজবুলি ভাষায় যে পদ রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

ড. সুকুমার সেন 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী' নামক গ্রন্থে ব্রজবুলি প্রাচীন ঐতিহ্য বি(-ষণ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"মোরাঙ্গ—নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণ এবং অবহট্ঠের ঠাঁটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছিল।"

বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' কেন বলা হয়?

1875 খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে রাজকৃষ(মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে—মৈথিল ভাষা ও ব্রজবুলি ভাষায় রাধা-কৃষ(পদাবলি রচনা করে বিদ্যাপতি মিথিলার কাব্যকুঞ্জকে সুরমূর্ছনায় বিমোহিত করেছিলেন। সেই সুর মিথিলার সীমানা ছাড়িয়ে বাংলা, উড়িষ্যা, কামরূপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কবির প্রতি গভীর অনুরাগবশেই তাঁর ভক্ত(গণ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অর্ঘ্যস্বরূপ 'মৈথিল কোকিল' উপাধিতে কবিকে ভূষিত করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি কবিকুল গৌরব জয়দেব রাধা-কৃষ(লীলা-বিষয়ক 'গীতগোবিন্দম' কাব্য লিখে সমগ্র পর্ব ভারতের প্রাণের কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর কাব্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও তা ছিল সহজবোধ্য কোমল-মধুর। আদিরসের অভিসিঞ্চনে ছিল রসসিক্ত(। বিদ্যাপতিও ছিলেন রাজসভাকবি। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদগুলিও শৃঙ্গাররসে আপ্লুত ও রসানুভূতিতে পূর্ণ। উভয়ের পদেই 'বিলাস কলাকুতুহল'-এর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাই জয়দেব পরবর্তী রসজ্ঞ পাঠক ও ভক্ত(বৃন্দের কাছে বিদ্যাপতি—'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত হয়েছেন।

বাংলা ভাষায় না লিখেও কবি বিদ্যাপতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান কেন?

রামগতি ন্যায়রত্ন "বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ওপর বাঙালির দাবির যৌক্তি(কতা তত্ত্ব ও তথ্যসহ তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্ত(ব্যের কিছুটা অংশ হল—"বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবিশ্রেণীভুক্ত(বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িব না(যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশের এখনকার অপে(া অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন এবং এতদ্দেশীয় অনেক ছাত্র মিথিলা যাইয়া পাঠ সমাপন করিয়া আসিতেন।...অনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল এবং সম্ভবত উভয় দেশের 'ভাষায়'ও অনেকাংশে একবিধ ছিল(... অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলার এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইতেছে, তখন যে কবি জয়দেবের প্রণীত 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুসরণে রাধা-কৃষে(র লীলা-বিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সংগীত বঙ্গদেশের ধর্ম-প্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তি(ভরে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সংকীর্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সংগীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ(ব-সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারি না।" গ্রিয়ার্সন সাহেবও বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির বিস্তৃত প্রভাবের কথা বলেছেন। অ-বাঙালি হলেও বিদ্যাপতি বাঙলাদেশের ভাব-ভাবনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছেন যে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যুগ যুগ ধরে কাব্যরসপিপাসু বাঙালির হৃদয় তাঁর কাব্যরসধারায় অবগাহন করে তৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সমস্ত বৈষ(ব পদ সংকলনেই বিদ্যাপতির স্থান আছে। অদ্বৈতাচার্য, নরহরিদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ(ব কবিই বিদ্যাপতির বন্দনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বিদ্যাপতির পদের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র রচয়িতা কবিরাজ কৃষ(দাস গোস্বামী

মহাপ্রভুর মহাজন-কাব্যাস্বাদন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন—

"বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।।"

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' দেখা যায়—

"জয়দেব-বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ(চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।।"

এরূপ যশগাথা বিভিন্ন বৈষ(ব মহাজনদের গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

সব দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে বিদ্যাপতির স্থায়ী আসন লাভের যৌক্তি(কতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

বিদ্যাপতির পদাবলির মূল্যায়ন বিদ্যাপতির প্রতিভা ছিল বিচিত্রমুখী। মিথিলায় তাঁর প্রসিদ্ধি স্মার্ত ও রাজকীয় কীর্তি-কাহিনীর রূপকার হিসাবে। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি রাধা-কৃষ(প্রেমলীলাকেন্দ্রিক বৈষ(ব পদাবলির অতুলনীয় রূপদ(শিল্পী। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাঙালি পাঠক বিদ্যাপতির রসধারায় স্নাত হয়ে পদাবলির রসাস্বাদন করে তৃপ্ত। বিদ্যাপতি লৌকিক প্রেমজগৎ থেকে অলৌকিক প্রেমের জগতে পৌঁছেছেন। তাঁর সাধনা—মানব প্রেমকে রাধা-কৃষে(র প্রেমে রূপান্তরের সাধনা। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। রাধাচরিত্রের ত্র(মবিকাশের মধ্যেই বিদ্যাপতির কবি-কর্মের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা চরিত্রের তিনটি পর্ব—(ক) বয়ঃসন্ধি পর্ব, (খ) অভিসার মিলন-সম্ভোগ-মান পর্ব, (গ) মাথুর বা বিরহ পর্ব। এই তিনটি স্তরেই রাধা চরিত্র কবি সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন।

রাধার বয়ঃসন্ধিকাল—যৌবন আরম্ভের মুখে—স্বপ্নে বিভোর, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে ভরা। রাধার উপলব্ধি—"আওল যৌবন শৈশব গেল"। নবগাত প্রেমলগ্নে রাধার হৃদয় গভীরে বেদনার চেয়ে বিলাস বেশি প্রকাশ পেয়েছে। নব-অনুরাগের লীলাচাপল্যে মুখর শ্রীরাধিকা।—স্থৈর্য্য নেই।

"ঘনে ঘনে নয়ন কোণ অনুসরঙ্গ।
ঘনে ঘনে বসন ধূলি তনুভরঙ্গ।।"

রাধিকা নিজ শরীরে যৌবনের আবির্ভাব দেখে পুলক বন্যায় ভেসেছে—

"নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হমই সে আপন পয়োধর হেরি।।"

অঙ্গলাবণ্য ও বর্ণচ্ছটার সঙ্গে মাধুর্য ও সৌরভ মিশে বিদ্যাপতির রাধা বন-কুসুমের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

পূর্বরাগের পর্যায়েই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—চির প্রেমের চির অতৃপ্তির বাণী—

"জন্ম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এবং "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

অভিসারের পদে নব-অনুরাগিণী-রাধিকা অভিসারে চলেছেন—পথের সব বাধা, সংসার-সমাজ সব কিছুকে তুচ্ছ করে।

"নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা।।"

এই পর্যায়ে বিদ্যাপতি প্রকৃতপ(দেহ-সম্ভোগের কবি। তিনি শ্রীরাধাকে অলঙ্করণ মণ্ডলকলায় যেভাবে সাজিয়েছেন, তার ভাবরূপের যে চিত্র এঁকেছেন—তা তুলনারহিত। এর পরেই মধুর মিলনের "কিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কন কনকন কলরব নূপুর বাজে।" জয়দেবের ঐতিহ্য অনুসরণে এখানেই কাব্যের সমাপ্তি রেখা টানার কথা। কিন্তু বিদ্যাপতি তা করেননি। 'মাথুর' কৃষ(-হারা বৃন্দাবনে নেমে এসেছে ঘন অন্ধকার। রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে হৃদয় দীর্ণ ক(ণ আর্তি।

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

মাথুরের পর ভাবোল্লাস ও মিলন পর্যায়ে রাধার ভাবাকূতি এক আশ্চর্য রসাবেশে ভিন্ন রূপ পেয়েছে। কৃষ(কে অভ্যর্থনার জন্য আকূতি মেশানো রাধার নূতন আয়োজনের ব্যস্ততা—

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে।"

বিদ্যাপতির প্রেম ভাবনা এই পর্যায়ে দেহ থেকে দেহাতীত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রাধার ভাবমন্দিরে এক অতীন্দ্রিয় রসানুভূতি জেগেছে। চির নবীন প্রেমের জগতে দেখা দিয়েছে পুরাতন প্রেমের স্থায়ী দ্যুতি।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।।"

ভাব-বৃন্দাবনের এই মিলন-চিত্র নির্মাণে বিদ্যাপতি জয়দেবকে অতিত্র(ম করে—'অভিনব জয়দেবে'র অভিনবত্বকে প্রকাশ করেছেন।

'প্রার্থনা অংশে পরিণত বৃদ্ধ কবির কণ্ঠ ত্রিতাপদগ্ধ সকল মানুষের ঐকান্তিক প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। আত্মসমী(ার পথ ধরে জ্ঞান ও কর্মের অহংকারকে দূরে রেখে নিঃশর্তভাবে শ্রীকৃষে(র চরণে জীবন-মন সমর্পণ করে ভক্তি(নম্র চিত্তে কবির প্রার্থনা—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু
তুয়াপদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।"

শান্ত রসাশ্রিত প্রার্থনার পদগুলি নিঃসন্দেহে হৃদয়স্পর্শী।

ভাবের অতলান্ত গভীরতায়, শব্দ ঝংকারের লালিত্যে, ছন্দের অপরূপ সুষমায় ও অলংকরণ মণ্ডলকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাশ্রিত পদগুলি তুলনারহিত। পজ্ঝটিকা, দোহা, অ(রবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি উপমা, উৎপ্রে(া, রূপক, বিষম প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগে কবির শৈল্পিক

চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখ-বেদনা ও অতৃপ্তির পাশাপাশি তৃপ্তি ও উল্লাসের সীমাহীন রূপও বিদ্যাপতির পদগুলি জীবন আনন্দে ভরে তুলেছে। তাঁর মতো রসনিপুণ স্রষ্টা বিরল।

বিদ্যাপতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু বাঙালি কবি বিদ্যাপতির ছদ্মনামে বেশ কিছু পদ লিখেছেন। তবে প্রত্য(ভাবে গোবিন্দ দাসই বিদ্যাপতির যোগ্য ভাবশিষ্য। তিনি বিদ্যাপতির কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদও সম্পূর্ণ করেন এবং দুজনের ভণিতায় সেগুলি এখনও প্রচারিত। শ্রীরঘুনন্দনের এক ভক্ত(শিষ্য 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ রচনা করেন। তিনি কখনও কখনও 'বিদ্যাপতি' ভণিতাও ব্যবহার করেছেন। বি(েকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

"আমরা মৈথিল বিদ্যাপতির কুর্তা পাগড়ী খুলিয়া ধুতি চাদর পরাইয়াছি।"—আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের এই মন্তব্যটি যথার্থ ঐতিহাসিক ও বাস্তবসম্মত।

5.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

মিথিলার রাজসভাকবি হয়েও বিদ্যাপতি কীভাবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করলেন তা বিস্ময়কর। স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় চরম পাণ্ডিত্যের পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি ব্রজবুলি ভাষায় রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ দিয়ে রচনা করেছেন রসসমৃদ্ধ পদসমূহ। ভাষার লালিত্য ও অলংকারের মণ্ডল কলায় তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। শ্রীরাধার ত্র(মবিকাশ কবির হাতে সুস্নিগ্ধ পূর্ণরূপ পেয়েছে। 'সুখের কবি'—শৃঙ্গার রসের প-াবন ধারায়—প্রেমতরী ভাসিয়েছেন। পুলকবন্যায় ভেসে কবির রাধিকা 'নব অনুরাগিণী' হয়ে অভিসারে পা বাড়িয়েছে। কবির প্রভাবে গোবিন্দ দাস থেকে শু(করে রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছেন। নানা বিষয়ের গ্রন্থাদি লিখলেও বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি আজও বাঙালির হৃদয়গভীরে অনুরণন জাগায়। কবির জন্ম ও বংশপরিচয় থেকে শু(করে বিভিন্ন রাজা ও রানিদের সংস্পর্শে ও উৎসাহদান, কবির নানা সৃষ্টির সং(িপ্ত তথ্যাদির পর বিদ্যাপতির পূর্বরাগ থেকে শু(করে প্রার্থনার পদ পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনায়, কবির মূল ভাব-বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃতিসহ আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

5.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের বক্ত(ব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) দিয়ে দেখান। উত্তর করা হয়ে গেলে 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ছিলেন।	☐	☐
(খ) বিদ্যাপতি মধুর রসের কবি ছিলেন।	☐	☐
(গ) বিদ্যাপতি শুধুমাত্র ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা লিখেছেন।	☐	☐
(ঘ) বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস।	☐	☐
(ঙ) বিদ্যাপতি আধুনিক যুগের কবি।	☐	☐

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ ক(ন। এর পর 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন।

(ক) ..... বিদ্যাপতির জন্মস্থান।

(খ) ..... গ্রন্থখানি সংস্কৃতে লেখা।

(গ) ..... রাজসভাকবি রূপেই বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় কাব্য রচনা করেন।

(ঘ) বিদ্যাপতি ..... শেষার্ধ্বে আবির্ভূত হন।

(ঙ) ..... রচয়িতা কৃষ(দাস কবিরাজ।

(চ) প্রার্থনা অংশটি কবি বিদ্যাপতি ..... রচনা করেন।

5.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ)

বৈষ(ব পদাবলির চণ্ডীদাস

প্রাক্-চৈতন্য যুগে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ছাড়াও দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় বহু বৈষ(ব পদ পাওয়া যায়। পূর্বে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নিয়ে আলোচনা করা হলেও চণ্ডীদাসের ব্যক্তি(ত্ব নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' ও পদাবলির চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি(নন।—পদাবলির চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে বা সমকালে বৈষ(ব পদ রচনা করেন। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস ছিলেন "ভাবের রত্নাকর"। বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর পদসমূহকে '(দ্রা(ের মালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। সহজিয়া তত্ত্বকে আশ্রয় করে কবি কিছু হেঁয়ালি কবিতা রচনা করলেও রাধা-কৃষে(র প্রেমলীলা অবলম্বনে তিনি যে গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী ভাব-উদ্দীপক পদ রচনা করেছেন তার জন্যই কবি স্মরণীয় হয়ে আছেন। চণ্ডীদাসের পদগুলি চার-পাঁচশো বছর ধরে বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে রয়েছে। কবির খ্যাতিকে অবলম্বন করেই কবির ব্যক্তি(জীবন ও নানা অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। সীমাহীন জনপ্রিয়তার জন্যই বৈষ(ব সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'—গ্রন্থের তত্ত্ব ও তথ্যাদি অনুসারে চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি।

জন্মস্থান ও ব্যক্তি(পরিচয়—পদাবলির চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ও ব্যক্তি(পরিচয় সুস্পষ্টরূপে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কবির জন্মস্থান নিয়ে দুটি দাবি আছে। কেউ কেউ বলেছেন কবির জন্মস্থান বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে—অন্যদের দাবি কবির জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। নানা বাদ-বিতণ্ডা থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে স্বীকৃত কবির আবির্ভাবকাল চতুর্দশ শতাব্দীর উত্তরপর্বে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে। তবে এ ধারণা—অনুমানভিত্তিক।

কবি প্রতিভা—কৃষ(দাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে চণ্ডীদাসের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে—

"বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
চণ্ডীদাস কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দে।"

শ্রী(ে ত্রে আত্মভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেছেন, শত-শত বছর ধরে বাঙালি সমাজ চণ্ডীদাসের পদামৃত মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে গ্রহণ করে চলেছে। কবি চণ্ডীদাসের লেখনীতে পার্থিব প্রেম প্রাপ্তি-

অপ্রাপ্তি ও সুখ-দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর প্রেম যেন—'নিকষিত হেম।' কবি-সাধক চণ্ডীদাস শ্রীরাধাকে বাস্তব জীবনবোধ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে গেছেন। সহজিয়াধর্ম সাধনার পথ ধরে হাঁটলেও তার পদে রোমান্টিকতার ছোঁয়া আছে। 'যেমন আছ—তেমনি আসো আর করো না সাজ'।—ছিল কবির একান্ত কাম্য। যার ফলে তার পদ নিরাবরণ-নিরাভরণ হলেও—ভাবগভীরতায় অতলস্পর্শী। অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত(দূরবগাহী অনন্ত প্রেমের প্রদীপ-শিখা কবি জ্বেলেছেন।

'বঁধু-কি আর বলিব আমি।
জীবনে-মরণে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।'

এখানে রাধা প্রাণমন ঢেলে নিঃশর্তে শ্রীকৃষে(র চরণে আত্মনিবেদন করেছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথমাবধি কৃষ(প্রেমে বিভোর—আত্মহারা। কৃষে(র নাম শুনেই দিশেহারা—আত্মভোলা।

'বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।"

চণ্ডীদাসের পদসমূহ গৌড়ীয় বৈষ(ব দর্শন অনুযায়ী পর্যায়ত্র(মে ভাগকরা যায় না। তবু পূর্বরাগ, আ(পানুরাগ, অভিসার, নিবেদন পদগুলিতে চণ্ডীদাস সহজ, সরল অকৃত্রিম ভাষায় গভীর-ঐকান্তিক বিশুদ্ধ প্রেমের স্বর্ণ প্রতিমা গড়ে তুলেছেন।

'আ(পানুরাগে'র একটি পদে রাধিকা কুল-শীল-জাতি-মান তুচ্ছ করে কৃষ(গত প্রাণা হয়েছেন। রাধিকার হৃদয়-বেদনা সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। এজন্যই সমালোচক চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি'—বলে অভিহিত করেছেন।

অভিসার পর্বের—

"এ ঘোর রজনী-মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

পদটিতেও রাধিকা অন্তর-বেদনার দীর্ণ। পূর্বরাগের বিশিষ্ট কবি 'প্রেম বৈচিত্ত্য' ও আ(পানুরাগের পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন।

গীতি-প্রাণতা চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রাম বাংলার কবি নিজেকে রাধার বিরহ-আর্তি ও অনুভূতির সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। ভাবপ্রবণ কবিসত্তা কোমল-ক(ণ-সুন্দর। তাঁর গভীর প্রেমানুভূতিই রাধার মধ্যে প্রকাশিত কামনা-বাসনা যখন জগতের ঊর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় আত্মহারা ভাব আনতে স(ম হয়েছে।

"এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবুত দা(ণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।।"

আত্মমগ্ন অনুভূতির পথ ধরেই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের জগৎ ছেড়ে রাধিকা ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষে(র প্রেমের

জগতে ডুবে গেছেন। সূক্ষ্ম মিষ্টিক অনুভূতির ছোঁয়ায় চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনা রূপ থেকে অরূপের দিকে ধাবিত হয়েছে। চাওয়া-পাওয়ার জগতে যে সব চেয়ে আপনার-অন্তরের— সেই সবচয়ে দূরের—তাই গভীর আলিঙ্গ ন মুহূর্তেও চণ্ডীদাসের লেখনীতে চিরন্তর আর্তি—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।।"

চণ্ডীদাসের পদাবলি গভীর উপলব্ধির সামগ্রী—বিচার-বি(-ষণের বস্তু নয়। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কঠোর ব্রত-সাধনা স্বরূপে প্রেমসাধনা করাই চণ্ডীদাসের ভাব(সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে।"

চণ্ডীদাস সহজ-সরল ভাষায়, ত্রিপদী ছন্দে অতি সাধারণ অলঙ্কার ব্যবহার করেও রাধার অন্তর্বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন(তাতেই তাঁর শিল্প-চেতনার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। সহজ-স্বাভাবিক গতি ধারায় শব্দের সঙ্গে শব্দের মালা গেঁথে তিনি যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কবির রূপসিদ্ধির স্বরূপটি। এককথায় ভাব ব্যাকুলতা ও গভীরতায় চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে—"চণ্ডীদাসের এক একটি শব্দযোজনা, বাগ্‌ধারা আমাদের মনের তারে ঘা দিয়ে যে সুর সৃষ্টি করে তা অর্কেষ্ট্রা নয়, মেলডি নয়, সে যেন ভাষাহীন, প্রকাশহীন, ক(ণ বেদনার মর্মদাহ।"

চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য জ্ঞানদাস পরবর্তীকালে চণ্ডীদাসের ভাব-গভীরতা, রোমান্টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার মূর্ছনাকে—সঠিকভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি, 'সুখের কবি'। তাঁর পদাবলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নিটোল মুক্তে(ার মতো, তাঁর হাতে রাধিকা বাস্তব জীবনের পথ ধরে ক্র(মবিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। প্রেম ও সৌন্দর্য সম্ভোগের কবি নিপুণ শিল্পীর মতো প্রেমের রত্নহার গড়েছেন। তাঁর কাব্য যেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। ভাষার লালিত্যে, অলঙ্করণে, সাজ-সজ্জায়, এক কথায় প্রকাশ কলা সৌষ্ঠবে বিদ্যাপতি এক অনন্য কবি। বিরহ অর্থাৎ মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির কবি-ভাবনা গভীর।

অন্যদিকে চণ্ডীদাস গ্রাম বাংলার কবি। সহজ-সরল বাংলা ভাষায় আশা-ভাষা ও ভালোবাসা দিয়ে তন্ময় চিত্তে, ধ্যানীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি রাধা-কৃষে(র লীলারস সৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন। প্রাণের আবেগে—মন্ময় চিত্তে তিনি অতীন্দ্রিয় প্রেমের জগতে ডুবে গেছেন। তাঁর কবিতাকে সমালোচক '(দ্রা(র মালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিদ্যাপতির পদ 'ভাষার তাজমহল' আর চণ্ডীদাস যেন 'ভাবের রত্নাকর'। বিদ্যাপতির কবিতাকে ঊর্মিমুখর সমুদ্রের সঙ্গে আর চণ্ডীদাসের কবিতাকে ধ্যানগম্ভীর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। চণ্ডীদাস 'দুঃখের কবি'। বাসুলীর উপাসক কবি চণ্ডীদাস আত্মভাবে বিভোর হয়ে পদ রচনা করেছেন। প্রকাশ কলার সৌন্দর্য্যে যেমন বিদ্যাপতি— তেমনি অনুভব-সুন্দর প্রেমের সার্থক স্রষ্টা চণ্ডীদাস।

5.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

বীরভূম জেলার নান্নুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের কবি চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামীণ জীবনের সারল্য তাঁর সৃষ্টির চরণে-চরণে আছে।

তিনি সহজ সুরের মরমিয়া কবি ছিলেন। 'দুঃখের কবি'—চণ্ডীদাস রাধা-কৃষে(র প্রেমলীলাকে গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন। তাঁর খ্যাতিকে অবলম্বন করেই একাধিক কবি ঐ নামে পদ রচনা করেছেন। সহজিয়া ধর্মসাধনার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কবি রোমান্টিক জগতে পৌঁছেছেন। নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তভাবে তাঁর সৃষ্ট রাধিকা শ্রীকৃষে(র চরণে আত্মনিবেদন করেছে। বিদ্যাপতির মতো তাঁর রাধিকার ত্র(মবিকাশ নেই। পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়েই রাধিকা তাঁর হাতে হয়েছে সাধিকা। নিরাবরণ-নিরাভরণ সাজে তিনি পদগুলির রূপ দিয়েছেন। রাধিকার হৃদয় বেদনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে ঝরে পড়েছে। বাস্তবজগত থেকে শ্রীরাধিকা-ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের জগতে নিমগ্ন হয়েছে। তাঁর লেখায় সূক্ষ্ম মিষ্টিক অনুভূতির ছোঁয়া আছে।

5.11 অনুশীলনী (তৃতীয় অংশ)

1. নীচের প্র(গুলি একে একে উত্তর ক(ন। পরে 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) চণ্ডীদাস
1. শহরের কবি
2. রাজসভার কবি
3. গ্রামীণ কবি
4. বাণিজ্যিক এলাকার কবি

(খ) চণ্ডীদাস
1. সুখের কবি
2. দুঃখের কবি
3. নৈরাশ্যের কবি
4. আশাবাদী কবি

(গ) 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' পদটি
1. পূর্বরাগের
2. প্রার্থনার
3. মাথুরের
4. অভিসারের

(ঘ) 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটির রচয়িতা
1. বিদ্যাপতি
2. চণ্ডীদাস
3. গোবিন্দদাস
4. জ্ঞানদাস

2. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে ঘরগুলিতে টিক চিহ্((✓) দিয়ে চিহি(ত ক(ন এবং 57 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি(।	☐	☐
(খ) 'যেমত যোগিনী পারা' পদাংশটি পূর্বরাগের।	☐	☐
(গ) চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস।	☐	☐

3. মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসের 'চণ্ডীদাস সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা ক(ন।
4. 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র সূচনা কোন্ সময় বুঝিয়ে বলুন।
5. 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র আবিষ্কর্তা ও রচয়িতা সম্পর্কে সং(পে আলোচনা ক(ন।
6. বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' কেন বলা হয়, সং(পে বলুন।
7. মৈথিলী বা ব্রজবুলিতে বৈষ(বপদ রচনা করা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গে কেন আলোচনা করা হয়, বলুন।
8. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অবদান সম্পর্কে সং(পে আলোচনা ক(ন।
9. চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি' বলার কারণ কী, বুঝিয়ে বলুন।
10. চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সং(পে আলোচনা ক(ন।

5.12 উত্তর সংকেত

5.12.1 অনুশীলনী 1

1. (ক) বড়ু চণ্ডীদাস, (খ) নাট-গীতি, (গ) চৈতন্য পূর্বযুগে, (ঘ) নানা বিশেষণযুক্ত(পদের জন্য।

5.12.2 অনুশীলনী 2

1. (ক) ঠিক, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল।

2. (ক) বিস্ফি গ্রাম, (খ) পু(ষ পরী(া, ভূ-পরিত্র(মা, (গ) শিব সিংহের, (ঘ) চতুর্দশ শতাব্দীর, (ঙ) চৈতন্য চরিতামৃতে, (চ) জ্ঞান ও কর্মের অহঙ্কারকে দূরে রেখে/ভক্তি(নম্র চিত্তে।

5.12.3 অনুশীলনী 3

1. (ক) গ্রামীণ কবি, (খ) দুঃখের কবি, (গ) অভিসারের, (ঘ) বিদ্যাপতি।

2. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক।

3. 3 থেকে 10 নম্বর প্র(ের উত্তর আপনার পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তাই পুনরাবৃত্তি করা হ'ল না।

5.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ড. (দিরাম দাস।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ড. (ত্র গুপ্ত।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ড. ভূদেব চৌধুরী।

একক 6 ❑ অনুবাদ সাহিত্য

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য
6.2 প্রস্তাবনা
6.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) রামায়ণ
6.4 সারাংশ
6.5 অনুশীলনী 1
6.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মহাভারত
6.7 সারাংশ
6.8 অনুশীলনী 2
6.9 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ভাগবত
6.10 সারাংশ
6.11 অনুশীলনী 3
6.12 উত্তর সংকেত
6.13 গ্রন্থপঞ্জি

6.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলাভাষায় অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গ্রন্থাদি কোন্ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রে(াপটে— কোন্ কোন্ রচনাকারের দ্বারা কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, তা জানতে পারবেন।
- রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকগণের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা তথ্যাদি জেনে তাঁদের সৃষ্টি সম্ভারের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসুর কবি-জীবন ও তাঁদের বাংলা অনুবাদশাখায় অবদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন এবং প্রত্যেক লেখকের ভাবনা ও রচনাশৈলীর মৌলিক পার্থক্যগুলিও ধরতে পারবেন। এছাড়া এই ত্রিধারা অনুবাদ কর্মে অন্যান্য খ্যাত-অখ্যাত কবিদের সং(প্ত পরিচিতি ও তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু ধ্যান-ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

6.2 প্রস্তাবনা

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বাংলা ভাষায় অনূদিত হবার ফলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মধ্যযুগের এই অনুবাদ-সাহিত্য বাঙালি চিন্তা-চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মূল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই ভাষা ছিল দুরূহ(উচ্চবর্গের শি(িত ও জনমণ্ডলীর মধ্যেই এইসব গ্রন্থের পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ বাঙালির প(কাব্যরস আস্বাদন ছিল দুঃসাধ্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—(প্রথম পর্যায়)-এর ৩য় এককে তুর্কী আত্র(মণ ও তার ফলাফল সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। এই এককে বিদেশী পাঠান সুলতানদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কীভাবে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভিত গড়ে উঠল, তা জানতে পারবেন এবং হতমান জাতীয় জীবনে আলোচ্য ত্রয়ীকাব্য বাঙালি মানস বিবর্তনে, কীভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে, তারই ইঙ্গিত পাবেন।

হুবহু আ(রিক অনুবাদের রীতিকে বর্জন করে সংস্কৃত মূল গ্রন্থাদির বিষয়াদি সং(পে, কোথাও কোথাও নূতন ঘটনা-কাহিনী সংযোজন করে, পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত অনুবাদ গ্রন্থ বাঙালির হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ও মালাধর বসুর ভাগবত রচিত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক। বিভিন্ন লেখকদের কথা উল্লেখ করে মূলত কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসুর অবদানই মূলপাঠ হিসাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। এছাড়া রামায়ণের অনুবাদকরূপে চন্দ্রাবতী, কবিচন্দ্র চত্র(বর্তী, অদ্ভুত আচার্য(মহাভারতের বাংলা রচয়িতা কবীন্দ্র পরমে(ের, শ্রীধর নন্দী প্রমুখের সং(প্ত পরিচিতি ও অবদান এবং ভাগবতকে কেন্দ্র করে নানা রূপে লেখা রঘুনাথ, কৃষ(দাস, বলরাম দাস প্রমুখ স্রষ্টাদের সৃষ্টির কথাও আপনাদের জানার জগৎকে সমৃদ্ধ করবে।

6.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) রামায়ণ

কৃত্তিবাস খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অন্ধকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দু'শো বছরের অধিককাল সাহিত্য অঙ্গনে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হবার কারণ—তুর্কী আত্র(মণ, মহম্মদ ঘোরীর ভারত আত্র(মণ এবং সম্ভবত 1199 খ্রিস্টাব্দে তাঁর অনুচর বত্তি(য়ার খিলজীর বাংলাদেশ আত্র(মণ। বঙ্গে(ের লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আত্র(মণের প্রতিরোধ না করেই বঙ্গদেশকে তুর্কী শাসনের কবলে তুলে দেন। শু(হয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রক্তে(র প-াবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কী শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিকও উদঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালবাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, এই বোধ ও চেতনার দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশী শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন (কনুদ্দীন বারবক শাহ (1459-1474), হুসেন শাহ (1493-1519) এবং তাঁর পুত্র নসরৎ খাঁ (1519-1532)। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রে(াপটে আদি কবি বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন তিনি হলেন 'এ বঙ্গের অলঙ্কার' কৃত্তিবাস ওঝা।

কবি পরিচিতি কবি পরিচিতি প্রদানের আগে সং(পে কৃত্তিবাসের বংশলতিকার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হলো।

কবিপ্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়—তাঁর পিতৃপু(ষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। পরে কবির পূর্বপু(ষ নরসিংহ ওঝা ওরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার 'ফুলিয়া' (ফুলমালঞ্চ) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়—

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া বাখালি।
দ(িণে পশ্চিমে বাহে গঙ্গা তরঙ্গিণী।।

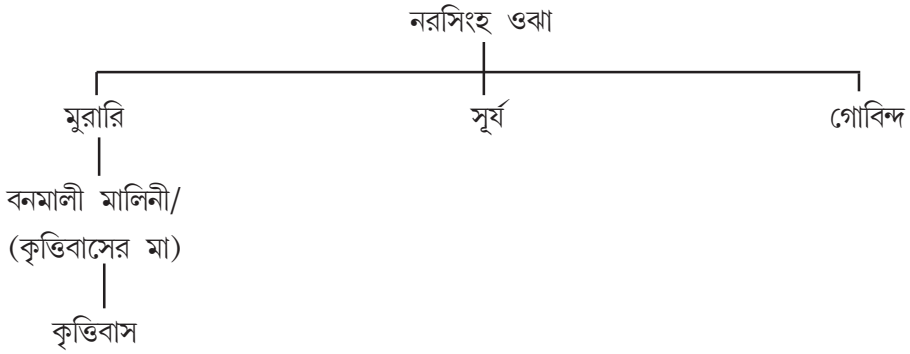

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী (মেনকা)। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবি তার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

"আদিত্য বায় শ্রীপঞ্চমী পূণ্য (পূর্ণ) মাঘমাস।
এথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

—এই (োকে সঠিক সাল তারিখের উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি (োকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন—তেরশকুড়ি শকে অর্থাৎ 1398-1399 খ্রিস্টাব্দের 16 মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন, রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার 'পুণ্য' শব্দটিকে 'পূর্ণ' ধরে হিসাব করে দেখালেন 1432-1433 খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস-সম্মত তা বিচার্য। কৃত্তিবাসের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড়গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শি(া সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি (োক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি (োকের মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চন্দনজলে অভিষিত্ত(করেন, মাল্যভূমিত করেন, পট্টবস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, লেখক তাঁর গ্রন্থে গৌড়েশ্বরের নামটি কোথাও উল্লেখ করেননি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হচ্ছেন রাজা গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল 1414 থেকে 1418 খ্রিস্টাব্দ, কবির জন্ম যদি 1398-1399 খ্রিস্টাব্দে হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে, কেউ কেউ আবার কৃত্তিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমঙ্গল-বিধৃত কৃত্তিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং (কনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইনি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং, কৃত্তিবাসের জন্মবৃত্তান্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের

(ে ত্রে বহু মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মপরিচয়' (-াক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "কৃত্তিবাস মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হননি।" সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃত্তিবাসের উপস্থিতি যুক্তি(যুক্ত(মনে করেন।

কাব্য পরিচিতি পিতামাতার আশীর্বাদ আর গু(র কল্যাণকে কার্য-সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃত্তিবাস 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন।

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি সং(েপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আ(রিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে অনেক কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মত করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হলো—'আদি', 'অযোধ্যা', 'অরণ্য, 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'সুন্দর', 'লঙ্কা' ও 'উত্তর'। বি(্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বি(্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন সরস উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবান হরণ ইত্যাদি। কৃত্তিবাস যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন 'আদি' ও 'লঙ্কাকাণ্ড'। গল্পরসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি(র পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক বলিষ্ঠতা লাভ করেছিল, কৃত্তিবাসের হাতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল ফেলব বাঙালির চরিত্রের মত হয়েছে। শ্রীরামের প্রেম-ক(োঘন মূর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বঙ্গবধূ, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের স্ত্রৈণ বৃদ্ধ স্বামী। কৈকেয়ীর মধ্য দিয়ে অভিমান(ধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকী রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভক্তি(রসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির 'শূরধর্মী' কাব্য হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী'—কৃত্তিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাব্যখানি কোমল উজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালির সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, "কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় কবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তাঁর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালির ভোজনরসিকতা, আলস্যপরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে, এসবের সঙ্গে ভক্তি(প্রেমের উদ্বেলতাও ল(ণীয়। বাঙালির আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সব কিছুই সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে খেতে দিয়েছিলেন—মতিচুর, মণ্ডা, স(াকলী, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাঁপর ইত্যাদি। এইসব খাবারের সঙ্গে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধূর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন।

উদাহরণ ঃ "প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপআদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্র(মে ক্র(মে সবাকার কৈল বিতরণ।।

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছয়দিনে 'ষষ্ঠীপূজা', আটদিনে 'অষ্টনোই', তেরোদিনে 'জননী সৌচান্ত', ছয়মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর। ক(ণরস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অন্ধমুনির পুত্রবধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের 'শক্তি(শেল' ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্-ুত করেছে(সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভক্তি(রসে ও উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবনরসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবনরসে ভরা গ্রন্থখানি তাই যুগাতীত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসূদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃত্তিবাসের কাব্য বাংলার জনজীবন অমৃতরসের মত চিরকাল আস্বাদন করছেন।

কৃত্তিবাসের নামে এখন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পাচ্ছে। কালত্র(মে মূল ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারী উইলিয়ম কেরির উদ্যোগে 1802-1803 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে তার সবই শ্রীরামপুরী সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত। 1830-1834 খ্রিস্টাব্দে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পুরাতন ভাষাকে মেজে-ঘসে রামায়ণের এক নূতন সংস্করণ বের করেন। সকল দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ হিসাবে কৃত্তিবাসের নামটি স্বর্ণা(রে লিখিত থাকবে।

কৃত্তিবাস ছাড়া যাঁরা রামায়ণের অনুবাদ করেছেন তাঁদের সং(প্ত পরিচিতি ও গ্রন্থাদির মূল্যায়ন করা হ'লো।

(ক) চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি হিসাবে চন্দ্রাবতীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি ষোড়শ শতকের শেষভাগে কাব্যখানি রচনা করেন। চন্দ্রাবতী রচিত 'রামায়ণ' গানের সমষ্টি এবং গ্রন্থখানিও অসম্পূর্ণ। আধুনিক বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতা দ্বিজবংশী দাস ছিলেন মনসামঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গান আঞ্চলিক সীমাতেই আবদ্ধ ছিল। কাব্যটি মহিলা সমাজে খুবই জনপ্রিয়। বিবাহাদি ক্রি(য়াকর্মে এটি গাওয়া হয়।

(খ) কবিচন্দ্র চক্র(বর্তী ষোড়শ শতাব্দীর কবিচন্দ্র চক্র(বর্তী বিষু(পুরের রাজসভার কবি ছিলেন। অনেক গবেষক 'কবিচন্দ্র'কে কবির উপাধি বলে মনে করেন। কবির রামায়ণ খুবই জনপ্রিয়। অনেকের ধারণা— কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি প্র(প্ত কাহিনী রচনায় কবিচন্দ্রের হাত আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'অঙ্গদ রায়সর' ও 'তরণীসেন বধ' রচনায় কবিচন্দ্রের হাত আছে মনে করা হয়। শঙ্কর চক্র(বর্তী সম্ভবত কবির আসল নাম। তাঁর রামায়ণ 'বিষু(পুরী রামায়ণ' নামে খ্যাত।

(গ) অদ্ভুত আচার্য অদ্ভুত আচার্য সপ্তদশ শতকের কবি। কবির আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। ইনি 1647 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রঘুবংশ থেকে অনেক কাহিনী কবি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে কবি নিত্যানন্দ 'অদ্ভুত আচার্য' নামে পরিচিত। আধুনিক বাংলাদেশের

পাবনা বিকল্পে রাজসাহী জেলায় কবির নিবাস ছিল। সমগ্র উত্তরবঙ্গে কবির রামায়ণ গানের আদর-কদর ছিল। কবির প্রকাশভঙ্গিতে সহজ কবিত্ব ও আত্মরিকতার পরিচয় আছে।

6.4 সারাংশ

বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ণের আদি কবিরূপে কৃত্তিবাস সর্বজনবিদিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংস্কৃতের আ(রিক অনুবাদ নয়, রচনায় তিনি স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালির (চি-রস অনুযায়ী কাব্যকে সাজিয়েছেন। তাঁর হাতে সংস্কৃত কাব্যের চরিত্রগুলি বাঙালির ঘরোয়া আদর্শ চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ভক্তি(রসের প-াবনে কাব্যখানি ভেসে গেছে। এই রসের জন্যই 'মুদির দোকান থেকে রাজপ্রাসাদ' পর্যন্ত আপামর বাঙালির চিত্তকে কবি জয় করতে স(ম হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে কালধর্মানুযায়ী কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূল সুরটি আজও বজায় আছে। আদিকবি বাল্মীকির 'শূরধর্মী' কাব্য কৃত্তিবাসের হাতে হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী'।

কৃত্তিবাস ছাড়া রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে চন্দ্রাবতী, কবিচন্দ্র চত্র(বর্তী ও অদ্ভুত আচার্যের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে কৃত্তিবাসই জাতীয় কবি রূপে সুচিহ্নি(ত।

6.5 অনুশীলনী 1

1. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিকে টিক (✓) চিহ্ন(দিয়ে চিহ্নি(ত ক(ন

	ঠিক	ভুল
(ক) কৃত্তিবাস পাঁচালির ঢঙে মূল রামায়ণকে পরিবেশন করেছেন।	☐	☐
(খ) কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'শূরধর্ম' প্রাধান্য পেয়েছে।	☐	☐
(গ) উইলিয়ম কেরির উদ্যোগে প্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হয়।	☐	☐
(ঘ) নিত্যানন্দ আচার্যই 'অদ্ভুত আচার্য' নামে খ্যাত।	☐	☐
(ঙ) কৃত্তিবাসের রামায়ণ পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত নয়।	☐	☐

2. নীচের বিবৃতিগুলির নীচে দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে যেটি সঠিক তার ডানপাশের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন(দিয়ে চিহ্নি(ত ক(ন।

(ক) "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস" চরণটির 'পুণ্য' শব্দকে 'পূর্ণ' ধরে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি হিসাব করে কৃত্তিবাসের জন্ম নির্ধারণ করেন

1. 1398-1399 খ্রিস্টাব্দ 16 মাঘ(☐
2. 1432-1433 খ্রিস্টাব্দ(☐
3. 1500 খ্রিস্টাব্দ(☐
4. 1600-1650 খ্রিস্টাব্দ(☐

(খ) কৃত্তিবাসের হাতে সীতা হয়েছেন

1. লজ্জাশীলা বাঙালি বধূ(☐
2. শি(তা নাগরিক বধূ(☐

3. উগ্র মেজাজের বধূ(☐

4. অমার্জিত বধূ ☐

(গ) কৃত্তিবাসের রামায়ণ হয়েছে

1. ভারতের জাতীয় মহাকাব্য(☐

2. বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য(☐

3. সমগ্র পৃথিবীর মহাকাব্য(☐

4. আঞ্চলিক মহাকাব্য। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন।

(ক) কৃত্তিবাসের গ্রন্থ ——————ঢঙে রচিত।

(খ) শ্রীরামচন্দ্রের——————মূর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(গ) কৃত্তিবাসের হাতে দশরথ হয়েছেন————।

(ঘ) কৃত্তিবাসের পিতা———— মাতা ————।

(ঙ) অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে কৃত্তিবাস———— দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

6.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মহাভারত

আঠারো পর্বে রচিত বিরাট কাব্যগ্রন্থ হলো মূল সংস্কৃত মহাভারত। বেদব্যাসের এই গ্রন্থ প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কয়েকজন কবি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্মরণ করে এবং এদেশের শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। তবে কাশীরাম দাসের মহাভারতের কাছে অন্যান্য অনুবাদকদের সৃষ্টি অনেকটাই ম্লান। কাশীরাম দাসের পূর্বে কোনো কবিই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা দিতে স(ম হননি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাঁরা মহাভারতের অনুবাদ করেন তাঁরা হলেন—(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও (খ) শ্রীকর নন্দী। এই দুই কবির সংি(প্ত পরিচয় হলো—

(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা বলে গণ্য করা হয়।

বাংলার সুলতান হুসেন শাহ 1493 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম জয় করে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত(হন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দু গ্রন্থাদির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে তিনি সভাকবিরূপে নিযুক্ত(করে মহাভারতের অনুবাদ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পরমেশ্বর অনুবাদ সংি(প্ত। কাব্যগুণে সমৃদ্ধ না হলেও পরমেশ্বর কাব্য সহজ-সরল ভাষায় লিখিত। তাঁর রচিত মহাভারতের নাম 'পাণ্ডব বিজয়' বা 'মহাভারত পাঞ্চালিকা'। 'কবীন্দ্র' কবির উপাধি। মূল তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে তিনি মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শুধু কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন। গবেষকদের মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বরই মহাভারতের প্রথম অনুবাদক বলে চিহ্নি(ত।

(খ) শ্রীকর নন্দী—কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমসাময়িক বা অল্প কিছুকাল পরে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 'অশ্বমেধ' পর্বটি রচনা করেন। পাণ্ডবদের যাগ-যজ্ঞাদি, যুদ্ধমহিমা ইত্যাদি ছুটি খাঁ পছন্দ করতেন।

শ্রীকর নন্দী 'জৈমিনি মহাভারত'-এর 'অশ্বমেধ পর্ব' অবলম্বনে সংক্ষেপে মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' অনুবাদ করেন। এখানে কবি লিখেছেন—

শুনিব ভারত পোথা অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনির পুরাণ সংহিতা।।।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।

লঘুকৌতুক হাস্য-পরিহাসের উচ্ছল-উজ্জ্বলতায় কাব্যখানি ভরা। কবির রচনাশৈলীও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের চেয়ে অনেকটা ভাল।

(গ) সঞ্জয়—সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি পুঁথি আবিষ্কারের ফলে সঞ্জয় নামে একজন মহাভারত অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষকের মতে 'সঞ্জয়' নামে পৃথক কোনো কবির অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে পরমেশ্বরের কাব্যই সঞ্জয়ের মহাভারত। উভয় গ্রন্থের নিকট সাদৃশ্যের জন্যই এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কবি ভনিতায় নিজের নাম উল্লেখ না করে মহাভারতের সঞ্জয়ের নামের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। পরমেশ্বরের গ্রন্থের অনেকটা অংশই সঞ্জয়ের রচনায় পাওয়া যায়। মাঝে-মধ্যে তাঁর নিজের লেখার চিহ্ন ছিটেফোঁটা আছে। রচনাশৈলীও উন্নতমানের নয়।

সঞ্জয় লিখিত মহাভারতের পুঁথি পাঠ করে গবেষকগণ মনে করেন—কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের। সঞ্জয় সম্পর্কে এতদিনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক মুনীন্দ্র কুমার ঘোষের সম্পাদনায় সঞ্জয়ের মহাভারত প্রকাশিত হবার পর। বর্তমানে সঞ্জয় পৃথক রূপেই স্বীকৃত।

কাশীরাম দাস কৃত্তিবাসের মত বাঙালির জীবন-জিজ্ঞাসায় যিনি নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি হলেন, মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক—কাশীরাম দাস।

পরিচিতি বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগনার ব্রাহ্মণী নদী তীরে সিঙ্গি (সিদ্ধি) গ্রামে কায়স্থ বংশে কবির জন্ম। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও এই শতকের শেষের দিকে তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন। পিতার নাম কমলাকান্ত। বংশটি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। কাব্যখানি সমাপ্ত হয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে।

"চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শকসুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।।"

—এই দুটি চরণ থেকেই যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিমশায় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিরাট পর্বটি শেষ হয়েছে 1604 খ্রিস্টাব্দে। তবে, কিংবদন্তী আছে যে, আদি, সভা, বন ও বিরাটের কিছুটা অংশ রচনার পর কাশীরাম দাসের স্বর্গলাভ ঘটে। বাকি অংশটা কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দরাম সম্পন্ন করেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, শান্তি পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বসু ও জয়ন্ত দাসের রচিত। তবে একথা ঠিক যে পূর্বের পর্বগুলির সঙ্গে শেষের পর্বগুলির তুলনাত্মক বিচার করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে—ভিন্ন হাতের ছোঁয়া আছে। কবির ভাষায় সাবলীলতা শেষাংশে নেই। কিংবা কাশীরামের বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ী ভঙ্গিমাও অনুপস্থিত।

মধুসূদন দত্ত কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সনেটে লিখেছেন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।

—কবির কাশীরামের প্রতি এই অর্ঘ্য যথার্থ। কৃত্তিবাসের কাব্যের মত কাশীরাম দাসের ভারত পাঁচালিও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে যুগে যুগে নন্দিত-বন্দিত।

কাব্য পরিচিতি কাশীরাম বংশানুত্র(মিকভাবে বৈষ(ব ছিলেন। চৈতন্য ঐতিহ্যই ছিল তাঁদের বৈষ(ব চেতনার উৎসমূলে। চৈতন্য ঐতিহ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাশীরাম তাঁর কাব্য উপহার দেন—যার ফলে মহাভারতের উদাত্ত বীর্যগাথা কোমল-স্নিগ্ধ প্রেমকথায় রূপান্তরিত হয়েছিল। মহাভারতের কৃষ(ধনঞ্জয় বীরত্বের আসন ছেড়ে বাংলার পেলব-কোমল মূর্তি ধারণ করেছে কাশীরামের হাতে। বাঙালি জীবনের ঐতিহ্য তুলে ধরাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কবি ব্যাসদেবকে হুবহু অনুসরণ করেননি। পর্বগুলির নামকরণের (ে ত্রেও অনেক হেরফের ঘটিয়েছেন। মূলের অনুশাসন পর্ব ও মহাপ্রস্থানিক পর্ব কাশীরামে নেই। আবার দু-একটি পর্বের নামেরও পরিবর্তন করেছেন। মহাকবির কল্পনা, ঐ(র্য ও রস-গভীরতা কবির তেমন না থাকলেও পাণ্ডিত্য এবং লোকোত্তর কবিত্বগুণে ভারতকথাকে তিনি সর্বজনের আস্বাদন যোগ্য করে তুলেছেন। মূলের কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন যেমন করেছেন তেমনি নূতন কাহিনী ও কল্পনার সংযোজন করেছেন। শ্রীবৎস্যচিন্তা, সুভদ্রাহরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে কাব্যখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। তৎসম শব্দের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও পয়ার এবং একাধিক ধরনের ত্রিপদী ছন্দে কাব্যখানি সংগ্রথিত হওয়ায় কাব্যপাঠের (ে ত্রেও নূতন সুর, তাল, লয় এসেছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও কবির পাণ্ডিত্য ছিল। এজন্য সমালোচক বলেছেন, "কবির অলঙ্কার নির্বাচন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত এবং রূপানুভূতির উল্লাস স্পন্দনে মূর্ত।" ক(ণ রস সৃষ্টিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রিয়পুত্র অভিমন্যু বধের পর অর্জুনের মর্মভেদী আর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল

"কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায়।।"

কয়েকটি রেখায় এমন অব্যর্থ ক(ণ রসের সৃষ্টি সত্যিই দুর্লভ। বীর ও হাস্যরসের মিশ্রণে কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ(ে ত্রে "দণ্ড হাতে যম আর বজ্র হাতে ইন্দ্র" সমভয়ংকর ভীম-অর্জুন যে দিকে চাইছেন ঠিক সে মুহূর্তেই বিপ(দলের "হেলায় সকল সৈন্য তুলা যেন ধায়"—দৃশ্যটি ক(ণ ও হাস্যবহ। তবে কৃত্তিবাস যুদ্ধ বর্ণনায় গাছপালা ও পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি করে যে কৃত্রিম আবহ-পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন সেখানে কাশীরাম দাস অনেকটাই রণোন্মাদনার সাহসিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অনুবাদে কবির হাতে প্রায় সর্বত্রই ব্যাসদেবের শূরধর্মী চরিত্রগুলি শূরত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এর পেছনের ধ্যানধারণা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের মর্মকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। তাই এই কাব্য কবি যেমন একা রচনা করেননি, তেমনি সমাজমানসও প্রত্য(-পরো(ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এজন্যই বাংলার ঘরে ঘরে কাব্যখানি এত সমাদৃত।

6.7 সারাংশ

অষ্টাদশ পর্বে রচিত সংস্কৃত মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে এক বিস্তৃত যুগের সমাজ ও জীবনাদর্শ, বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হবার পরই মহাভারতের অনুবাদের প্রতি

বাঙালি কবিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তবে প্রথমদিকে ভক্তি(রসপ্রিয় বাঙালির কাছে মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ কাহিনী তেমন সমাদর পায়নি। এছাড়া মহাভারতে রামায়ণের মতো গল্পরস তেমন নেই। ন্যায়, নীতি, রাজধর্ম, প্রজাধর্ম ইত্যাদি নানা তত্ত্ব ও সেই সঙ্গে শ্রীকৃষে(র মহিমা ও ভাগবতধর্ম প্রচারের ফলশ্রুতিতে মহাভারত রামায়ণ কাহিনীর মত সরল নয়—জটিল হয়ে উঠেছে। তবু মুসলমান শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমে(ের ও শ্রীকর নন্দীর হাতে মহাভারতের অনুবাদ-ধারার সৃষ্টি। এই ধারার সঙ্গে পরবর্তী কালের কবি বাংলা মহাভারতকার কাশীরাম দাসের নামই বাঙালির কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। "বাঙালি চরিত্রের ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং ভক্তি(রসের অনাবিল প্রবাহ কাশীরামের মহাভারতখানিকে হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় করিয়াছে।"

সমালোচকের বক্ত(ব্যটি যথার্থ। এর সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে কাশীরামের সহজ কবিত্ব। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই কাশীরাম তার কাব্য রচনা করেন। প্রবাদ আছে—আদি, সভা, বন আর বিরাট— এই চারটি পর্ব রচনার পরই কাশীরাম দাস দেহত্যাগ করেন। পরবর্তী পর্বগুলি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস সমাপ্ত করেন। সঠিক বিচারে বলা যায়, বাঙালি জীবনের ঐতিহ্যকে কাশীরাম দাস যথার্থভাবে তুলে ধরতে স(ম হয়েছেন। কবি ব্যাসদেবকে হুবহু অনুকরণ করেননি। পর্বগুলির নামকরণের ব্যাপারে অদল-বদল ঘটিয়েছেন। সংস্কৃত মূল মহাভারতের অনুশাসনপর্ব ও মহাপ্রস্থানিকপর্ব কাশীরামের গ্রন্থে নেই। বীর ও হাস্যরসের মিশ্রণে কাব্যখানি সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কাশীদাসী মহাভারত সত্যই 'অমৃত সমান'। আজও বাঙালি সেই অমৃতপানে তৃপ্ত।

6.8 অনুশীলনী 2

1. নীচের প্র(গুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য 5টি উত্তর থেকে বেছে টিক ( ) চিহ্(দিন। উত্তর শেষে এককের সমাপ্তিতে দেওয়া 73 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(ক) কবীন্দ্র পরমে(ের 'পাণ্ডববিজয়' গ্রন্থ রচনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—
1. হুসেন শাহ
2. পরাগল খাঁ
3. ছুঁটি খাঁ
4. (ক্নুদ্দিন বরবক্ শাহ
5. রাজা শশাঙ্ক

(খ) সংস্কৃত মূল মহাভারত গ্রন্থের পর্ব সংখ্যা—
1. বারো
2. দশ
3. আঠারো
4. চৌদ্দ
5. কুড়ি

(গ) মহাভারতের জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন—
1. সঞ্জয়
2. শ্রীকর নন্দী
3. কবীন্দ্র পরমে(ের
4. কাশীরাম দাস
5. অনি(দ্ধ

2. নীচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ ক(ন।

(ক) মহাভারতের অনুবাদ————————প্রভাবের পূর্বেই আরম্ভ হয়।

(খ) মহাভারতের অনুবাদকেরা অনেকেই ————————আনুকূল্য পেয়েছিলেন।

(গ) মহাভারত————————রসপ্রধান কাব্য।

(ঘ) শ্রীকর নন্দী————————অবলম্বনে মহাভারতের অনুবাদ করেন।

(ঙ) কবীন্দ্র পরমে(ধরের গ্রন্থের নাম————————।

(চ) কাশীরাম দাস———————— জেলার ———————— পরগনার ———————— গ্রামের লোক ছিলেন।

6.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) ভাগবত

রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ-ধারা বাঙালি জীবনে যে প-াবন এনেছিল, সে তুলনায় ভাগবতের অনুবাদ ধারাটি অনেকাংশেই ম্লান। ভাগবতের অনুবাদকর্মের প্রথম পর্যায়টি বিশেষভাবে চিহ্নি(ত হলেও, চৈতন্য প্রভাবে পরবর্তী যুগের অনুবাদে নূতন নূতন কাহিনীর সংযোজন অনুবাদের ধারা (ুগ্ন হয়ে কাব্যটি 'কাহিনীকাব্য'ধর্মী হয়ে ওঠে।

রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের কাহিনী বাংলাদেশে অতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। এর মূল কারণ—রামায়ণ-মহাভারতের সর্বজনীন আবেদন—ভাগবতের সেটি ছিল না। ভাগবতে নীরস যুদ্ধ-ঘটনার বাড়াবাড়ি। তাছাড়া চৈতন্য ভক্ত(দের কাছে ভাগবতধর্ম অনুসরণযোগ্য না হওয়ায়—ভাগবতের অনুবাদধারা ম(পথে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ভাগবতের অনুবাদকর্মের শ্রেষ্ঠ রূপকার—মালাধর বসু। তাঁর জীবন পরিচিতি ও কাব্যধারার বিস্তৃত বিবরণ নীচে আপনারা পাবেন।

মালাধর বসু আদি কাব্যগুলির বাংলা কাব্যে অনুবাদের যে প-াবন আসে সেই পথ ধরেই মালাধর বসুর আবির্ভাব। তাঁর অনূদিত গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীকৃষ(বিজয়'। তিনি শ্রীকৃষে(র পবিত্র জীবনকথা, যা ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত-এ সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন, তা 'গুণরাজ খান' উপাধিধারী মালাধর বসু জনজীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কর্মের মূলগত উদ্দেশ্য ও প্রেরণা সম্পর্কে কবি জানিয়েছেন,

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে গাই পাঁচালি রচিয়া।।

অথবা, "ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।।"

লোকজীবনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে লোকবোধনের এই আকাঙ(া কৃত্তিবাসের মত মালাধর বসুও স্পষ্ট ভাষায় যেমন ব্যক্ত(করেছেন তেমনি প্রয়োগেও তা অ(রে অ(রে পালন করেছেন। এই কাব্য অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাংলার লোকচেতনা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ভাবনার সঙ্গে সংযোগ সাধনের ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিল। এছাড়া বৃহত্তর ভারতের বৈষ(ব দর্শনের ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনার মূলেও এই অনুবাদগ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম। এইজন্যই চৈতন্যদেব স্বয়ং মালাধর বসুর কাব্যখানিকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কবির ব্যক্তি(পরিচিতি বর্ধমান জেলার বিখ্যাত কুলীন গ্রামের বসু পরিবারে পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে (সম্ভবত 1420-25 খ্রিঃ) কবি আবির্ভূত হন। পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কবির পুত্র ও পৌত্র নবদ্বীপ লীলার অন্তরঙ্গ ভক্ত(ছিলেন।

গ্রন্থ পরিচিতি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ(বিজয়'-এর প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে রচনার কালজ্ঞাপক একটি পয়ার পাওয়া যায়,

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরাম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"

—এই পয়ারটি প্রমাণ হলে এই গ্রন্থকেই বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখ যুক্ত(প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে চিহ্নি(ত করা যায়। ড. সুকুমার সেন গ্রন্থ রচনার কালকে প্রামাণিক বলে উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে এই বর্ষীয়ান কবি অনুবাদ-কর্মটি সমাপ্ত করেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব হতে তখনও ছয় বছর বাকি। এই গ্রন্থ আরম্ভের সময় গৌড়ে্শ্বর ছিলেন (রুকনুদ্দিন বারবক্ শাহ। গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয় তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহের সময়। বিদ্যোৎসাহী (রুকনুদ্দিনই মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন। বেশ বিনয়ের সঙ্গে সেকথা কবি কাব্যে উল্লেখ করেছেন,

"গুণ নাহি অধম মুঞি(নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়ে্শ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।"

কাব্যের নামকরণটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'বিজয়' শব্দটির দুটি আভিধানিক অর্থ আছে। (1) জয়লাভ, (2) মহাপ্রয়ান। সমগ্র কাব্য জুড়ে শ্রীকৃষে(র জয়সূচক লীলাকথা এবং কাব্যশেষে তাঁর মানবলীলা সংবরণের কথা ব্যক্ত(হয়েছে। সুতরাং কাব্যের শীর্ষনামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর গভীর সাদৃশ্য থাকায় 'শ্রীকৃষ(বিজয়' নামটি সুসংগত হয়েছে।

ব্যাসদেব 12টি স্কন্ধে শ্রীকৃষে(র মাহাত্ম্য তুলে ধরেছিলেন, নানা তত্ত্বকে জুড়ে দিয়ে। কিন্তু মালাধর বসু সমগ্র সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ না করে দশম ও একাদশ স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের অংশবিশেষ সং(পে সরল ভাষায় অনুবাদ করেন। আদ্য, মধ্য, অন্ত—এই তিনটি খণ্ডে যথাত্র(মে বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। পাঁচালির ঢঙে লিখিত এই কাব্যগ্রন্থ, তাই গ্রন্থখানিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, আদিকবি ব্যাসদেবের মত কোনও তত্ত্বকথার উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই। আবার দানলীলা, নৌকাবিলাস, রাসরঙ্গ প্রভৃতি ভাগবত বহির্ভূত অনেক বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি কাব্যখানিকে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করেছেন। তাই সামগ্রিক বিচারে আমরা কাব্যখানিকে শ্রীমদ্ভাগবত-এর আ(রিক অনুবাদ বলতে পারি না, বরং বলতে পারি ভাবানুবাদের পথ ধরে কবি যেন এক নবসৃষ্টি করেছেন। বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কবি এই অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে ভাগবত কাহিনীর অনুসরণ করেছেন মাত্র। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষে(র ঐশ্বর্যলীলাই প্রাধান্য পেয়েছে। তুর্কী আত্র(মণে বিধ্বস্ত জাতীয় জীবন হয়েছিল পলায়নমুখী। সেই হতোদ্যম জাতীয় জীবনকে সংগ্রামী আলোয় আলোকিত করতেই, মরা গাঙে জোয়ার আনতেই, কবির এই প্রচেষ্টা। আগাগোড়া গ্রন্থের গল্পাংশ ও উপস্থাপনা ল(্য করে মনে হয়—ভয়ার্ত মুমূর্ষু জাতির সব জড়তা ল(্য করেই শ্রীকৃষে(র ঐশ্বর্যময় শক্তি(কে তুলে ধরে কবি জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছেন। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। প্রয়োজনবোধে তিনি 'উপমা', 'উৎপ্রে(া', 'ব্যতিরেক' প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

"রঙ্গন পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বদন"।

(ক্মিণীর রূপ বর্ণনায় এই ব্যতিরেক অলঙ্কারটি নিঃসন্দেহে যথার্থ সমাজ পরিবেশ থেকে কবি সংগ্রহ করতে কার্পণ্য করেননি।

"কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝড়ে।"

কিংবা, "লাঙ্গলের ইস যেন দন্ত সারি সারি।"

—শেষের উপমাটিতে পুতনা রা(সীর দন্ত পঙ্ক্তি(র তী[তার সঙ্গে কৃষিপ্রধান দেশের অতি পরিচিত লাঙলের তী[ফলার তুলনা করেছেন। বাৎসল্য রসের প্রকাশে কবি সিদ্ধহস্ত।

"তবে আমি যশোদা কৃষ(কোলে করি।

কাঁদিতে কাঁদিতে বলে শুনহ শ্রীহরি।।"

—এখানে স্নেহার্তিমাখা মাতৃমূর্তিটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। এর পাশাপাশি মাতা-পুত্রের স্নেহ-ভালবাসার অতলান্ত রূপটিও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাষায় কবি তুলে ধরেছেন। ক(ণরসের সৃষ্টিতেও কবির মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"আর না যাইব সখি কল্পত(মূলে।

আর কানু সঙ্গে সখি না গাঁথিব ফুলে।।"

কৃষ(ফেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।

কৃষে(র সা(াতে মৈলে কৃষ(পাবে লাজ।।

অথবা, কানু হেন ধন সখী ছেড়ে দিব কারে।। —প্রভৃতি পঙ্ক্তি(

—প্রত্যাসন্ন কৃষ(বিরহের ব্যথায় শ্রীরাধিকা ও সখীদের মর্মভেদী বেদনার এ যেন সার্থক বাণীচিত্র। কৃত্তিবাসের কাব্যের মত এ কাব্যেও বাঙালি পরিবেশ ও পটভূমিকা রয়েছে। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। এই কাব্যে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ(রাখালদের সঙ্গে মনের আনন্দে ভাতই খেয়েছে। মা গোপালকে ডেকে বলেন,

"ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাস্থল আসিও।"

—চিত্রটি বাংলার মাতা-পুত্রের সজীব সম্পর্কযুক্ত(। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি পরিবেশ আম-কাঁঠাল, সুপারির ছায়ায় স্নিগ্ধ। এই কাব্যে "নন্দের নন্দন কৃষ(মোর প্রাণনাথ"—এই বাক্যটি আছে। বাংলা সাহিত্যে কৃষ(কে 'প্রাণনাথ' বলে সম্বোধন মালাধার বসুই প্রথম করেছেন। এর মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেব আপন অন্তরের বাণীকে খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি(র বীজ যেন এই গ্রন্থেই লুকিয়ে ছিল। তাই তিনি এই কাব্যকে প্রিয়জ্ঞান করেছেন এবং কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বলেছেন,

"তোমার কা কথা-তোমার গ্রামের কুক্কুর।

সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর।।"

স্বয়ং মহাপ্রভুর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি মালাধর বসুকে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় করে রাখবে। মালাধরের কাব্য ও জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যযুগের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। এইজন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মালাধর বসু যুগস্রষ্টা না হলেও যুগসন্ধির সংযোগকারী মহাকবি।

চৈতন্য পরবর্তী ভাগবতের অনুবাদকদের জন্য রঘুনাথ, কৃষ(দাস আধা-পরিচিত। এই পর্বে ভাগবতের অনুবাদের চেয়ে কৃষ(প্রণয়লীলাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু আলোচ্য কবিদ্বয় ভাগবতের যে অনুবাদ করেছেন,

সেখানে, লৌকিক প্রণয়লীলাগুলিকে বর্জন করেই অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেছেন। এজন্য ভাগবতের অনুবাদক হিসাবে রঘুনাথ ও কৃষ(দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনের সম্পর্কে সং(প্ত আলোচনা নীচে করা হ'লো।

1. রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনাথ তাঁর ভাগবত অনুবাদ সমাপ্ত করেন। লেখকের গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ(প্রেমতরঙ্গিণী'। তিনি প্রত্য(ভাবে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগ ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কবিকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দান করেন। মূল ভাগবতের সব স্কন্ধই রঘুনাথ অনুবাদ করেন। তবে দশম-একাদশ স্কন্ধে কবি মূলকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। ভাগবতের অনুবাদধারার মূল স্থাপয়িতা মালাধর বসুকে রঘুনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে গোপলীলা অংশগুলি পল্লবিত নয়—অনেকটা সংযত, সংহত।

রঘুনাথের সংস্কৃতে অগাধ জ্ঞান ছিল। তথ্যনিষ্ঠা ও ভাবসংযমের জন্য তাঁর সৃষ্টি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। ভাগবতের জটিল তত্ত্বকে কবি কাহিনীর পাশাপাশি সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কোনো স্থানে তাঁর রচনায় বৈষ(ব পদাবলির লালিত্য ও মাধুর্যও প্রকাশ পেয়েছে। রঘুনাথের লেখায় ভাগবতের পৌরাণিক ঐতিহ্যটি বিশুদ্ধ অনুবাদ-পর্বের পরিচয় বহন করে। চৈতন্যের আনুকূল্য সত্ত্বেও অনুবাদে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তি(বাদের প্রভাব পড়েনি।

2. কৃষ(দাস কবি কৃষ(দাস ছিলেন মহাভারতের অগ্রণী অনুবাদক কাশীদাসের বড় ভাই। কৃষ(দাসের গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ(বিলাস'। গবেষকদের মতে গ্রন্থখানি যোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত। এই অনুবাদ গ্রন্থে দানলীলা, নৌকালীলা বাদ পড়েছে। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় ভাগবতের বাইরের নানা প্রসঙ্গ কৃষ(দাসের অনুবাদ গ্রন্থে স্থান পেলেও ভাগবতের অনুবাদধারায় কৃষ(দাসের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

3. বলরামদাস বলরামদাসের 'কৃষ(লীলামৃত' অনেকাংশেই মূলানুযায়ী হয়েছে। তবে তাঁর লেখায় ভাগবতের সঙ্গে 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'র কিছুটা অনুসরণ ঘটেছে। এ ছাড়া নন্দরাম ঘোষ, লক্ষ্মীনাথ, ভক্ত(রাম দাসও খণ্ড খণ্ড পালা রচনা করেছেন। ভাগবত আশ্রয়ী এই লেখাগুলি 'ব্রজলীলা কাহিনী'র পথ ধরেই লিখিত।

6.10 সারাংশ

রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ-ধারার পাশাপাশি ভাগবতের অনুবাদকর্মও প্রাক্‌চৈতন্যযুগেই শু(হয়। এই ধারার শ্রেষ্ঠ লেখক মালাধর বসু। তাঁর কাব্যের প্রচার দেশব্যাপী থাকলেও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের মতো ছিল না। ভাগবত পুরাণ-তত্ত্ব এক প্রচারধর্মী সাহিত্য হবার জন্য রামায়ণ-মহাভারতের শিল্প-সৌন্দর্য এখানে তেমন ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ ছিল সার্বজনীন। কিন্তু কৃষে(র ঈ(রযুক্তি(র তত্ত্বাশ্রয়ী কাব্য ভাগবত ছিল মূলত বৈষ(ব সম্প্রদায়ের। গার্হস্থ্য জীবনের ছোঁয়ায় এবং বিচিত্র জীবনলীলার ছন্দে রামায়ণ মহাভারত স্নাত, অন্যদিকে ভাগবতে দেখা যায় যুদ্ধের ঘনঘটা।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ(বিজয়' গ্রন্থের রচনাকাল 1395 শক থেকে 1402 শকের মধ্যে। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (কনুদ্দিন বারবক শাহ। কবির বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুবাদত্র(মের জোয়ারের ফলেই কবির মনে যে উৎসাহ ও প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি তাঁর

'শ্রীকৃষ(বিজয়' গ্রন্থ। পুরাণ-বর্ণিত হিন্দুধর্মের আদর্শ জনসাধারণের হৃদয়দ্বারে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গ্রন্থখানি রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করেই তিনি কাব্যখানি লেখেন। ভাগবতের দুটি অংশ বেছে নিয়ে অনুবাদ করলেও এর মধ্যেই শ্রীকৃষে(র আবির্ভাবের কারণ এবং তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীর্তি-কাহিনী কবি শিল্পসম্মতভাবে অঙ্কন করেছেন। মূলের প্রতি নিষ্ঠা রেখেও বাঙালির নিজস্ব মানসিকতা তিনি বিসর্জন দেননি। সার্থক অনুবাদের আদর্শ মালাধর বসুর লেখায় দেখা যায়। তাঁর অনুবাদকর্মে মূলের প্রতি বি(েস্ততা যেমন আছে, তেমনি রচনানৈপুণ্যও তুলনাহীন।

চৈতন্যোত্তর যুগে রঘুনাথ 'শ্রীকৃষ(প্রেমতরঙ্গিণী' রচনা করেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত কবি সং(েপে অনুবাদকর্মটি করলেও মূল কাব্যের কোনো গু(ত্বপূর্ণ অংশই বাদ দেননি। তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও ভাষা সংযমে তাঁর রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে লিরিক মূর্ছনা ভিন্ন স্বাদ এনেছে। শ্রীকৃষে(র গৌরাঙ্গ অবতারের আভাসও এ কাব্যে দেখা যায়।

এ যুগের অপর অনুবাদক—কৃষ(দাস, অমর মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস-এর অগ্রজ। তাঁর গ্রন্থে ভাগবতের বাইরের নানা প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়েছে। আলোচ্য তিনজন অনুবাদক ছাড়া ভাগবতকে আশ্রয় করে বলরাম দাস, নন্দরাম ঘোষ, লক্ষ্মীনাথ, ভক্ত(রাম দাসও খণ্ড-খণ্ড পালা রচনা করেছেন।

6.11 অনুশীলনী 3

1. নিম্নলিখিত রচয়িতাদের গ্রন্থগুলির নাম কিছু ঠিক এবং কিছু ভুল দেওয়া আছে। কোন্‌টি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্(দিয়ে দেখান। এর পর 73 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ(মঙ্গল'।	☐	☐
(খ) কৃষ(দাস রচিত 'শ্রীকৃষ(বিলাস'।	☐	☐
(গ) রঘুনাথ রচিত 'শ্রীকৃষ(ভাবতরঙ্গিণী'।	☐	☐

2. নিচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ ক(ন।
   (ক) মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন _____।
   (খ) মালাধর বসুর কাব্য রচনাকাল _____।
   (গ) মালাধর বসু ভাগবতের _____ও _____স্কন্ধ সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন।
   (ঘ) ভাগবতের প্রকৃত অনুসরণে অনুবাদকর্মে ভাঁটা পড়েছে _____ পর্ব থেকে।
   (ঙ) রঘুনাথের গ্রন্থের নাম _____।

6.12 উত্তর সংকেত

5.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ঠিক।
2. (ক) (II), (খ) (I), (গ) (II)।
3. (ক) পাঁচালীর, (খ) প্রেম ক(াঘন, (গ) স্ত্রৈণ, (ঘ) বনমালী ও মালিনী, (ঙ) (কনুদ্দিন বারবক শাহের।

5.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) পরাগলি খাঁ, (খ) আঠারো, (গ) কাশীরাম দাস।
2. (ক) চৈতন্য, (খ) শাসকদের, (গ) বীর, (ঘ) জৈমিনি মহাভারত, (ঙ) পাণ্ডব বিজয়, (চ) বর্ধমান, ইন্দ্রাণী, সিঙ্গি বা সিদ্ধি।

5.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল।
2. (ক) (ক্নুদ্দিন বারবক শাহ, (খ) 1395 শকাব্দ—1402 শকাব্দের মধ্যবর্তীকাল, (গ) দশম, একাদশ, (ঘ) চৈতন্য, (ঙ) শ্রীকৃষ(প্রেমতরঙ্গিণী।

6.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ড. ভূদেব চৌধুরী।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (ে(ত্র গুপ্ত।

একক 7 ❑ মঙ্গলকাব্যধারা

গঠন

7.1 উদ্দেশ্য
7.2 প্রস্তাবনা
7.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মনসামঙ্গল
7.4 সারাংশ
7.5 অনুশীলনী 1
7.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) চণ্ডীমঙ্গল
7.7 সারাংশ
7.8 অনুশীলনী 2
7.9 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) ধর্মমঙ্গল
7.10 সারাংশ
7.11 অনুশীলনী 3
7.12 উত্তর সংকেত
7.13 গ্রন্থপঞ্জি

7.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- মঙ্গলকাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত(হওয়ার নানা ব্যাখ্যা জানতে পারবেন—সেই সঙ্গে এই কাব্যসমূহ রচনার বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কারণগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।
- তিনটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনী সং(প্ত সূত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কাহিনীগুলি আপনারা পাঠ করেছেন, তাই বিস্তৃতভাবে কাহিনীর বিবরণ তুলে না ধরে আপনাদের স্মৃতিকে জাগ্রত করার মতো সং(প্ত উপাদানগুলি দেওয়া হলো।
- বিভিন্ন কালের চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের কবি-পরিচিতি ও তাঁদের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—যা পাঠ করে আপনারা প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের স্রষ্টাদের সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তিনটি মঙ্গলকাব্যের সমাজচিত্র সম্পর্কে আপনাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।
- মঙ্গলকাব্য রচনার পেছনে যে ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কারণ প্রত্য(রূপে এবং রাজনৈতিক পটভূমি পরো(রূপে ছিল—তারও ইঙ্গিত পাবেন।
- পুরাণজাতীয় সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যে মেলবন্ধন মঙ্গলকাব্যে ঘটেছিল—তারও নানা তথ্য আপনারা পাবেন।

7.2 প্রস্তাবনা

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই দীর্ঘ 400 শত বছর ধরে বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যধারায় স্নাত। মূলত চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল—এই তিনটি ধারায় মঙ্গলকাব্যের জগৎ সমৃদ্ধ। চৈতন্যপূর্ব যুগে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি। মনসামঙ্গল রচয়িতার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এই তিন মঙ্গলকাব্য ছাড়া বাংলা সাহিত্যে অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল থাকলেও এই এককে এই সব মঙ্গলকাব্যের অলোচনা করা হয়নি। মূলত আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ তুর্কী আত্র(মণের পূর্বে শু(হলেও তুর্কী বিজয়ের পর—বিদেশী শক্তি(র অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যালীলা ইত্যাদির ফলে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দেয়—তা থেকে মুক্তি(পেতে এবং আত্মর(ার তাগিদেই অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মিলনের জন্য হাত বাড়ায় লোকায়ত সংস্কৃতির দিকে। ধীরে ধীরে অনার্য দেব-দেবী, গ্রাম্য ও লৌকিক দেব-দেবীও সমাজের উন্নত পর্যায়ে সমাদরে গৃহীত হয়। চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর এভাবেই বাংলা সাহিত্যের বুকে স্থায়ী আসন লাভ করে। মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণের আদর্শে রচিত। ঐতিহাসিক নানা বিষয়ের সঙ্গে লৌকিক ব্রতকথাও মঙ্গলকাব্যের উৎসভূমিতে রয়েছে। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন বাঙালির বহির্বাণিজ্যের ও নৌ-বিদ্যার ইতিহাস এবং ধর্মমঙ্গ লে নানা যুদ্ধাদির মধ্যে পাল রাজাদের শৌর্য-বীর্য, বাঙালি-ডোম সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। মনসামঙ্গ লের দ্বিজবংশীদাস, কেতকাদাস, ে(মানন্দ, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য, মুকুন্দ চত্র(বর্তী এবং ধর্মমঙ্গলকাব্যের রূপরাম চত্র(বর্তী ও ঘনরাম চত্র(বর্তী স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মঙ্গল দেব-দেবীর মধ্যে চণ্ডী ও পার্বতীর মিলন ঘটেছে। তবে অনার্য চণ্ডী ব্যাধজীবনের সঙ্গে যুক্ত(বনদেবীরূপে চিহ্নি(ত। মনসাদেবীর উৎসে রয়েছে সর্পপূজা, সিজগাছ পূজা—সন্তান, উৎপাদন-শক্তি(র উপাসনা। ধর্মঠাকুরের ভিত্তিমূলে আছে আদিম প্রস্তর উপাসনা এবং সূর্যপূজা। পৌরাণিক তান্ত্রিক দেব-দেবী পরিকল্পনা অনার্য বি(্বাসের সঙ্গে যুক্ত(হয়ে নানারূপে ও নামে মঙ্গলকাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি কাব্যে উচ্চমার্গীয় দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতা নেই—আছে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত(আশা-নিরাশার ছন্দ ও ভয়-ভীতি নিবারণের দিক।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা কল্পলোকের নয়—একান্ত মানবিকরূপেই চিহ্নি(ত। অলৌকিক (মতার অধিকারী হয়েও লৌকিক হিংসা-দ্বেষ-লোভ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের সহযাত্রী। দেবত্বের আবরণে রক্ত(-মাংসে গড়া মানবিক রূপটিই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মধ্য দিয়ে কবিগণ ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের বাস্তব ও জীবনচিত্রে মঙ্গলকাব্য সমৃদ্ধ। এই কাব্যধারায় দেবতা উপল(মাত্র, মানুষই তাঁদের প্রধান ল(্য। এজন্যই চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা, মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, বেহুলা, ধর্মমঙ্গলের লাউসেন এতো জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

'মঙ্গল' নামটি কাব্যের সঙ্গে যুক্ত(হলো কেন? এ নিয়ে নানা মত দেখা যায়। তবে নিম্নলিখিত মতগুলি গ্রহণযোগ্য

(ক) মঙ্গলকাব্যগুলি 'মঙ্গল রাগে' গীত হতো।

(খ) এই কাব্যগুলির গান এক মঙ্গলবারে শু(হতো এবং পরের মঙ্গলবারে শেষ হতো।

(গ) 'মঙ্গল' শব্দটি দ্রাবিড় শব্দ। এর অর্থ হলো 'গমন' বা 'যাওয়া' (To move or to go) অর্থাৎ কোনো স্থায়ী মঞ্চে মঙ্গলকাব্য গীত হতো না। এ পাড়া ও পাড়া, এ গ্রাম-সে গ্রাম ঘুরে ঘুরে গাওয়া হতো।

(ঘ) সাধারণ অর্থে যে গ্রন্থ ঘরে রাখলে, পাঠ করলে কিংবা পূজা করলে মঙ্গল হয়— সেই কাব্যও 'মঙ্গল' নামে চিহ্নিত হয়েছে। তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত জাতীয় জীবনের এই ধারণা অমূলক নয়।

মঙ্গলকাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটি প্রয়োগের যে একাধিক মতামত পাওয়া যায় তার কোনোটিকেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য মঙ্গলকাব্যের রচনারীতি গতানুগতিক। প্রায় সব কবিই স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেয়ে কাব্য লিখেছেন। কাব্যের শুরুতে গণেশ-বন্দনা দেখা যায়। কাব্যের নায়ক-নায়িকারা শাপভ্রষ্ট দেবতা। পৃথিবীতে এসে নানা যন্ত্রণা ভোগ করে দেবতার অনুগ্রহে আবার তাঁরা স্বর্গে ফিরে যান। মর্ত্যে পূজা প্রচারের কাঙ্গালপনার দেবতাদের আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের মতো দেখা যায়। 'বারমাস্যা' ও 'চৌতিশা' প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেই আছে। মঙ্গলকাব্যের নানা দিক আলোচনার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবির কবিবৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ত কাহিনীসহ এই এককে আলোচনা আছে। এ সব পাঠ করে মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তরও আপনারা দিতে পারবেন।

7.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মনসামঙ্গল

সর্পদেবী হচ্ছেন 'মনসা'। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সাপের উপদ্রব ভয়ংকর। সর্প দংশনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই লোকায়ত সাংস্কৃতিক জীবনে মনসাদেবীর পূজার প্রচলন। এই মনসা পূজার সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই 'মনসামঙ্গল' রচিত। মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ বাংলায় 'মনসামঙ্গল', 'ভাসান' বা 'রয়ানি' হিসাবে গীত হ'তো। এই দেবীর উৎস এবং রূপের বিবর্তন নিয়ে মতভেদ থাকলেও মনসা যে অনার্য দেবী এ-কথা সকলেই স্বীকার করেছেন।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর 'মনচা আম্মা' বা 'মনে মাঞ্চি' থেকেই মনসা শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। ড. সুকুমার সেনের মতে "আদি দেব নিরঞ্জনের কামবাসনোদ্ভূতা সর্পরাজ্ঞী মনসার সঙ্গে পর্বতবাসিনী কুমারী বিষবিদ্যার ও সিজবৃক্ষ পূজার সংযোগের ফলে পাঁচালী কাব্যের মনসা সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁর মতে মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ দেবী—জাঙ্গুলী-তারা মনসাদেবীর মূল।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক-গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও বৌদ্ধ সর্পদেবী মনসার ভিত্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে এর সঙ্গে বাংলাদেশ ও তার গা-ঘেঁষা অঞ্চলগুলির নানা অনার্য কৌমের মধ্যে সর্প এবং সর্পদেবীর পূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার প্রভাবের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। মনসাদেবীর পৌরাণিক মর্যাদার অন্তরালেও ছিল মুখ্যত লোককল্পনা।

পালযুগেই মনসা সমাজের উচ্চশ্রেণীতে স্থান করে নিয়েছেন। সেন আমলে সমাজের সর্বস্তরে এঁর প্রসার দেখা যায়।

ড. নীহাররঞ্জন রায় পূর্বোক্ত তিন বিশেষজ্ঞের মত মেনে নিয়েছেন। তিনি মঞ্চাম্মা সম্পর্কিত মত ও জাঙ্গুলীদেবীর প্রভাব মেনে নিয়েও নতুন একটি অভিমত যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে "সাপ প্রজনন-শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন-শক্তির পূজা" থেকেই 'মনসা পূজা'র উদ্ভব। বাংলাদেশে পাওয়া মনসা মূর্তির সঙ্গে ক্রোড়াসীন একটি ফল বা পূর্ণ সর্পের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। এঁদের প্রত্যেকটি প্রজনন-শক্তির প্রতীক।

আলোচ্য মতবাদগুলিকে ভিত্তি করে কালত্র(মে মনসাদেবীর ভিত্তিটি তৈরি হয়েছে মনে করা যায়। পাল আমলে এই কল্পনা ত্র(মশ উচ্চকোটিতে স্বীকৃত হচ্ছেন দেখা গেছে। সেন আমলে এদের মিলন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে থাকবে।

কাহিনী আখ্যানধর্মী মনসামঙ্গলের মূল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন শিবভক্ত(পৌ(ষ চেতনায় দৃপ্ত চাঁদ সদাগর। সমগ্র দেশে মনসাদেবী নিজের পূজা প্রচারের জন্য বেছে নেন চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা মনসার ভক্ত(। কিন্তু স্বামীকে সে এ-পথে আনতে পারেনি। ত্রু(দ্ধ মনসা চাঁদের বাগান ধ্বংস করেন, সপ্ত ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেন, ছয় পুত্রকে হত্যা করেন, নটীবেশে মহাজ্ঞান হরণ করেন—তবু চাঁদ নতিস্বীকার করেননি। শেষ সন্তান ল(ীন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিয়ে দিয়ে মনসার হাত থেকে পুত্রকে বাঁচানোর জন্য লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। সর্পঘাতে মৃত স্বামীকে কলার ভেলায় ভাসিয়ে, পথের নানা বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে বেহুলা স্বর্গে পৌঁছায়। নাচে-গানে দেবতাগণকে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরে পায়। দেশে ফিরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দৃঢ় চাঁদ সদাগরের হৃদয় জয় করে মনসার পূজার ব্যবস্থা করে। চাঁদ বাম হাতে মনসার পূজা করে বেহুলার চোখের জলের কাছে হার মানেন। চাঁদ তার সব হারানো ধন-জন ফিরে পান। চাঁদের মনসার পূজার মধ্য দিয়েই কাব্যের সমাপ্তি।

মনসামঙ্গলের কাহিনী সুবিন্যস্ত ও নিবিড় ঐক্যবিধৃত। চাঁদ সদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বে কাহিনী নাটকীয় ও গতিময় হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে নেতা ধোপানীর শিষ্য শঙ্কর গা(ড়ির ও হাসান-হোসেনের কথাও আছে। তবে মূল আকর্ষণ চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনীর মধ্যে। চরিত্র চিত্রণের দিক থেকেও বহু কবি চাঁদ সদাগরের বলিষ্ঠ রূপ, সনকার বাৎসল্যরস, স্নিগ্ধতা ও বেহুলার সংগ্রামী প্রেমজীবন, কামনার তীব্রতাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন।

মনসামঙ্গল কাব্য দুটি পর্যায়ে লিখিত (1) প্রাক্-চৈতন্য যুগে, (2) চৈতন্যোত্তর যুগে। দুই যুগের কাব্যরস ও চরিত্র চিত্রণের (ে ত্রে ভিন্নতা ল(্য করা যায়।

প্রথম পর্যায়ের কাব্যে দেবচরিত্রে যে অমার্জিত নিষ্ঠুরতা, শক্তি(র রূঢ়তা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে তা দেখা যায় না।

মনসামঙ্গলের স্রষ্টাগণ মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবিরূপে হরি দত্ত চিহ্নি(ত। অপরাপর কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেব, কেতকাদাস (েমানন্দ, দ্বিজবংশী দাস প্রমুখ স্মরণীয়। মনসা-মঙ্গল বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তেই রচিত হয়েছিল। তার ফলে উত্তরবঙ্গে জীবন মৈত্র, জগজ্জীবন ঘোষাল, তন্ত্রবিভূতি কাব্য রচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস। আসাম-বাংলা জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন নারায়ণ দেব। নীচে প্রধান প্রধান কবিদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এ থেকে আপনারা কোন্ কবি কাহিনী, চরিত্র, রস পরিবেশন, বাস্তবতাবোধ ইত্যাদি সাহিত্য বিচারের নানা দিক সার্থকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন—তা জানতে পারবেন এবং প্রত্যেক কবি সম্পর্কেই স্পষ্ট ধারণা অর্জন করে তাঁদের সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন

কানাহরি দত্ত মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি বিজয় গুপ্ত "প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত" লেখার পরই আদি কবিরূপে কানাহরি দত্ত আলোচনার বিষয় হন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'কালিকা পুরাণে'র লেখক হরি দত্ত এবং আদি মনসামঙ্গলকার হরি দত্তকে একই ব্যক্তি(বলে চিহ্নি(ত করেছেন। হরি দত্তের কালনির্ণয়ক কোনো

তথ্যাদি না পাওয়া গেলেও তিনি যে বিজয় গুপ্তের পূর্বে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি—এ তথ্য মেনে নিতে হয়।

নারায়ণ দেব মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব। তাঁর কাব্যে কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণে হরি দত্তের পরই নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর কাব্যের ব্যাপকতম প্রচার এর অন্যতম কারণ। কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদগল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকর।।
পিতামহ উদ্ভব, নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর, (ক্মিণী মোর মাতা।।"

আসাম অঞ্চলে নারায়ণ দেবের কাব্যের বহুল প্রচারের জন্য আসামবাসীরা কবিকে আসামের বলে দাবী করে। কিন্তু তথ্যাদি যা পাওয়া যায়—তাতে দেখা যায় নারায়ণ দেবের জন্মভূমি অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রামে। তবে অনেকে শ্রীহট্ট জেলায় কবির জন্মস্থান বলে দাবি করেন। কবির উপাধি ছিল—'সুকবি বল্লভ'।

কাব্যকৃতি মঙ্গলকাব্য রচনার মূলনীতির পথ ধরে নারায়ণ দেব কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্য 'পদ্মাপুরাণ', তিন খণ্ডে বিভক্ত(। প্রথম খণ্ডে আছে কবির আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যানসমূহ, আর তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনী আছে। অন্যান্য খণ্ডের তুলনায় তৃতীয় খণ্ড অপে(াকৃত সংক্ষিপ্ত। কবির কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছে দ্বিতীয় খণ্ডের পৌরাণিক কাহিনীগুলি।

উৎস মহাভারতের 'আস্তিক পর্ব', বিবিধ 'শৈবপুরাণ', কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-কাব্য প্রভৃতি রচনাকে নারায়ণ দেব দ্বিতীয় খণ্ডটির ভিত্তি রচনা করেছেন। নারায়ণ দেবের কাব্যকে আমরা বাংলা ভাষার পৌরাণিক কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডার বলতে পারি।

নারায়ণ দেবের রচনায় স্বভাবস্ফূর্ত সরস কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাতে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও দুর্লভ নয়। সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে কবির বেশ দখল ছিল। শিবের কটূক্তি(শুনে উমাকে যে কথা বলেছেন তার মধ্যে 'কুমারসম্ভবে'র ছায়া সম্পাত ঘটেছে। ক(ণরস সৃষ্টিতে নারায়ণ দেব বিজয় গুপ্তকেও হার মানিয়েছেন। এই ক(ণ রসের ধারায় বেহুলা ও সনকা চরিত্র বিশিষ্টতা লাভ করেছে। স্বামীর মৃত্যুতে বঞ্চিত যৌবন যন্ত্রণায় কাতর বেহুলার কণ্ঠে বেদন-অর্তি—

"হাসি হাসি দেয় মোরে অঙ্গে আলিঙ্গন।
তবে সে যুড়াএ প্রভু অভাগীর প্রাণ।।
বিশুদ্ধ কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতিঃ।
অকালেতে রাড়ী হৈলাম শুন প্রাণ পতি।।

[রাড়ী = বিধবা]

চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্ব(ব্ধ রূপটি কবি সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। বাম হাতে মনসার পুজার প্রাক্ মুহূর্তে চাঁদ সদাগরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"কি করিব পুত্রে মোর কি করিব ধনে
না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে।।"

কবির হাতে চাঁদ সদাগরের চরিত্রটি বলিষ্ঠ, দৃপ্ত এবং আনুপূর্বিক সামঞ্জস্যমণ্ডিত। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কাব্যকে অ(ীল বলে কটা(করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কারণ, নারায়ণ দেব তাঁর কাহিনী চয়নে মূলত সংস্কৃত পুরাণকেই আশ্রয় করেছেন। সুতরাং যদি দায়ী করতে হয়—কবিকে নয়—প্রাক্ চৈতন্যযুগের পরিমণ্ডলকে দোষী করতে হয়। কাহিনী গঠনে বৈচিত্র্য ও বিস্তার না থাকলেও চরিত্র চিত্রণে ও ক(ণরস সৃষ্টিতে কবি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

বিজয় গুপ্ত আদি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিজয় গুপ্ত চিহ্নি(ত। বিজয় গুপ্তের কাব্য খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ জনপ্রিয়তার জন্যই তাঁর কাব্যে অনেক প(পণ ঘটেছে। মনসাভক্ত(সাধক কবিরূপে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর কাব্যে কবি উল্লেখ করেছেন যে, কাব্যখানি হুসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছে। গবেষকদের মতে কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল 1494 সাল, তবে এই কালনির্ণয় নিয়ে সংশয় আছে।

কবি-পরিচিতি গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পিতার নাম সনাতন, মাতা (ক্মিণী দেবী। কবি উল্লিখিত 'ফুল্লশ্রী' গ্রাম বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্ত(ব্য অনুসারে 'গৈলা-ফুল্ল(ী' গ্রামে বিজয় গুপ্তের পূজিত মনসাদেবীর মূর্তি বিদ্যমান।

আদি কবি কানাহরি দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, আলঙ্কারিক চমৎকৃতির সাহায্যে কবি তাঁর কাব্যকে ঐ(র্যমণ্ডিত করেছেন। গ্রন্থের ভাষা ও আলঙ্কারিক প্রয়োগ ইত্যাদি দেখে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বিজয় গুপ্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। গভীর ভাবানুভূতির চেয়ে কবি পাণ্ডিত্যের ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। বিজয় গুপ্তের লেখায় মিলনমুখী প্রাণসংহতির চিত্র ফুটে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণে কবি সার্থক। তাঁর হাতে চাঁদ সদাগর পৌ(ষদৃপ্ত, মনসা চরিত্রটি কৌতুকরসে ভরা, শিব চরিত্রে ব্যভিচারী গ্রাম্য চরিত্রের ছোঁয়া আছে। বিজয় গুপ্তের হাতে শিব হয়েছে শিথিল চরিত্র, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গৃহস্থ।

কবির কৌতুক দৃষ্টি প্রশংসার দাবি রাখে। দ(ণ পাটনে চাঁদের বাণিজ্যাদি নিয়ে, পান, নারকেল ও চটের থানকে নিয়ে কবি যে দৃশ্য রচনা করেছেন তাতে উদ্দাম হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ চাঁদের বক্তৃ(তায় মুগ্ধ হয়ে রাজবেশ ছেড়ে রাজা তখনি চট নিয়ে যা করেছিলেন তা তুলে ধরা হলো

"একখানা কাছিয়া পিন্ধে আরখানা মাথায় বান্ধে
আরখান দিল সর্ব গায়।"

ক(ণরস সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্ত তুলনারহিত। লৌহবাসরে লখিন্দরের মৃত্যুর পর মাতা সনকার পুত্রহারা বেদনাদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের চিত্র কবি তুলে ধরেছেন—

"কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়।।
দুই হস্তে ধরি রানী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রানী বদন কমলে।।"

ভাষা ও ছন্দে কবি সচেতন ছিলেন। একঘেয়ে পয়ার-লাচারির যুগে তিন ছন্দে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। এর দৃষ্টান্ত—

"প্রেতের সনে (শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।"

শব্দ চয়নে ও উপমা ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগের (ে ত্রেও কবি সংস্কৃত রীতিকে পুরোপুরি মেনে নেননি। দেশজ শব্দের যথার্থ প্রয়োগও ল(্য করা যায়। মানব চরিত্রের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি বিজয় গুপ্তের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবির হাতে দেবতা উপল(্য—মানুষই চরম ল(্য। সামগ্রিক বিচারে আমরা বলতে পারি, বিজয় গুপ্তের কাব্যে পদ্মপুরাণাদি নানা গ্রন্থের প্রভাব, বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের ঐ(র্য থাকলেও তাঁর সহানুভূতি ও দরদী মনের ভালবাসার স্পর্শে সেই সব পুরাণ কাহিনী সম্পূর্ণ পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে নবরূপে রূপায়িত হয়েছে।

বিপ্রদাস পিপিলাই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন মনসামঙ্গলের কবি হলেন বিপ্রদাস পিপিলাই। তাঁর কাব্যে অখণ্ডিত ও অচ্ছিন্ন রূপটি আমরা পাই। সম্পূর্ণ কাহিনী এই কাব্যেই পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেনের মতে কাব্যখানি 1495-96 সালে রচিত। তবে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য কবির প্রাচীনতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। গণেশ, ধর্ম, নারায়ণ ইত্যাদি দেবতার বন্দনার পর সর্পালঙ্কারে সজ্জিত মনসার রাজবেশ ও সভার বর্ণনা দিয়ে কাব্য আরম্ভ—তবে মনসামঙ্গলের মূল আখ্যান বেহুলা-লখিন্দর কাহিনীটি আরম্ভ হতে না হতেই খণ্ডিত। ড. সুকুমার সেনের মতে, "বিপ্রদাস ছাড়া সব কবিই—যাঁহাদের রচনা পুরা মিলিয়াছে, বেহুলা, লখিন্দরের আখ্যানেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়াছেন।"

চরিত্র চিত্রণে ও আখ্যান রচনায় কবির নৈপুণ্য তেমন প্রকাশ না পেলেও নারী চরিত্রগুলি উজ্জ্বল। বাংলাদেশের প্রাচীন ও লৌকিক ধর্মভাবনার সঙ্গে মনসা পূজার সম্পর্ক অনেকটা বিপ্রদাসের লেখায় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগনা জেলার কবি বিপ্রদাস। তাঁর কাব্য তেমন জনপ্রিয় হয়নি, তবে তাঁর কাব্যে প্রাচীনত্বের নিদর্শন আছে, প্র(পণ সত্ত্বেও।

চৈতন্য পর্বে মনসামঙ্গলের ধারাটিতে গতিবেগ দেখা গেলেও প্রাক্-চৈতন্যযুগের নারায়ণ দেব-বিজয় গুপ্তের মতো সার্থক কবি পাওয়া যায় না। এই পর্বে মনসামঙ্গলে নূতন কতকগুলি দিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সেগুলি হলো

(ক) ভাষার সাবলীলতা ও অলঙ্করণমণ্ডল কলার গু(ত্ব।

(খ) চাঁদের পৌ(যদৃপ্ত রূপ চৈতন্যপ্রভাবে ভক্তি(রসস্নাত কোমলমধুর হলো।

(গ) মনসার হিংস্ররূপে পেলবতা দেখা দিল।

(ঘ) কাহিনীবর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদিতেও ভক্তি(রসের বাড়াবাড়ি।

এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবি তন্ত্রবিভূতি, ষষ্ঠীবর দত্ত, দ্বিজবংশী দাস, কেতকাদাস (েমানন্দ প্রমুখ কবিদের পরিচিতি ও কাব্যকৃতি সম্পর্কে সং(িপ্ত আলোচনা করা হলো

তন্ত্রবিভূতি মালদহ জেলার কবি তন্ত্রবিভূতির হাতে উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারা কিছুটা স্বতন্ত্র পথ ধরে চলে। ড. আশুতোষ দাস কাব্যখানি আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থের দু-এক জায়গায় জগজ্জীবনের ভণিতা পাওয়া যায়। কবির প্রভাব জগজ্জীবন ও অন্যান্য কবিদের ওপর পড়েছিল। সহজ-সরল ভাষায় কাব্যখানি লিখিত। তাঁর লেখা সংযমশাসিত। তন্ত্রবিভূতির কাহিনীতে প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখা যায়। কবির কাব্যে কোথাও কোথাও আদিরসের প্রাবল্য আছে। কাহিনীবর্ণনা ও রচনারীতিতে কবি অনেকটাই দ(তার পরিচয় দিয়েছেন। গবেষকদের অনুমান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে।

জগজ্জীবন ঘোষাল উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত(দিনাজপুর জেলার কবি জগজ্জীবন ঘোষাল। কবির পিতার

নাম রূপ, মাতা রেবতী। কাব্যখানির রচনাকাল সম্পর্কে পুঁথিতে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে লেখায় ে(মানন্দের উল্লেখ থাকাতে ধরে নেওয়া যায় গ্রন্থখানি ে(মানন্দের পর—অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। কাব্যখানি রীতি অনুসারে দেবখণ্ড ও বানিয়া খণ্ডে বিভক্ত(। শেষের খণ্ডটিতে কবি তন্ত্রবিভূতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন। কাব্যখানিতে ধর্মমঙ্গলের প্রভাব রয়েছে। বেহুলার কাহিনীতে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য আছে। আদিরসের বাড়াবাড়ি ও অলঙ্করণের প্রতি বেশি মাত্রার ঝোঁক যুগানুসারী ত্রুটিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষু(পাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, সীতারাম দাস, জীবন মৈত্র মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। বিষু(পালের কাব্য মানিক দত্তের অনুসরণে লেখা। ধর্মমঙ্গলের প্রভাব 'সৃষ্টিতত্ত্বে' আছে। তবে সহজ-সরল গ্রাম্য ভাবব্যঞ্জনায় কাব্যখানি কিছুটা আস্বাদ্য হয়েছে।

শ্রীহট্টের কবি ষষ্ঠীবর। তিনটি খণ্ডে কাব্যটি বিন্যস্ত। কবির রচনায় অলঙ্কার সজ্জা গু(ত্ব পাওয়াতে অনেকে তাঁর ওপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। অন্যান্য কবিদের কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। তবে দ্বিজবংশী দাস ও কেতকাদাস ে(মানন্দ মনসামঙ্গল কাব্যজগতে বিশেষভাবে চিহ্নি(ত হয়েছেন। নিম্নে এই দু'জন কবির সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো

দ্বিজবংশী দাস অধুনা বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার জনপ্রিয় কবি হলেন দ্বিজবংশী দাস। তাঁর 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কবির পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান, ভক্তি(ইত্যাদির জন্য সমালোচকগণ তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবির মর্যাদা দিয়েছেন।

দ্বিজবংশী দাসের গ্রন্থ 1318 বঙ্গাব্দে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পায়। তবে কবির নামে পরবর্তিকালে বহু মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া গেলেও সবগুলি নির্ভরযোগ্য নয়। আত্মপরিচয় অংশে তিনি নিজেকে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত দিয়েছেন। তাঁর পূর্বপু(ষ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। অধুনা বাংলাদেশে কবির বাস্তুভিটে এখনও আছে এবং সেখানে মনসাদেবীর পূজা-মন্দিরও আছে।

পঠন-পাঠন, ধ্যানে-জ্ঞানে কবি অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, দর্শন সম্পর্কে কবির গভীর জ্ঞানের পরিচয় তাঁর কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। আনুমানিক 1575 খ্রিঃ থেকে 1576 খ্রিঃ মধ্যে কাব্যখানি রচিত। বৃহৎ কাব্যটি দেবখণ্ড ও মানবখণ্ডে বিভক্ত(। প্রথম খণ্ডে হর-পার্বতীর কাহিনী পুরাণ অনুসারেই লিখেছেন। কিন্তু শিবের মহিমা লিখতে গিয়ে তিনি পুরাণ ছেড়ে গ্রামীণ শিবকাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর হাতে শিব লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। 'মানবখণ্ডে' প্রচলিত মনসামঙ্গলের ধারা অনুসরণ করেই চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের প্রসঙ্গ সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণ জ্ঞানের আধিক্যে গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হ'লেও গতির দিক থেকে (-থ। তবে গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও কবি আপন বৈভবের দ্বারা বৈচিত্র্য আনতে পেরেছেন। মানবখণ্ডের চরিত্রগুলি তেমন সার্থক না হ'লেও দেবখণ্ডের মনসা, চণ্ডী ও মহাদেবের চরিত্র অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। গু(গম্ভীর রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবি রস-রসিকতা যেভাবে পরিবেশন করেছেন তাতে কাব্যখানিতে কিছুটা সরসতার প্লাবন বয়ে গেছে। কোথাও কোথাও আদিরসের বাড়াবাড়িও আছে। কবির সৃষ্টিতে তৎসম শব্দ ও অলঙ্কার বিন্যাসে মুন্সীয়ানা আছে। শাক্ত(দেবীর বন্দনা গান লিখলেও কবি ছিলেন বৈষ(ব। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ(বীয় ভাব-ভাবনার দ্বারা বংশী দাসের কবিমন অনেকটা আচ্ছন্ন ছিল। তিনি অনেক বৈষ(ব কবিতাও লিখেছেন। কবির ভক্ত(হৃদয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হরিহর মূর্তির বর্ণনায় পাওয়া যায়—

“প্রণমহুঁ হরিহর অদ্‌ভুত কলেবর
শ্যামশ্বেত একই মূরতি
অভেদ ভাবিয়া লোকে দেখিছে অতি কৌতুকে
মরকতে রজতের জ্যোতি।”

কবির শব্দব্যবহারে দ(তা উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় দ্বিজবংশী দাসের কাব্য ভক্তি(রসপ্রধান।

কেতকাদাস ে(মানন্দ কেতকাদাস ে(মানন্দের কাব্যখানিই প্রথম ‘মনসামঙ্গলে’র ছাপানো গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত। কবি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশে তাঁর কাব্য ‘(মানন্দী’ নামে প্রচলিত ছিল। 1844 খ্রিঃ বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া কবির সম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন পুঁথি ঘেঁটে কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের তুলনায় ে(মানন্দ নামটি অনেক প্রাচীন ও সুপ্রচারিত। ‘কেতকাদাস’ ছিল কবির উপাধি। মনসার অপর নাম ‘কেতকা’। তাঁর দাস হিসাবেই উপাধিটি যুক্ত(হয়েছে। কবি ছিলেন কায়স্থ। এক মুসলমান ফৌজদারের অধীনে কবির পিতা শঙ্করদাস চাকরি করতেন। ফৌজদারের মৃত্যুর পর অরাজকতা দেখা দিলে তিনি জমিদার ভারমল্লের আশ্রয়ে এসে বসবাস করেন। তিনি কবিকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে গবেষকগণ অনুমান করেন—সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ে(মানন্দ তাঁর কাব্য রচনা করেন। চিরাচরিত দৈবাদেশ অনুসারে কাব্যখানি রচিত। কবি ‘আত্মপরিচয়’ অংশে লিখেছেন যে, নির্জন জলার ধারে তিনি এক মুচিনীকে দেখেন, (ণেক পরেই সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সেখানে উপস্থিত হন সর্পভূষণা মনসাদেবী। তাঁর আদেশেই কাব্যটি রচিত।

‘আত্মপরিচয়’ অংশে ইতিহাস চেতনার সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক বি(-ষণও রয়েছে। এই অংশের বর্ণনা খুবই মনোজ্ঞ। তবে এই অংশে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্র(বর্তীর প্রভাব ল(্য করা যায়। সাধারণ স্তরের স্বল্প প্রতিভার অধিকারী হয়েও কবি সীমাহীন খ্যাতি অর্জন করেছেন। কাহিনী গ্রন্থনে কবি মৌলিকত্বের দাবি করতে পারেন না। প্রায় সমগ্র অংশই বৈচিত্র্যহীন। তবে একমাত্র ‘উষা হরণ’ অংশটি সার্থকতা লাভ করেছে। বেহুলা-লখিন্দরের জীবনকাহিনী, বেহুলার ব্যথাদীর্ণ সংগ্রামী রূপটি তেমন হৃদয়স্পর্শী হয়নি। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার মধ্যে কবির নিখুঁত ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

চরিত্র চিত্রণে চরম সার্থকতা দাবি করতে না পারলেও মনসাদেবীর ক্রূ(র-রূঢ়, ভয়াল-ভয়ংকর রূপটি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। রচনাভঙ্গী খুব সাধারণ স্তরের। ভাষা প্রয়োগের দিক থেকে কবি খুবই পরিচ্ছন্ন। তাঁর কাব্যখানি অনেকগুলি পালার যেন বৃহৎ সংকলন। তবে পালাগুলির যোগসূত্র খুবই ে গাঁণ।

রূপবর্ণনায় সংস্কৃত শব্দের অত্যধিক ব্যবহার ও অলঙ্কার সজ্জার রীতি ল(্য করা যায়। মুসলমানদের প্রসঙ্গে কবি প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দও যুক্ত(করেছেন। ব্রত-পাঁচালীজাতীয় গ্রন্থটি আজও ‘মনসামঙ্গল’ কাব্য-ধারায় স্মরণীয়।

7.4 সারাংশ

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এমনকী তার পরেও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের ওপর এই কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবী বাঙালির আর্যেতর সংস্কারেরই ধারক। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী বহু পূর্বেই ছড়ায়, পাঁচালীতে ও মেয়েলি ব্রতকথার তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে স(ম হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্য

ও সমাজে তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে পাঠান ও পরবর্তীকালে মোগল আমলে বাঙালি হিন্দু বিদেশী শক্তি(র আত্র(মণ ও শত অত্যাচার থেকে র(া পাবার জন্যই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা জানায়। ভক্তে(র কাছে তাঁরা বরাভয় মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। উচ্চবর্ণ হিন্দু ও আর্যেতর গোষ্ঠীর সমন্বয়ের পর থেকেই এই মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী অবলম্বনে মনসামঙ্গল আখ্যান কাব্য রচিত। মনসামঙ্গলে স্পষ্টত তিনটি ধারা রয়েছে— (1) রাঢ়ের ধারা। এর ধারক-বাহক বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ কবি। (2) পূর্ববঙ্গের ধারা। এই ধারার প্রায় সব কাব্যগ্রন্থই 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ও দ্বিজবংশী দাস এই ধারার স্রষ্টা। (3) উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা। অন্য দুটি ধারার থেকে এই ধারা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ(মৈত্র এর প্রাণপু(ষ। এই ধারায় ধর্মমঙ্গলের প্রভাব ল(্য করা যায়।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাস পিপিলাই-এর নাম স্মরণীয়।

নারায়ণ দেব প্রাক্-চৈতন্যযুগের স্বনামধন্য কবি। তাঁর কোনো পুঁথিতে কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তিনি লৌকিক কাব্য লিখলেও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি যে অভিজ্ঞ ছিলেন তার প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়। মহাভারত, শিবপুরাণ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর নানা উপাদানে তাঁর দেবকাহিনী সমৃদ্ধ। ক(ণরস সৃষ্টিতে তিনি সার্থক। চরিত্র সৃষ্টি, রসবৈচিত্র্য ও কাহিনী গ্রন্থনে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। আসাম ও বাংলাদেশ এই কবির দাবিদার।

বিজয় গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে (প্রাচীন নাম ফুল্ল(ী) জন্মগ্রহণ করেন। আজও স্বগ্রামে মনসার মন্দির ও মূর্তি আছে। বাংলাদেশে কবির কাব্যের খুব সমাদর দেখা যায়। হুসেন শাহের সিংহাসন লাভের পর কাব্যখানি রচিত বলে অনেকে মনে করেন। কাব্য ল(ণের বিচারে তাঁর কাব্য প্রশংসার যোগ্য না হলেও মনসা, শিব চরিত্র সার্থক হয়েছে। তবে চাঁদ সদাগরের চরিত্রে পৌ(ষের সঙ্গে স্থূলতার প্রকাশ ঘটাতে চরিত্রটির মহিমা কিছুটা ম্লান হয়েছে। বেহুলা চরিত্র কবির সার্থক সৃষ্টি।

বিপ্রদাস পিপিলাই-এর কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'। কবি প্রাচীন হলেও তাঁর কাব্য সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে। 1495 খ্রিঃ কাব্যখানি সমাপ্ত হয়। কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণে কবির কৃতিত্বের প্রমাণ আছে। বেহুলা, সনকা ও চাঁদ সদাগরের চরিত্রগুলি সার্থক। চাঁদের বাণিজ্যযাত্রায় কবির বাস্তবনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ-সরল ভাষায় রচিত কাব্যখানি মোটামুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে রয়েছেন দ্বিজবংশী দাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ কবিগণ। প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক পদার্থ কিছু কিছু দেখা যায়। মূল পাঠে এই পরিবর্তন রেখা স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে। এই পর্যায়ের কবিদের মধ্যে ক্ষেমানন্দ ও দ্বিজবংশী দাস উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজবংশী দাস অধুনা বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার কবি বংশী দাসের 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণে'র জনপ্রিয়তা পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। আনুমানিক কাব্যখানি 1575-76 খ্রিঃ রচিত। দেবখণ্ডের হর-পার্বতীর কাহিনীতে পুরাণ অনুসরণ করলেও কবি শিব-কাহিনীর শেষাংশে তা করেননি। তাঁর হাতে চাঁদ সদাগর শান্ত(হয়েছে। শব্দ প্রয়োগ ও অলঙ্কার বিন্যাসে কবির পাণ্ডিত্যের প্রমাণ মেলে। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ(ব প-াবনধারায় বংশী দাসের কাব্যও প-াবিত।

কেতকাদাস ে(মানন্দের 'কেতকাদাস' উপাধি। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবির কাব্যখানি রচিত। স্বল্প প্রতিভাধারী হয়েও কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চরিত্র চিত্রণে তিনি প্রশংসার দাবি করতে পারেন না। ভাষা অনেকটা স্বচ্ছ। তৎসম গন্ধী শব্দ ব্যবহারের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা মুকুন্দ চত্র(বর্তীর প্রভাব তাঁর লেখার অনেক স্থানে দেখা যায়।

এ ছাড়া তন্ত্রভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ স্বল্প প্রতিভাধর উত্তরবঙ্গের কবিগণ মনসামঙ্গল কাব্যধারার কাহিনীতে কিছুটা নূতনত্বের আমদানি করেন। এঁদের লেখায় ধর্মমঙ্গলের প্রভাব দেখা যায়। রচনারীতি ও কাহিনী গ্রন্থনে তন্ত্রবিভূতি প্রশংসার দাবী রাখেন। জগজ্জীবনের লেখায় গ্রামীণ ধারা বহমান। শিব-দুর্গার কাহিনী এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর সৃষ্টিতে মৌলিকত্ব নেই।

7.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 94 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের প্র(গুলির 4টি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে ডানদিকে। যেটি সঠিক উত্তর তাতে টিক (✓) চিহ্(দিন

(ক) মনসামঙ্গলে মূল দ্বন্দ্ব
- (1) মনসার সঙ্গে বেহুলার
- (2) মনসার সঙ্গে শিবের
- (3) মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের
- (4) মনসার সঙ্গে চণ্ডীদেবীর

(খ) প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি হলেন
- (1) দ্বিজবংশী দাস
- (2) নারায়ণ দেব
- (3) তন্ত্রবিভূতি
- (4) কেতকাদাস ে(মানন্দ

(গ) চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি হলেন
- (1) বিপ্রদাস পিপিলাই
- (2) দ্বিজবংশী দাস
- (3) নারায়ণ দেব
- (4) বিজয় গুপ্ত

2. নিম্নে দু'জন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্ত(স্থানে লিখুন

(ক) নারায়ণ দেব
- মনসামঙ্গল
- পদ্মাপুরাণ

(খ) বিজয় গুপ্ত

3. নিম্নের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ ক(ন

(ক) নারায়ণ দেবের কাব্য _____ খণ্ডে বিভক্ত(।

(খ) নারায়ণ দেব কাহিনী চয়নে মূলত _____ _____ আশ্রয় করেছেন।

(গ) ক(ণরস সৃষ্টিতে _____ তুলনারহিত।

(ঘ) ে(মানন্দের_____উপাধি।

(ঙ) তন্ত্রবিভূতির কাব্যে _____ রসের আধিক্য।

(চ) জগজ্জীবন ঘোষাল _____ বঙ্গের কবি।

4. নিম্নের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্((✓) দিয়ে চিহ্নিত ক(ন

	ঠিক	ভুল
(ক) বিপ্রদাস পিপিলাই পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশের কবি।	☐	☐
(খ) বিজয় গুপ্ত ছন্দে বৈচিত্র্য এনেছিলেন।	☐	☐
(গ) নারায়ণ দেবের হাতে চাঁদ সদাগর দুর্বল হয়েছে।	☐	☐
(ঘ) মনসামঙ্গলের আদিকবি কানা হরি দত্ত।	☐	☐
(ঙ) দ্বিজবংশী দাসের কাব্য 1330 বঙ্গাব্দে মুদ্রিত।	☐	☐

7.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) চণ্ডীমঙ্গল

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই চণ্ডীদেবতার পূজা এবং সারারাত ধরে মঙ্গল গানের কথা চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া গেলেও চৈতন্যপূর্ব যুগের কোনো চণ্ডীমঙ্গল আমরা পাই না। এর ফলে সে যুগে এ কাব্যের রূপরেখা কি ছিল, তা-ও আমাদের অজানা। চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই চণ্ডীমঙ্গলের নিদর্শন আমরা পাই। চণ্ডীদেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সং(পে তথ্যাদি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হ'লো।

চণ্ডীর উৎস খুঁজতে গিয়ে গবেষকগণ পৌরাণিক বিভিন্ন নারীদেবতা, হিন্দুতন্ত্রে বর্ণিত নানা দেবী, বৌদ্ধতন্ত্রের দেবীর কথা উল্লেখ করলেও, আর্যেতর প্রভাবই এর মূলে আছে। বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীর বিকাশের মূলেও আছে মেয়েলি ব্রত কথাদির প্রভাব। 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-গ্রন্থের লেখক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য চণ্ডীদেবীর পৌরাণিক উৎসের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। নানা তথ্যসহ তিনি প্রমাণ করেছেন যে, লোক-সংস্কারে বাঙালি ও কাছের অনার্য জাতির লোকজন চণ্ডীদেবী ও নানা লোকদেবতার পূজা করতো। ওরা ওঁদের শিকার ও যুদ্ধের দেবী 'চাণ্ডী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শিকার ও যুদ্ধের কথা কালকেতুর কাহিনীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ধনপতির কাহিনীতে শিকার-যুদ্ধাদি না পাওয়া গেলেও এক গার্হস্থ্যজীবন চিত্র আছে। অনেকের ধারণা পরবর্তিকালে স্বতন্ত্র দেব-পরিকল্পনা থেকে দুটি কাহিনীর ভিত্তি সমন্বয় লাভ করেছে। ড. সুকুমার সেনও চণ্ডী ঠাকুরের লোক-উৎসের কথাই বলেছেন। কেউ কেউ চণ্ডী-মঙ্গলের চণ্ডীকে অস্ট্রিক (আদিবাসী) বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আর্যেতর দেবী—আবার কেউ কেউ অনার্য ব্যাধ জাতির পূজিতা দেবী বলে চিহ্নিত করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী আদিতে যাই থাকুক না কেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এই দেবী উচ্চ সমাজেও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দেবীর পূজা প্রচারের মূল শক্তি(রূপে বাংলার নারীজাতিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনী। সং(পে কাহিনী দুটি বর্ণিত হ'লো। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া যায় তাতে (1) আখেটিক খণ্ড অর্থাৎ ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং (2) বণিক খণ্ড

অর্থাৎ ধনপতি সওদাগরের কাহিনী পাওয়া যায়। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও এই দুটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যের শু(তে হর-পার্বতীর গার্হস্থজীবন--চিত্র, তারপর ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের অভিশপ্ত মর্ত্যজীবন কালকেতুরূপে, অন্যদিকে তার স্ত্রী ছায়া ফুল্লরা ব্যাধিনীরূপে কাহিনীতে এসেছে। অতঃপর কালকেতু-ফুল্লরার ব্যাধজীবন-চিত্র, চণ্ডীর ছলনা, পরিচয়দান। দেবীর পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী কালকেতুকে বহু ধনদান করেন—এর পর গুজরাট নগর পত্তন করে কালকেতু রাজা হয়—ভাঁড়ু দত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ গুজরাট আত্র(মণ করে—কাতকেতু বন্দী হয়। দৈববাণী শুনে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি(দেয় এবং রাজা বলে স্বীকার করে। ভাঁড়ুকে উপযুক্ত(শাস্তি দিয়েও দয়াবশে তাকে ঘর-বাড়ি ফিরিয়ে দেয়। চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হবার পর শাপমুক্ত(হয়ে পুত্রসন্তান পুষ্পকেতুর ওপর রাজত্ব ভার অর্পণ করে, মর্ত্যরূপ ত্যাগ করে পূর্বরূপে স্বর্গে ফিরে যায়। ব্যাধ কালকেতুর সাহায্যে চণ্ডীপূজা প্রচারের কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই।

তৎকালীন সমাজের কর্ণধার বণিক সম্প্রদায়। বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতির দ্বারা চণ্ডীপূজা প্রচার করতে চান—যাতে তার পূজা সমাজজীবনে ছড়িয়ে পড়ে। শৈব ধনপতি চণ্ডীর পূজা না করে বরং চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে, এতে দেবী ক্র(দ্ধ হন—ধনপতির জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। সমুদ্রের ঝড়ে বাণিজ্যতরী ডুবে যায়—কালীদহে কমলেকামিনী দেখে কোনোত্র(মে জীবন নিয়ে সিংহলে পৌঁছায়। সিংহলরাজ কমলেকামিনী দেখতে চায়। তা দেখাতে না পারার জন্য কারা(দ্ধ হয়। স্ত্রী লহনা, খুল্লনার সপত্নী বিরোধ চরমে পৌঁছায়। পুত্র শ্রীমন্ত বড় হয়ে পিতাকে খুঁজতে বের হয়। সে সিংহলরাজকে কমলেকামিনী দেখানোর পর ধনপতির মুক্তি(ঘটে। সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তর বিয়ে হয়। তারপর পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে ধনপতি দেশে ফিরে ধূম-ধাম করে চণ্ডীদেবীর পূজা করে। স্বর্গের নর্তকী রত্নমালা—মর্তে খুল্লনা ও মালাধর শ্রীমন্ত নামে পরিচিত ছিল। কাল সম্পূর্ণ হলে স্বর্গের রত্নমালা ও মালাধর স্বর্গে ফিরে গেলে—পার্থিব জীবনে ধনপতি দুঃখ-বেদনায় দিন কাটায়। দ্বিতীয় কাহিনীটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও—কালকেতুর কাহিনীর মতো সংহত নয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে যে তিনজন কবি মেয়েলি ব্রতকথার আঙিনা থেকে উদ্ধার করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছেন—তাঁদের কবি-পরিচিতি—ও তাঁদের কাব্য-পরিচয় তুলে ধরা হলো। এই আলোচনার মধ্য দিয়েই চণ্ডীমঙ্গলের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভের কারণ জানা যাবে।

মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্র(বর্তী লিখেছেন—

"মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।।"

এ থেকে বোঝা যায়—মুকুন্দ পূর্বেই মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল লিখেছিলেন। কিন্তু সংশয় দেখা দিয়েছে—তাঁর নামে রচিত দুখানি অর্বাচীন কাব্য নিয়ে। ভাষাবিচারে কোনো কাব্যকেই প্রাচীন বলা চলে না।

কবি ও কাব্য পরিচিতি কাব্য পাঠে মনে হয়, কবি মালদহ জেলার মানুষ—কারণ তাঁর কাব্যে ঐ অঞ্চলের নানা স্থানের উল্লেখ আছে। কাব্যের আরম্ভ পর্বে কবির জবানীতে যে আত্মপরিচয় আছে— তা কবির লেখা কি না—এ বিষয়ে সংশয় আছে। তাঁর কাব্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ল(্য করা যায়। ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের পর হর-পার্বতীর কাহিনী পাওয়া যায়—এর পর অতি সং(েপে কবি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী লিখেছেন। মানিক দত্তের কাব্য ছড়া, পাঁচালী জাতীয়। মঙ্গলকাব্যের বিস্তারী রূপ এতে নেই। ঘটনাটি সুবিন্যস্ত নয়, ভাষা অর্বাচীন, ছন্দের ে(ত্রেও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। হয়তো হাত বদল হতে হতে কবির সৃষ্টি প্রাচীনত্ব হারিয়েছে।

দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামব্যাপী দ্বিজমাধবের সুপরিচিতি। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদা-

মঙ্গল', রচনাকাল—1579 খ্রিস্টাব্দ। ষোড়শ শতকে মাধবাচার্য নামে অপর এক কবি 'কৃষ(মঙ্গল' লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

কবি-পরিচিতি গ্রন্থারম্ভে 'আত্মকথা' থেকে জানা যায়, কবি সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে হয়তো মোগল-পাঠান বিরোধের সময় পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে কবি-পরিবার চট্টগ্রামে চলে যান। কবির সব কাব্যগ্রন্থ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও রংপুর (অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত) অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

কাব্য-পরিচয় দ্বিজমাধবের কাব্যখানির প্রকৃত নাম 'সারদামঙ্গল'। মার্কেণ্ডের চণ্ডীর অনুসারে তিনি দেবখণ্ডে 'মঙ্গলাসুরবধে'র কল্পিত কাহিনী যুক্ত(করেছেন। অন্য কোনো মঙ্গলচণ্ডী কাব্যে এই কাহিনী নেই। এই কাব্যে কালকেতু-ধনপতির কাহিনী খুবই সংি(প্তভাবে রয়েছে। একমাত্র ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ছাড়া কোনো চরিত্র চিত্রণেই কবি সার্থক হননি। কাব্যখানি ব্রত-পাঁচালীর ল(ণযুক্ত(। দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যে কয়েকটি 'বিষু(পদ' সংযুক্ত(করেছেন। পদগুলি সার্থক। এই সব পদ দেখেই বোঝা যায় কবির মনটি বৈষ(বীয় কোমল-মধুর ছিল। মুকুন্দর কাব্য রচনার পূর্বেই দ্বিজমাধব কাব্য লিখেছেন। তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে মৃদু পরিহাস-রসিকতাও দেখা যায়। তবে বাস্তব জীবন চিত্রকর হিসাবে কবি মুকুন্দর তুলনায় অনেকাংশেই ম্লান। প্রথম শ্রেণীর কবির মর্যাদা দ্বিজমাধবের প্রাপ্য নয়।

মুকুন্দ চত্র(বর্তী মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ যুগের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করেছেন। মঙ্গলকাব্য ধারার মৌলিক কবির স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। বাস্তবতা, সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি(, অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি, রসস্নিগ্ধ কৌতুক মুকুন্দর লেখায় জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের গতানুগতিক কাব্য-কাঠামোর মধ্যেও মুকুন্দর মানুষের আশা-স্বপ্ন ও সুখ-দুঃখের কথা জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। দুঃখ-বেদনার পাথার পেরিয়ে কবির মানবতাবাদী রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, রচনারীতি, বাস্তব জীবনবোধ ইত্যাদির সমন্বয়ে মুকুন্দ সৃষ্টি মঙ্গল-কাব্যজগতে অতুলনীয়। এইজন্যই সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—মুকুন্দরাম যদি এ যুগে জন্মগ্রহণ করতেন তবে, কাব্য না লিখে উপন্যাস লিখতেন।

কবি-পরিচিতি মুকুন্দ তাঁর কাব্যে 'গ্রন্থোৎপত্তি' অংশে নিজের জীবনের সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। কবি ছিলেন বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম নিবাসী। এই অঞ্চলে মাহ্মুদ সরিফ নামে এক অত্যাচারী ডিহিদার ছিল। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রী-পুত্র-ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পৈতৃক ভিটে ছাড়তে তিনি বাধ্য হন। পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ঘুরতে ঘুরতে মেদিনীপুর জেলার আরড়া গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানকার রাজা বাঁকুড়া রায় তাঁকে আশ্রয় দেন এবং পুত্র রঘুনাথের শি(করূপে নিযুক্ত(করেন। আরড়ায় আসবার পথেই তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনার জন্য দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হলে তাঁরই প্রেরণাতে কবি কাব্য রচনায় ব্রতী হন। রঘুনাথই কবিকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দান করেন।

কাব্য-পরিচিতি মুকুন্দরামের কাব্য সাধারণতঃ 'অভয়ামঙ্গল' নামে পরিচিত। তাঁর কাব্য নানা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিষয়বস্তুকে রসগৌরবদানে তিনি সিদ্ধহস্ত। দূর ও নিকট থেকে জীবনের নানা ঘটনাকে দেখেছেন, স্নিগ্ধ হাসিতে জীবনের দুঃখের পাথার পেরিয়ে গেছেন। জীবনবাদী কবি তাঁর সৃষ্টিকে স্নিগ্ধ-কৌতুক রসে ভরিয়ে দিয়েছেন।

শিবের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সংসার, কালকেতুর ভোজন, মুরারি শীলের শঠতা, ভাঁড়ু দত্তের ধূর্তামি, ধনপতির

লালসা ইত্যাদির মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'পশুদের ত্র(ন্দন', 'ফুল্লরার বারমাস্যা' ইত্যাদি উল্লেখ করে অনেক সমালোচক কবিকে 'দুঃখবাদী' বলে চিহ্নি(ত করেছেন, কিন্তু দুঃখের কথা থাকলেই কবি দুঃখবাদী হল না। তথ্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ 'মানুষের কবি' মুকুন্দ সমগ্র জীবনদৃষ্টি দিয়ে নৈর্ব্যক্তি(কভাবে জগৎ ও জীবনকে দুঃখ-কৌতুকের মিশ্রণে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই কবিকে 'জীবনবাদী'রূপে চিহ্নি(ত করা যায়।

চরিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠতা তর্কাতীত। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি জীবন্ত। প্রৌঢ় শিব কবির হাতে ভোজনবিলাসী, কর্মবিমুখ-বালসুলভ, কালকেতু শক্তি(মান স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, ধনাঢ্য ধনপতির চারিত্রিক স্থূলতা, সপত্নীর কলহ, মুরারী শীলের চালাকি, ভাঁড়ু দত্তের লোভ-শঠতা ইত্যাদি বাস্তবানুগ ও জীবন্ত হয়েছে। তাই সমালোচক বলেছেন, "যতটুকু বাস্তবনিষ্ঠা, মানব চরিত্রবোধ, মানবতা, সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর কাব্যে আমরা পাই, সে-যুগের তুলনায় তা একটা অপরিমিত বিস্ময়।"

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে রচনাকাল ও ঐতিহাসিক ঘটনাদির ব্যাপারে মুকুন্দ কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। ঐতিহাসিক তথ্যাদির নিরিখে গবেষকগণ গ্রন্থখানির রচনাকাল 1594 সালের পরে 1603 সালের পূর্বে রচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতেই দ্বিজ জনার্দন ও বলরামের দুটি চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া যায়। তবে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় এঁদের কৃতিত্ব নেই বললেই চলে। জনার্দনের গ্রন্থটি ছড়াজাতীয়। বলরামের কাব্যেও উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দ্বিজমাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল' মধ্যযুগেই রচিত বলে কেউ কেউ দাবী করলেও— চণ্ডীমঙ্গল ধারার সঙ্গে এঁদের যুক্ত(করা যায় না।

7.7 সারাংশ

লৌকিক চণ্ডীদেবীর পূজা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। পশুদের ও শিকারির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, হারানো প্রাপ্তির দেবতা, পৌরাণিক দুর্গা ও তান্ত্রিক দেবীর মিশ্রণেই চণ্ডীর উদ্ভব। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনী। কালকেতু-কাহিনীর চণ্ডী প্রধানত শিকার ও পশুদের দেবতা। ধনপতি শ্রীমন্ত-কাহিনীর চণ্ডী—হারানো প্রাপ্তির মেয়েলি দেবতা। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই কাব্যসৃষ্টির তথ্যাদি পাওয়া গেলেও কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় চৈতন্য পর্ব থেকে। চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মানিক দত্তের পুঁথি পাওয়া যায়নি।

দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্যের রচনা সং(প্ত, বাস্তবতাপূর্ণ এবং অলঙ্কৃত। গভীর তথ্যসন্ধানী দৃষ্টিই মাধবাচার্যের প্রতিভার বিশিষ্ট ল(ণ। 1579 খ্রিস্টাব্দে কাব্যখানি রচিত। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র অঙ্কনে কবি কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর কাব্যে কয়েকটি 'বিষু(পদ' আছে। পদগুলি প্রশংসার দাবি রাখে। কবির মন বৈষ(ব ধর্মের অনুকূল ছিল। কাব্যখানিতে ব্রত-পাঁচালীর ল(ণ আছে।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্র(বর্তীর কাব্য 1594 সালের পর 1603 সালের পূর্বে রচিত। মাহ্মুদ সরিফের দ্বারা অত্যাচারিত কবি চৌদ্দপু(ষের ভিটেমাটি ছেড়ে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে আশ্রয় পান মেদিনীপুর জেলায় বাঁকুড়া রায়ের কাছে। তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হয়ে কবিকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দান করেন। তাঁর প্রেরণায় ও চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে কবি কাব্যখানি লেখেন। সাধারণত তাঁর কাব্য 'অভয়ামঙ্গল' নামে পরিচিত। মধ্যযুগের জীবনমুখী বাস্তব রসস্নিগ্ধ কবি হিসাবে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারূপে চিহ্নি(ত। তাঁর জীবনদৃষ্টি, কৌতুকস্নিগ্ধ মন, বাস্তব অভিজ্ঞতা কাব্যখানিকে আকর্ষণীয় করেছে। চরিত্র সৃষ্টিতে কবি অতুলনীয়—তাঁর হাতে শিব, কালকেতু, বিশেষ

করে টাইপ চরিত্র মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত অনবদ্য হয়েছে। অনেকে মুকুন্দকে দুঃখবাদী বলে চিহ্নিত করতে চাইলেও তার কাব্যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-আনন্দ-বেদনার তালে তালে যে জীবন-ছন্দ বয়ে গেছে তা দেখে আমরা নিঃসন্দেহে কবিকে জীবনবাদী-মানবতাবাদী কবিরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

ষোড়শ শতাব্দীর দু'-চার জন কবির নাম পাওয়া গেলেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আলোচনায় তাঁরা নিষ্প্রভ।

7.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে 94 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান

	ঠিক	ভুল
(ক) চণ্ডীমঙ্গলে তিনটি কাহিনী আছে।	☐	☐
(খ) চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মানিক দত্ত।	☐	☐
(গ) মুকুন্দ দুঃখবাদী কবি।	☐	☐
(ঘ) মাধবাচার্য বা দ্বিজমাধবের কাব্যেই একমাত্র 'বিষ্ণুপদ' আছে।	☐	☐
(ঙ) মুকুন্দর কাব্য 1579 খ্রিস্টাব্দে রচিত।	☐	☐

2. নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (✓) দিন

(ক) মুকুন্দ দামুন্যা গ্রাম থেকে যার জন্য চলে এসেছিলেন তার নাম	1. হুসেনশাহ 2. মাহ্‌মুদ সরিফ 3. বরবক শাহ
(খ) দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য কাব্যগ্রন্থের নাম কোন্ কোন্ স্থানে দিয়েছেন	1. কালিকামঙ্গল 2. চণ্ডীমঙ্গল 3. সারদামঙ্গল
(গ) মুকুন্দরামের কাব্য সাধারণত যে নামে পরিচিত তা হলো	1. সারদামঙ্গল 2. অভয়ামঙ্গল 3. চণ্ডীমঙ্গল
(ঘ) মুকুন্দর জন্মস্থান	1. দামুন্যা 2. মালদহ 3. চট্টগ্রাম

3. শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন
   (ক) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য চণ্ডীদেবীর_____উৎসের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।
   (খ) ওরাওঁদের শিকার ও যুদ্ধের দেবী_____।

(গ) কালকেতুর কাহিনী আছে_____খণ্ডে।

(ঘ) ধনপতির কাহিনী আছে_____খণ্ডে।

(ঙ) চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি_____।

7.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত। ধর্মঠাকুর ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষদের—বিশেষ করে ডোমদের দেবতা। এই দেবতা আদিতে ছিলেন অনার্য। পরে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার প্রভাবও এর ওপর পড়ে। কূর্মের অকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড ধর্মঠাকুরের প্রতীক। দেখতে অনেকটা বৌদ্ধস্তূপের মতো। এ থেকে মনে হয়, বৌদ্ধ প্রভাবও ধর্মঠাকুরের ওপর পড়েছিল। বাংলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বহু গ্রামে ধর্মের স্থান (বা থান) আছে। ধর্মমূর্তি পরিকল্পনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। যার ফলে কূর্মাকৃতি ছাড়াও বিচিত্র মূর্তি পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্য, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ব(ণ প্রভৃতি নানা দেবতার সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন।

ধর্মঠাকুরের পূজারীকে ধর্মের দেয়াসী বলে। পূজারীরা প্রধানত অ-ব্রাহ্মণ। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে ধর্মঠাকুর কালু রায়, বাঁকুড়া যায়, বুড়া রায় ও ডোম রায় ইত্যাদি নামে চিহ্নি(ত। রাঢ় অঞ্চল জুড়ে সুসংবদ্ধ ডোম জাতি মূলত ধর্মঠাকুরের উপাসক। এই দেবতা ডোমদের রণদেবতা। মনসা ও চণ্ডীর মতো ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতার মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা পাননি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের আখ্যানের তুলনায় ধর্মমঙ্গলের আখ্যান অর্বাচীন কালের। ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাল রাজাদের সম্পর্কে জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকার প্রভাব কিছুটা আছে। ঢেকুর গড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেন, ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বরী ঘোষ গৌড়েশ্বরের অপর সামন্ত, সে চণ্ডীর বরপুত্র এবং ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ একই ব্যক্তি(মনে করা হয়। রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্যরূপে ধর্মমঙ্গল পরিচিত। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল নারী-দেবতার কাহিনী কিন্তু ধর্মমঙ্গল পু(ষ-দেবতার কাহিনীসমৃদ্ধ। এই কাব্যে বীররস প্রাধান্য পেয়েছে। অনেকে এর মধ্যে মহাকাব্যিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—"ইহাই রাঢ়ের রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত।"

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষে(পে বর্ণনা হ'লো।

সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ চণ্ডীর বরলাভ করে দুর্দান্ত হয়। সে ঢেকুরগড়ের রাজা কর্ণসেনের বি(দ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে কর্ণসেন পরাজিত হয়। তার ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়—রানীও শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণসেনকে গৌড়েশ্বর আশ্রয় দেন এবং তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দেন গৌড়রাজের শ্যালক মহামদ। তার বিয়েতে মত ছিল না বলেই রাজা তাকে দূরে পাঠিয়ে দেন। বিয়ের পর কর্ণসেন ময়না গড়ের সামন্ত রাজা হন। মহামদ কিছুতেই সব ব্যাপার মেনে নিতে পারেনি। রঞ্জাবতীর সন্তানাদি না হওয়াতে ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কণ্টকশয্যা গ্রহণ করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় খুশি হয়ে ধর্মঠাকুর পুত্র বর দেন।

ছেলের নাম লাউসেন। মহামদ লাউসেনকে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মঠাকুর কর্পূরধবলকে সৃষ্টি করেন এবং রঞ্জাবতীর কোলে তুলে দেন। ধর্মের আদেশে হনুমান লাউসেনকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনে এবং ফলে রঞ্জাবতী হলেন দুই পুত্রের মা।

বড় হয়ে লাউসেন আর কর্পূরধবল গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করে। লাউসেনের বীরত্বে তিনি খুশি হন।

লাউসেনকে বধ করার জন্য মহামদের শত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। লাউসেন কামরূপ জয় করে সেখানকার রাজকন্যা কলিঙ্গাকে এবং লোহার গণ্ডারকে দুই টুকরো করে সিমুলার রাজকন্যা কানড়াকে বিয়ে করেন।

মহামদ চত্র(ান্ত করে লাউসেনকে পাঠায় ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এই অসাধ্য সাধনের জন্য সে তপস্যায় মগ্ন হয়। সেই সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আত্র(মণ করে। কিন্তু রানী কানড়ার কাছে সে পরাজিত হয়। এদিকে লাউসেন ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নিজের মাথা কেটে আগুনে আহুতি দেন। এতে প্রসন্ন হয়ে মহামদ নির্দেশিত লাউসেনের অসাধ্য কাজটি ধর্মঠাকুর করে দেন। তিনি সূর্যকে পশ্চিমদিকে উদিত হবার জন্য আদেশ দেন। ধর্মঠাকুরের অভিশাপে মহামদ কুষ্ঠরোগে আত্র(ান্ত হয় এবং লাউসেন ময়নাগড়ে ফিরে সুখে রাজত্ব করতে থাকেন।

ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছেন—ময়ূরভট্ট, খেলারাম চত্র(বর্তী, রূপরাম চত্র(বর্তী, ঘনরাম চত্র(বর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, মানিক গাঙ্গুলি প্রমুখ কবিগণ। তবে সবদিক থেকে ঘনরাম ও রূপরামই উল্লেখযোগ্য। নীচে বিভিন্ন কবির পরিচিতি প্রদান ও তাঁদের কাব্যের মূল্যায়ন সং(েপে করা হল

ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গলের প্রায় সকল কবিই ময়ূরভট্টকে আদি ধর্মমঙ্গল রচয়িতার সম্মান দিয়েছেন। সংস্কৃত 'সূর্যশতক'-এর রচয়িতা ময়ূরভট্ট। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে অথবা অন্য কোনোভাবে তিনি আদি ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর কোনো কাব্য পাওয়া যায়নি।

শ্যামপণ্ডিত ও খেলারাম শ্যামপণ্ডিতের পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। তাঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জনমঙ্গল'। 'পণ্ডিত' উপাধি দেখে অনেকে মনে করেন কবি ডোমদের ব্রাহ্মণ ছিলেন। ড. সুকুমার সেন শ্যামপণ্ডিতের কাব্য রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ বলে চিহ্নি(ত করেছেন। কাব্যের যে অংশটুকু পাওয়া গেছে তাতে ভাষা ব্যবহারে কবির নিপুণতা দেখা যায়। লেখায় ব্যঙ্গের সুর ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে।

অনেকেই খেলারামকে ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলে মনে করেন। তাঁরও কাব্যের খোঁজ পাওয়া যায় না। তবে কবি সম্পর্কে কিংবদন্তী রাঢ় অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

রূপরাম চত্র(বর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রূপরামের কাব্যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেন কবির কাব্যের কিছুটা অংশ প্রকাশ করেছেন, তা থেকেই রূপরাম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা গড়ে উঠেছে।

কবি-পরিচিতি রূপরাম রাঢ় দেশের কবি। ব্রাহ্মণ হয়েও ধর্মমঙ্গল রচনার জন্য তিনি সমাজে পতিত হয়েছিলেন। তবে এ-ব্যাপারে ব্যক্তি(গত কারণও থাকতে পারে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, কবির কাব্য রচিত হয়েছে ষোড়শ শতকের শেষদিকে। ড. সুকুমার সেনের মতে, রচনা 1649-50 খ্রিস্টাব্দ। রূপরামের কাব্যে শাহ সুজার নাম পাওয়া যায়, সেই সূত্র ধরেই রচনাকাল চিহ্নি(ত হয়েছে। রূপরামের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে। সমালোচকের ভাষায়—রূপরামের কাব্যে 'সরলতা আছে, বাহুল্য নাই।' তাঁর কাব্যে তৎকালীন বাঙালি জীবনের বাস্তব ও মনোহর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

কাব্য-কথা রূপরামই প্রথম কবি যিনি লাউসেনের কাহিনীকে ছড়া-পাঁচালী ও ব্রতকথার সীমানা ছাড়িয়ে, কাব্যাকারে রূপ দিয়েছেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' অংশটি সরল ও মর্ম(পর্শী ভাষায় লিখিত। চরিত্র চিত্রণ, ভাষা প্রয়োগ, বর্ণণাভঙ্গিমা ও রচনারীতি প্রশংসনীয়। ক(ণরস ও হাস্যপরিহাসে তাঁর কাব্যখানি মুকুন্দর চণ্ডীমঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী কবিগণ অনেকেই রূপরামকে অনুসরণ করেছেন।

রামদাস আদক রামদাস আদকের কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'(রচনা কাল 1662 খ্রিস্টাব্দ। কবি জাতিতে

ছিলেন কৈবর্ত, বাড়ি হুগলি জেলার হায়াৎপুর গ্রামে। অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কবির কাব্য সম্পাদনা করেন। তবে তাঁর সম্পাদিত কাব্য মূল পুঁথি নয়, লোকমুখে শোনা পয়ার-ত্রিপদী। রামদাসের কাব্যের সঙ্গে রূপরামের কাব্যের অনেক মিল আছে। কবির ভাষায় পরিচ্ছন্ন ক্লাসিক বাঁধন আছে। অলঙ্করণ মণ্ডণকলায়, শব্দযোজনায় ও রূপনির্মিতিতে কাব্যখানি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

সীতারাম দাস কবি জাতিতে কায়স্থ, বাড়ি বর্ধমান জেলার 'সুখসাগর' গ্রামে। কাব্য রচনাকাল 1698 খ্রিস্টাব্দ। পিতার নাম দেবী দাস, মাতা কেশবতী। সীতারাম দাসের কাব্যে ময়ূরভট্টের নাম মাঝে মাঝেই উচ্চারিত হয়েছে। কাব্যের কাহিনী স্বচ্ছ-বিবৃতিধর্মী। চরিত্র চিত্রণে দ(তা দেখাতে না পারলেও প্রকৃতি বর্ণনায় সে ঘাটতি কবি পূরণ করেছেন। ঘটনাবৈচিত্র্য তাঁর কাব্যকে সরস করেছে।

যদুনাথ (যাদবনাথ) বি(ভারতী থেকে ড. পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় যদুনাথের 'ধর্মমঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছে। কবি হাওড়া জেলার লোক। কবির পুঁথিটি অখণ্ডিত ও সম্পূর্ণ। যদুনাথের কাব্যকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত(করা যায় না। তাঁর কাব্যখানি ধর্মপুরাণ জাতীয়। কাব্যটিতে কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ল(্য করার মত।

ঘনরাম চক্র(বর্তী ধর্মমঙ্গলের সুপরিচিত কবি ঘনরাম চক্র(বর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। 1711 খ্রিস্টাব্দে কবি তাঁর কাব্য রচনা শেষ করেন। ঘনরাম বর্ধমান জেলার কৃষ(পুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আদেশেই তিনি চব্বিশ অধ্যায়ের সুবৃহৎ 'ধর্মমঙ্গল' লিখেছিলেন।

কাব্য-পরিচিতি বৃহৎ কাব্যখানির ফাঁকে ফাঁকে কবি পুরাণের নানা প্রসঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য থাকলেও কবির ভাষা স্বচ্ছ-মার্জিত, অনুপ্রাস অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি থাকলেও অলঙ্করণ-সজ্জা মানানসই। ধর্মমঙ্গলের বীর রসাত্মক চরিত্রগুলি কবির হাতে মানবিক কোমল-পেলবতায় মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে। তবে তার জন্য বীরত্বের হানি ঘটেনি। ঘনরামের প্রখর বাস্তববোধ, সূক্ষ্ম পর্যবে(ণ শক্তি(, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। কবির হাতে কালু ডোমের সরল বীরত্ব, মহামদের ছলচাতুরী, কানড়ার প্রেমভাবনা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবির সৃষ্টিতে বিদগ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বসূচনা দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় ঘনরাম চক্র(বর্তীর কাব্যই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় এবং এজন্য তাঁর জনপ্রিয়তাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

মানিক গাঙ্গুলি অষ্টদশ শতাব্দীর অপর একজন ধর্মমঙ্গলের কবির সময়কাল সম্পর্কে কিছুটা বিতর্ক আছে। প্রামাণিক পুঁথি না পাওয়ার জন্যই এই বিভ্রাট। অনেকের মতে কাব্যখানি 1547 খ্রিস্টাব্দে রচিত কিন্তু কাব্যের ভাষাবিচারে একে ষোড়শ শতাব্দীর কাব্য মনে হয় না। পুঁথিতে যে সন ও তারিখ পাওয়া যায় সেটি হয়তো নকলনবীসদের কিছুটা ভ্রান্তির ফল। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে গ্রন্থটির রচনাকাল 1781 খ্রিস্টাব্দ। অন্যদের মতে 1787 খ্রিস্টাব্দ। তবে রচনাকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত থাকলেও কাব্যের ভাষা বিচারে বলা যায় কাব্যখানি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই লেখা কবির হাতে ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতায় পরিণত হয়েছে। তবে চরিত্র চিত্রণে কবির কৃতিত্ব আছে। মানিক গাঙ্গুলি 'শীতলামঙ্গল' নামেও একখানি কাব্য লিখেছেন। এর পরবর্তী পর্যায়েই আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গলের পাঠ নবম এককে পাব।

7.10 সারাংশ

ধর্মঠাকুর দেবতারূপে তুর্কী বিজয়ের সময় থেকে সমাজে বিকশিত হতে শু(করেন। এর ভিত্তিভূমিতে প্রস্তর উপাসনা, আদিম লৌকিক সূর্য উপাসনা ও ডোমদের যুদ্ধদেবতা থাকলেও ত্র(মে পৌরাণিক বিষু(, শিব এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়ে। ধর্মঠাকুর উচ্চবর্ণের দ্বারা কখনোই পূজিত হননি। বীর রসাত্মক, যুদ্ধপ্রধান কাব্যখানি 'রাঢ়ের মহাকাব্য' বলে পরিচিত। বীর রমণীদের জীবনচিত্র এই কাব্যধারায় বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কোনো গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও ময়ূরভট্টও আদিকবিরূপে চিহ্নি(ত। প্রথম পর্যায়ের কবিদের মধ্যে শ্যামপণ্ডিত ও খেলারামের নাম উল্লেখ করতে হয়। তবে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শক্তি(শালী কবি হলেন রূপরাম। সহজ-সরল, বাহুল্যবর্জিত কাব্যখানি বাস্তব জীবনরসে ভরা। লাউসেনের কাহিনী তিনিই প্রথম কাব্যের আসরে এনে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক(ণরস এবং হাস্যরস সৃজনে কবি সার্থক। অনেক কবিই রূপরামের লেখাকে অনুসরণ করে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। এ ছাড়া রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যদুনাথ প্রমুখ কবিগণও ধর্মমঙ্গলকাব্যকে সমৃদ্ধ করতে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যকারদের মধ্যে ঘনরাম চত্র(বর্তীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির চরিত্র চিত্রণ সার্থক। ভাষাও স্বচ্ছ। এ যুগেই মানিক গাঙ্গুলি 'ধর্মমঙ্গলকাব্য' লেখেন। কবির হাতে ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। চরিত্র চিত্রণে কবির কৃতিত্ব আছে। কাব্যখানির রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও ভাষাবিচারে একে অষ্টাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি বলেই মনে হয়।

7.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্র(গুলির নির্দেশমত উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 94 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. নীচে কয়েকটি প্র(দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্((✓) দিন

(ক) ধর্মঠাকুর পূজারী হলেন	1. ব্রাহ্মণ
	2. কায়স্থ
	3. অ-ব্রাহ্মণ
(খ) সোম ঘোষের পুত্র	1. লাউসেন
	2. ইছাই ঘোষ
	3. মহামদ
(গ) শ্যামপণ্ডিতের কাব্যগ্রন্থের নাম	1. ধর্মমঙ্গল
	2. অনাদিমঙ্গল
	3. নিরঞ্জনমঙ্গল
(ঘ) কবি রূপরাম হলেন	1. ষোড়শ শতাব্দীর কবি
	2. সপ্তদশ শতাব্দীর কবি
	3. অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি

(ঙ) পাণ্ডিত্যের জন্য ঘনরাম চত্র(বর্তী উপাধি পেয়েছিলেন

1. কবিরত্ন
2. ন্যায়রত্ন
3. ভারতরত্ন

2. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান

	ঠিক	ভুল
(ক) মহামদ রানী কানড়ার কাছে পরাজিত হন।	☐	☐
(খ) ধর্মমঙ্গলের আদিকবি রূপরাম।	☐	☐
(গ) রামদাস আদকের কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'।	☐	☐
(ঘ) সীতারাম দাসের কাব্য 1698 খ্রিস্টাব্দে রচিত।	☐	☐
(ঙ) ঘনরাম চত্র(বর্তীর কাব্য ুদ্র।	☐	☐

3. নীচের শূন্যস্থানগুলি যথার্থ শব্দ দিয়ে পূরণ ক(ন

(ক) যদুনাথ (যাদবনাথ)-এর কাব্য ——— ——— সম্পাদনা করেন।

(খ) ঘনরাম চত্র(বর্তীর কাব্য ——— খ্রিস্টাব্দে রচিত।

(গ) রূপরামের কাব্য ——— রস ও —— রসে স্নাত।

(ঘ) প্রায় সকল 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যকারগণই ময়ূরভট্টকে —— বলে চিহ্নি(ত করেছেন।

(ঙ) সকল দিক বিচারে ——— ও ————ই 'ধর্মমঙ্গলকাব্য' ধারার উল্লেখযোগ্য কবি।

7.12 উত্তর সংকেত

7.5 অনুশীলনী 1

1. (3), (2), (4)।

2. (ক) পদ্মাপুরাণ, (খ) মনসামঙ্গল।

3. (ক) তিন, (খ) সংস্কৃতপুরাণ, (গ) বিজয় গুপ্ত, (ঘ) কেতকাদাস, (ঙ) আদি, (চ) উত্তর।

4. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

7.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

2. (ক) 2, (খ) 3, (গ) 2, (ঘ) 1।

3. (ক) পৌরাণিক, (খ) চাণ্ডী, (গ) আখেটিক, (ঘ) বণিক, (ঙ) মুকুন্দ।

7.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) 3, (খ) -2, (গ) -3, (ঘ) 2, (ঙ) 1।

2. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

3. (ক) পঞ্চানন মণ্ডল, (খ) 1711 খ্রিস্টাব্দ, (গ) ক(ণ, হাস্য, (ঘ) আদিকবি, (ঙ) রূপরাম, ঘনরাম।

7.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ড. ভূদেব চৌধুরী।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (ে ত্র গুপ্ত।
5. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

একক 8 ❑ চৈতন্যদেব—জীবনীসাহিত্য ও বৈষ(ব পদাবলি

গঠন

8.1 উদ্দেশ্য
8.2 প্রস্তাবনা
8.3 মূলপাঠ চৈতন্য জীবনী
8.4 সারাংশ
8.5 অনুশীলনী 1
8.6 মূলপাঠ জীবনী সাহিত্য
8.7 সারাংশ
8.8 অনুশীলনী 2
8.9 মূলপাঠ বৈষ(বপদ সাহিত্য
8.10 সারাংশ
8.11 অনুশীলনী 3
8.12 উত্তর সংকেত
8.13 গ্রন্থপঞ্জি

8.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-ধর্মের (ে ত্রে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মধ্যযুগের গতানুগতিক পথ ছেড়ে বাংলা সাহিত্যে 'জীবনী-সাহিত্যে'র রূপরেখাটি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ(ব সাহিত্য ধারার সঙ্গে চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির পার্থক্য ও ধারাটি জানতে পারবেন।

8.2 প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের নবজাগরণ অর্থাৎ 'চৈতন্য রেনেসাঁস' বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে যে জাগরণ ঘটিয়েছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই বৈষ(ব-সাহিত্য ঐ(র্যের দীপ্তি মহিমা নিয়ে প্রকাশ পায়। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের প্রেমলাবণী ধারায় বাংলাদেশ ভেসে যায়। তাঁর শিষ্য ও অনুচর পরিকরগণ চৈতন্যদেবের ভাব উচ্ছ্বাসে প-াবনমুখর প্রেমভাবনাকে তত্ত্বকথা ও দর্শনের দ্বারা সুসমৃদ্ধ করে গৌড়ীয় বৈষ(বধর্মের ভিত্তি তৈরি করেন। এযুগের সাহিত্যকর্মের আলোচনা করতে গেলেই চৈতন্যজীবনী ও তার প্রভাবের কথা আবশ্যিক বলে গণ্য। নবদ্বীপের নিমাই কীভাবে মধ্যযুগের প্রাণপু(ষ হয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ী মানবতাবাদী প্রেমাবতাররূপে চিহ্নি(ত হলেন, তা জানা প্রয়োজন। চৈতন্যদেবের ব্যক্তি(মহিমার স্পর্শ নবদ্বীপের ভক্ত(দের ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তাঁর জীবনকে ঘিরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক-তাত্ত্বিক ভাবনা গড়ে উঠল—ইত্যাদি জানা অত্যাবশ্যক। চৈতন্যজীবনীর পাশাপাশি, বাংলার সাহিত্য সমাজ ও ধর্মের (ে ত্রে চৈতন্যদেবের প্রভাব

এবং চৈতন্যভাব আন্দোলনের সমৃদ্ধ ফসল জীবনীসাহিত্য, বৈষ(বপদাবলি, কৃষ(লীলা কাব্য—ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি জানার মধ্য দিয়েই আপনারা চৈতন্যযুগের মূল স্বরূপটি ধরতে পারবেন। একমাত্র 'শি(াষ্টক' ছাড়া অন্য কিছু না লিখেও বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবিত যুগটি কেন স্মরণীয়— সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই একক লিখিত।—জীবনচরিতকার বৃন্দাবনদাস, কৃষ(দাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচনদাস ও বৈষ(বপাদকর্তা জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাসের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানা তথ্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ এই একক চৈতন্যযুগের স্পষ্ট ধ্যান-ধারণার সহায়ক।

8.3 মূলপাঠ চৈতন্য জীবনী

চৈতন্যজীবনী 1486 খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। জগন্নাথের আদি বাস ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীচৈতন্যের অগ্রজের নাম বি(্বরূপ। তাঁর বাল্য নাম বি(্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই। গায়ের রং গৌরবর্ণ ছিল বলে তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গোরা বলেই ডাকত।

বড় ভাই অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বলে, পিতা গৌরাঙ্গকে প্রথমে টোলে না পাঠালেও পরে তাঁর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠান।

সেযুগে নবদ্বীপ ছিল বাংলাদেশের সর্বপ্রধান বিদ্যাকেন্দ্র ও নব্যন্যায়ের পীঠস্থান। স্বল্পদিনের মধ্যেই নিমাই নানা শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করে পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য বলে খ্যাতি লাভ করেন। পিতার দেহত্যাগের পর নিজেই টোল খুলে শি(কতা শু(করেন। লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করার কিছুদিন বাদেই তিনি পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে যান। বেশ কিছুদিন সেখানে নানা স্থান পরিভ্রমণ শেষে নবদ্বীপ ফিরে আসেন। এদিকে সর্পাঘাতে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে মাতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বিষ্ণু(প্রিয়াকে বিয়ে করেন।

ষোল বৎসর বয়সে গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে সন্ন্যাসী ঈ(্বরপুরীর কাছে নিমাই 'গোপাল মন্ত্রে' দী(া গ্রহণ করেন। সেদিন থেকে তাঁর জীবনে দেখা দেয় ভক্তি(রসের প-াবনধারা। শু(হয় জীবনের নব অধ্যায়।

নবদ্বীপে ফিরে নবরূপে নিমাই আত্মপ্রকাশ করেন। পাণ্ডিত্যের অহংকার দূরে নি(েপ করে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে ঐক্য ও প্রেম আনবার জন্য হরিসংকীর্তন শু(করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে অহোরাত্র কীর্তন চলতে থাকে। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক নিত্যানন্দ ও হরিদাস। কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, নানা প্রতিকূল অবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করে তাঁর নগর সংকীর্তন নবদ্বীপধামকে ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা করে।

24 বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছ থেকে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর নাম হয় "শ্রীকৃষ(চৈতন্য"—সং(েপে 'শ্রীচৈতন্য'। এরপর কিছুদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে থেকে তিনি পদব্রজে পুরী যান, সেখান থেকেই প্রথমে দা(ণাত্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার শান্তিপুর, গৌর, রামকেলি। এই রামকেলিতে অবস্থানকালেই হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী 'সাকর মল্লিক' (সনাতন) ও 'দবীর খান' (রূপ) শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৃতীয়বার তিনি ঝাড়খণ্ড, কাশী, মথুরা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ঘুরে আসেন। তীর্থ ভ্রমণে তাঁর মোট ছয় বছর লেগেছিল। জীবনের শেষ আঠারো বছর শ্রীচৈতন্য পুরীধামেই ছিলেন। জীবনের শেষ কয় বছর তিনি প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটান। প্রেমধর্মে সমগ্র দেশকে প-াবিত করে 1533 খ্রিস্টাব্দে পুরীতেই তাঁর তিরোভাব ঘটে। এই তিরোভাবের ব্যাপারটি আজও রহস্যপূর্ণ রয়েছে। তবে প্রচলিত ধারণা অনুসারে নানা মত পাওয়া যায়। (1) দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীচৈতন্য

সমুদ্রের বুকে লীন হয়েছেন। (2) নগ্নপদে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নগর সংকীর্তনকালে পায়ে আঘাত পান, সেই আঘাতজনিত কারণে দেহান্ত ঘটে। তৃতীয় কারণ হিসাবে পুরীর পাণ্ডাদের ষড়যন্ত্রের কথাও অস্বীকার করা যায় না। তবু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ব্যাপারটি আজও রহস্যাবৃত আছে।

বাংলা সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

প্রাক্-চৈতন্যযুগের অন্ধকারময় যুগ ও তুর্কী আত্র(মণে বিধ্বস্ত জাতীয়-জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চারের নানা উপায়—অনুবাদ শাখা ও মঙ্গলকাব্য ধারার আলোচনায় জানা গেছে। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পর তাঁর প্রাণপূর্ণ প্রেমসিদ্ধ আহ্বানে বাঙালি চিন্তা-চেতনার জগতে যে সাড়া জেগেছিল, তার ফলে সমাজজীবনে দেখা দেয় ভরা জোয়ার। বাংলার ম্রিয়মাণ মন্থর জীবনে জেগে ওঠে নূতন সুর ও ছন্দ, দেখা দেয় তীব্র গতি। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের (ে ত্রে চৈতন্যদেবের বহুমুখী প্রভাব ল(্য করা যায়। স্মার্ত হিন্দু সমাজের বৌদ্ধিক অহংকার ও বৃহত্তর সমাজ থেকে দূরত্ববোধ, দূর হয়। চৈতন্যদেবের ধর্মীয় উদারতা নিম্নমার্গের মানুষকে উৎসাহিত ও উদ্বেলিত করে। 'আদ্বিজ-চণ্ডাল' একই মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র্যের সীমানা ভেঙে পারস্পরিক বি(্বাসের ও ঐক্যের ভিত তৈরি হয়।

অদ্বৈত আচার্য, রূপ ও সনাতন, রায় রামানন্দ প্রমুখ পণ্ডিতগণ যেমন চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তেমনি রাজা প্রতাপ (দ্র, পঞ্চকোটের হরিনারায়ণ রাজ, সপ্তগ্রামের ধণাঢ্য বণিক উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তি(তাঁর অনুগামী হন। বাংলার সমাজে ধর্ম-সংস্কার প্রেম-ভক্তি(র পথ ধরে দ্রুত অগ্রসর হয়। ধর্মীয় জীবনে সংহতিবোধ দেখা দেয়। চৈতন্যদেবের জীবনদর্শনে—

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ(বোলে।
বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে।।"

এই দর্শনের আলোকেই এক সর্বধর্ম সমন্বয়ী ভাবনা উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়। কাজীর সংকীর্তন নিষেধের আদেশকে অমান্য করে চৈতন্যদেব অহিংস আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। সমাজজীবনকে কলুষমুক্ত(করে পবিত্র আদর্শ, মানবমুখী জীবন-যাপনের পথ তিনিই দেখান। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে, এমনকী অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মানবতাবাদী দৃষ্টি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করতে পদ(প নেন। প্রমাণস্বরূপ ভক্ত(হরিদাসের কথা বলা যায়। তাঁর ধর্ম-আন্দোলনে ইসলামি ভাব-ভাবনা ও সুফি-সাধনরীতির কিছু কিছু সূত্রও মিশে যায়। অর্থাৎ ধর্ম সমন্বয়ের শক্ত(ভিতের ওপর চৈতন্যদেব সমগ্র সমাজকে দাঁড় করাতে স(ম হয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শোষণ-বঞ্চনা, ধর্মের নানা আচার-বিচার-ব্যভিচার থেকে মুক্ত(, সমন্বয়ী, সুস্থ, আত্মশক্তি(তে জাগ্রত, ভক্তি(প্-াবনে মুখরিত, মানব প্রেমের বার্তা তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'চৈতন্য শুধু একজন ব্যক্তি(নন, একটি যুগের প্রতিনিধি—শুধু একটি যুগের প্রতিনিধি নন, সর্ব যুগের প্রেমভক্তি(, ত্যাগ-তিতি(ার একমাত্র প্রতীক বলে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।" মাত্র 48 বছর জীবনকালে চৈতন্যদেব ধর্ম সম্প্রদায়, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বি(্বইতিহাসে তা সুদুর্লভ।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যজগতে স্বর্ণযুগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই জীবনী-সাহিত্য রচনার শু(। বৈষ(ব পদাবলিতে তাঁর প্রেমমগ্ন ভাবতন্ময় জীবনকেন্দ্রিক গৌরাঙ্গ পদ রচিত হ'লো। গৌড়ীয় বৈষ(ব দর্শনের আলোয় মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য শাখায় (-থতা, স্থূলতা, অবিন্যস্ততা

ইত্যাদি বর্জন করে স্রষ্টাগণ রচনাভঙ্গি, প্রকাশরীতি ও জীবনবোধের (ে ত্রে নিয়ে আসেন সংযম-শাসিত, পরিণত রসোত্তীর্ণ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভার। এক কথায় বাংলা সাহিত্য জগতে নব-প্রাণের সঞ্চার হয়।

"চৈতন্যযুগ"—পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাপ্তি থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত চিহ্নি(ত। এই সময়সীমায় চৈতন্যদেবের প্রত্য(ও পরো(প্রভাবে বাংলার বুকে নব-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। দলবদ্ধভাবে একই সুরে, ছন্দে, নৃত্যে—অনন্ত প্রেমভাবনা ও মানবতাবাদের গভীরে ডুবে যাবার পথ দেখান চৈতন্যদেব। প্রেম, ভক্তি(, ক(ণা, মৈত্রীর মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ববোধের চরম বিকাশের সাংস্কৃতিক পাথেয় জুগিয়েছেন চৈতন্যদেব। তাঁর সংস্কৃতি যথার্থই প্রগতিধর্মী, মানবতাবাদী, স্বচ্ছ সংস্কৃতির উজ্জ্বলবর্তিকা।

8.4 সারাংশ

1486 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1533 খ্রিস্টাব্দ—এই সীমিত সময়ের মধ্যে চৈতন্য জীবন বিধৃত থাকলেও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিকূল সমাজে তাঁর প্রগতিবাদী মানবতাবাদী ভক্তি(-প্লাবনধারা এনেছিল বিপ্লব। ধর্মাধর্ম জাত-পাতের প্রাচীর ভেঙে সমাজজীবনে তিনি নিয়ে আসেন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বাদ। আদ্বিজ চণ্ডাল গৌড়ীয় বৈষ(ব দর্শনের আলোয় নূতন পথ দেখতে পান। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, পদব্রজে ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ী ভাবনার প্লাবনে দেশকে ভাসিয়ে দেন। যার ফলে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমাজজীবনে গড়ে তোলেন নবসংস্কৃতি।

চৈতন্যদেবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যার পরিচয় 5 ও 6 সংখ্যক এককে দেওয়া হয়েছে। তবে এই দুই এককে চৈতন্যোত্তর যুগের কথাও আছে। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন ছিল প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চৈতন্যযুগে—শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে—চরিত সাহিত্য গড়ে ওঠে, যা মানুষের জীবনরসাশ্রিত। তাছাড়া বৈষ(ব পদাবলিতে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদসংযোজন, ভাব-ভাষা, ছন্দের লালিত্য, ভাষা ব্যবহারে মাধুর্য ইত্যাদিও দেখা যায়। সমাজে সংহতি বোধের সৃষ্টি হয়। সমাজধর্ম—সংস্কারমুক্ত(হয়ে সর্বজনীন মানবধর্মে রূপান্তরিত হয়। স্মার্ত-হিন্দু সমাজের বৌদ্ধিক অহংকার দূর হয়। সমগ্র বাঙালি সমাজ আত্মস্থ হয়ে নবপথের যাত্রী হয়। বহু রাজা-মহারাজা-বিদগ্ধ জ্ঞানী-গুণী চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত(মণ্ডলীতে সকলের সমাজ সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা সমাজ-সাহিত্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির (ে ত্রে স্বচ্ছ পবিত্র প্রাণমুক্তি(র বার্তাবহ শ্রীচৈতন্য শুধু সমকালের নয়, চিরকালের প্রেরণার মধ্যমণি।

8.5 অনুশীলনী 1

নীচের সমস্ত প্র(ে নির্দেশমত উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 113 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের কয়েকটি প্র(ে দেওয়া হ'লো। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক (✓) চিহ্(দিন

   (ক) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম বছর

   1. 1480 খ্রিস্টাব্দ
   2. 1510 খ্রিস্টাব্দ
   3. 1486 খ্রিস্টাব্দ

(খ) শ্রীচৈতন্যকে 'গোপালমন্ত্রে' দী(াদাতা
1. কেশব ভারতী
2. ঈ(রপুরী
3. শ্রীশ্রীরামকৃষ(

(গ) 'শ্রীচৈতন্যযুগের' সময়সীমা
1. ত্রয়োদশ শতাব্দী—চতুর্দশ শতাব্দী
2. ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ
3. পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শু(পর্যন্ত

(ঘ) 'চৈতন্যের নগর সংকীর্তনের বি(দ্ধে আদেশ জারি করেন1. কাজী
2. নবাব
3. উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ

2. উপযুক্ত(শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ ক(ন।
(ক) চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে _____ খ্রিস্টাব্দে।
(খ) চৈতন্যদেবের পিতার ____ মাতার নাম _____।
(গ) চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন_____ কাছ থেকে।
(ঘ) সাকর মল্লিক ও দবির খান হলেন_____ও_____।
(ঙ) চৈতন্যদেবের ভাবদর্শনে মুসলমান_____ আকৃষ্ট হন।

8.6 মূলপাঠ জীবনী সাহিত্য

চৈতন্যদেবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনই ছিল কবিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু চৈতন্যযুগে শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে চরিত-সাহিত্য রচিত হলো, তার মধ্যেই আমরা প্রথম দেখতে পেলাম—সাহিত্যের মূল বিষয় প্রত্য(ভাবে মানুষকেন্দ্রিক। চরিত-সাহিত্যে অলৌকিকতা কিছু থাকলেও মূলত এই শ্রেণীর সাহিত্য জীবনরসাশ্রিত। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণকে উপল(করে ভারতের নানা অংশের কিছু কিছু তথ্যও এইসব গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি নানা দিক থেকে বিশিষ্ট সম্পদ। শুধু তাই নয় বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের সূত্রপাতও এখান থেকে। সাধারণভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের রাজা-মহারাজাদের কীর্তি-কাহিনী প্রচারের জন্য সভাকবি বা অনুগৃহীত লেখকগণ সংস্কৃত ভাষায় কিছু জীবনী সাহিত্য রচনা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাক্‌পতিরাজের, 'গৌড়বহ', কবি বি(নের 'বিত্র(দেব চরিত', রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে চৈতন্যদেব রাজা-মহারাজা নন, রাজ্য জয়ের কোনো কীর্তিও স্থাপন করেননি, শুধু প্রেমভক্তি(যার একমাত্র সম্বল— সেই প্রেমাবতারকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে গড়ে ওঠে জীবনকাব্য রচনার মহামূল্য এক অধ্যায়। এইসব চরিত কথামৃতে চৈতন্যের জীবন কথা ও বাংলাদেশের বৈষ(ব ধর্মের নানা অমূল্য তত্ত্ব-তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে।

চৈতন্যদেবের জীবনকালেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় (ুদ্র ও বৃহৎ আকারে তাঁর জীবনী রচিত হতে

থাকে। এইসব গ্রন্থাদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চরিত সাহিত্য' নামে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করে। চৈতন্যদেব সচেষ্টভাবে কোনো ধর্ম বা কোনো মত প্রচার করেননি—এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায় এবং গৌড় ও নীলাচলের ভক্ত(বৃন্দ। চৈতন্যদেবের ব্যক্তি(ত্ব ও তাঁর ধর্ম আন্দোলন সমকালকে মুগ্ধ করে এবং ভবিষ্যৎকালকেও গতিদান করে। চৈতন্যদেবের আলোচ্য দুটি দিকই চরিত সাহিত্যরচনার প্রেরণা-উদ্দীপকের উৎস হলেও চরিতকাব্য রচয়িতারা সকলেই সচেতনভাবে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবানের পৃথিবীতে আবির্ভাব বলে বি(্বাস করতেন।—মূলত চরিত কাব্যের মূল ভিত্তিভূমিতে ধর্মীয় প্রেরণা থাকলেও মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবনের প্রে(াপটে ব্যক্তি(-মানুষ চৈতন্যদেবের ব্যক্তি(ত্বের অভিব্যঞ্জনাও রয়েছে। ধর্মগত প্রেরণা মুখ্য হলেও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে চরিত শাখাটি অভিনব ও অদ্বিতীয়। নীচে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় যাঁরা চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনী-সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের কবি পরিচিতিসহ কাব্য পরিচিতি সং(েপে আলোচনা করা হ'লো। এর দ্বারা বাংলা জীবনী-সাহিত্যের গোড়াপত্তনের দিকটি জানা যাবে এবং এই সাহিত্য-শাখার তত্ত্ব-তথ্যাদি ও সাহিত্যিক গুণাগুণের নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব হবে।

বাংলা ভাষায় চৈতন্য জীবনী রচিত হবার পূর্বে কয়েকজন বাঙালি কবি সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেবের জীবনী লিখেছেন, তাঁদের সম্পর্কে সং(িপ্ত আলোচনা নীচে করা হ'লো।

1. **মুরারি গুপ্ত** চৈতন্যদেবের সহপাঠী এবং পরবর্তীকালে তাঁর ভক্ত(ও অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। মহাকাব্যের রীতিতে মুরারী গুপ্তের রচনা এই জীবনী গ্রন্থখানি—"শ্রীশ্রীকৃষ(চরিতামৃত" সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেই গ্রন্থখানি সুপরিচিত। একে চৈতন্য জীবনের আদি গ্রন্থরূপে চিহ্নি(ত করা যায়। গ্রন্থের প্রামাণিকতা নিয়ে প্র(্ন না থাকলেও রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। গ্রন্থটি ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশকে রচিত (1533-1542-এর মধ্যে)। রচনারীতি—সরল। উপস্থাপনা—অন্তরঙ্গ, লেখক চৈতন্য জীবনের মুখ্য তথ্য অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন।

2. **পরমানন্দ সেন—কবি কর্ণপুর** চৈতন্যদেবের অনুচর শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ সেন। কবিত্ব শক্তি(র জন্য পরমানন্দ ছেলেবেলাতেই মহাপ্রভুর স্নেহধন্য হন। চৈতন্যদেব আদর করে তার নাম দিয়েছিলেন 'কবি কর্ণপুর'। দু'হাজার (ে-াকযুক্ত(কবির 'চৈতন্য চরিতামৃতম্'—সংস্কৃত ভাষায় জীবনী মহাকাব্য নামে খ্যাত। অল্প বয়সে লেখা এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও কাব্যগুণ তেমন নেই। এছাড়া তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে দশ অঙ্ক সমন্বিত একখানি নাটকে চৈতন্য জীবনের প্রায় সব ঘটনাই তুলে ধরেছেন। ভক্তি(তত্ত্বের প্রাধান্যে নাট্যগুণ খর্ব হয়েছে। কবির তৃতীয় গ্রন্থের নাম 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বৈষ(ব তত্ত্বের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বৈষ(ব সমাজ ও সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থখানি মূল্যবান।

আলোচ্য দু'জন কবি ছাড়া কাশীধামের প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে এক চৈতন্যভক্ত(143টি (ে-াকে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' নামে একখানি চৈতন্য স্তোত্র কাব্য রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য জীবনী কাব্য ও নাটকগুলি বাঙালি সমাজের সীমানা ছাড়িয়ে অবাঙালি সমাজেও চৈতন্যমহিমা ছড়িয়ে দিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি(বর্গের রচনা হিসাবে অনেক সৃষ্টিই চৈতন্য জীবনের তথ্যগত দিকগুলি সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যের জীবনী মূল্যায়নে এর গু(ত্ব রয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলা ভাষায় চৈতন্য জীবন চরিতগুলি আলোচনা করলেই বাংলা চরিত সাহিত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিটি কীভাবে গড়ে উঠেছিল তা জানতে পারা যাবে। বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত', কৃষ(দাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল',

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়', ইত্যাদি চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় রচিত জীবনীকাব্য আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এঁদের রচিত জীবন-কাব্যগুলি একে একে সংি(প্তভাবে আলোচিত হ'লো।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন পরম বৈষ(বভক্ত(বৃন্দাবন দাস। তাঁর কাব্যখানি সুপরিচিত ও কাব্যগুণ সমন্বিত। বাংলাদেশের সমাজজীবনে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী, তত্ত্ব-তথ্য প্রচারিত হয়েছে—তার সিংহভাগই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে পাওয়া। কবি নিত্যানন্দের অনুগামী ছিলেন—তিনি তাঁর কাছ থেকে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত যে তথ্যাদি পেয়েছিলেন, তাকে অভ্রান্ত মনে করে তথ্যনিষ্ঠভাবে গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। কাব্যে কবি নিজের পরিচিতি তেমন কিছু দেননি—একমাত্র ব্যক্তি(পরিচিতির তথ্য হিসাবে পাওয়া যায়— যে কবি চৈতন্যভক্ত(শ্রীবাসের ভাইঝি নারায়ণীর পুত্র। পণ্ডিতগণের অনুমান 1519 খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম। নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে— দেনুর গ্রামে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। বৈষ(ব সমাজে কবি তাঁর গ্রন্থখানির জন্যই 'চৈতন্যলীলার ব্যাস'—বলে সম্মানিত হয়েছে। প্রথমে কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখলেও মায়ের অনুরোধে নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্য ভাগবত' রাখেন। এর মূলে ছিল লোচন দাস (ত্রিলোচন দাস)-এর 'চৈতন্যমঙ্গ ল' নামাঙ্কিত কাব্যখানি। ভাগবতের রচনাকাল সম্পর্কে নানা মত আছে— সেগুলি হ'লো—1533 খ্রিঃ, 1548 খ্রিঃ, 1574 খ্রিঃ। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে গ্রন্থখানি শেষ হয় 1542 খ্রিস্টাব্দের পর। কাব্যখানি তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত। আদি খণ্ড চৈতন্য জন্ম থেকে গয়া গমন পর্যন্ত পনেরোটি অধ্যায়ে রচিত। মধ্যখণ্ড— চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে ছাব্বিশটি অধ্যায়ে(এবং অন্ত্যখণ্ডে—শ্রীচৈতন্যের নীলাচলগমন এবং পুরী অবস্থানকালের চৈতন্য জীবনের কিছু কিছু ঘটনা আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে দশ অধ্যায়ে।

বৃন্দাবন দাসের তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থখানিতে মাঝে মাঝে অলৌকিক প্রসঙ্গ থাকলেও গ্রন্থের মূল মানবিকবোধ বিন্দুমাত্র (ুণ্ণ হয়নি। সমকালীন যুগচিত্রটি স্বল্পকথায় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন নবদ্বীপের বর্ণনায় কবির পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুনিষ্ঠভাবে কবি চৈতন্যদেবের ব্যক্তি(মহিমার মূল ভাবটি পরিস্ফুট করেছেন। চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোর লীলার বর্ণনায় কবি বাস্তবতা, সরলতা ও লোকচরিত্র জ্ঞানের সার্থক পরিচয় দান করেছেন। অন্য কোনো কবির হাতে এমন রূপটি ফুটে ওঠেনি। কৌতুকরসাশ্রিত আদি খণ্ডটি, বিশেষ করে চৈতন্যের বাল্যকৈশোরের বর্ণনা রমণীয় হয়ে উঠেছে। মধ্যখণ্ডে— নিমাইয়ের সন্ন্যাস যাত্রাটি অলঙ্কারবর্জিত বর্ণনায় ক(ণরসও ঘনীভূত রূপ নিয়েছে। অন্ত্যখণ্ডটি যেভাবে হঠাৎ শেষ হয়েছে, তাতে কাব্যের অঙ্গহানি অনেকটা ঘটেছে। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র দ্বারা কবি অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"শ্রীচৈতন্য ভাগবত মহাপু(ষের ভাগবত জীবনালেখ্য হয়নি, কবির বর্ণনায় সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"

লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' লোচন দাস বর্ধমান জেলার কোগ্রামের অধিবাসী। তিনি শ্রীখণ্ডের অন্যতম বৈষ(বগু('গৌরনাগর' মতের প্রবক্ত(া নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। কাব্য মধ্যে বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ থাকাতে স্পষ্ট বোঝা যায় লোচন দাসের কাব্য বৃন্দাবন দাসের পরে লিখিত।

কাব্য পরিচিতি লোচন দাসের কাব্যখানি মঙ্গলজাতীয় রচনা এবং পাঁচালীর ঢঙে সুরতাল সহযোগে গান

করার উদ্দেশ্যে রচিত। কাব্য মধ্যে প্রচুর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। বৈষ(ব সমাজে ও পদাবলী সাহিত্যে কবি সুপরিচিত। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র আদর্শে লোচন দাস কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর কাব্যেই একমাত্র শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণু(প্রিয়ার জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ—তাঁর গৃহত্যাগে বিষ্ণু(প্রিয়া ও শচীমাতার বিলাপ অংশটি ক(ণ রসে ভরা। এর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হোল

নিমাই-এর সন্ন্যাস-সংবাদে শোকবিহ্বল বিষ্ণু(প্রিয়া—

চরণ কমল পাশে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নেহারিয়ে কাতর নয়ানে।
হিয়ার উপরে খুইয়া বাঁধে ভুজলতা দিয়া
প্রিয় প্রাণ নাথের চরণে।।

এবং শচীমাতা কান্নায় ভেঙে পরে বলেন,

সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও।।

—শোক বিধুরা শচীদেবী এখানে যেন চিরন্তন মায়ের প্রতীক। তিনিই একমাত্র শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব প্রসঙ্গে জগন্নাথ-দেহে লীন হবার কথা উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় প্রহরে বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।

লোচনের গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান জনশ্রুতিনির্ভর। বৃন্দাবন দাসের মতো তিনি তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন না—তবে 'চৈতন্যমঙ্গলে' লোচন দাসের কবি প্রতিভার স্বা(র আছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যখানি বৃন্দাবন দাসের পরে লেখা। গবেষকদের ধারণা এটি 1560 খ্রিস্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ের রচনা। মধ্যযুগের বৈষ(ব সমাজে এর প্রভাব বা প্রচলন ব্যাপক ছিল না।

কবি পরিচিতি বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে রোদমা দেবীর গর্ভে কবির জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র পরম চৈতন্য ভক্ত(ছিলেন। জানা যায়, পুরী থেকে ফেরার পথে চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়িতে কয়েকদিন কাটান—যদিও কবি তখন শিশুমাত্র। বাল্যকালে কবির নাম ছিল 'গুইয়া', চৈতন্যদেবই নাম পাল্টিয়ে রাখেন—'জয়ানন্দ'।

কাব্য-পরিচিতি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যখানিও লোচন দাসের কাব্যের মতই পাঁচালীরূপে গীত হতো। কবির রচনায় কবিত্বের অভাব থাকলেও, পালাগানের ধরনেই গ্রন্থখানির বিশিষ্টতা। অন্যান্য চৈতন্য-জীবনচরিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের তিরোধানের ব্যাপারটি অলৌকিকতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকলেও জয়ানন্দের গ্রন্থ থেকে জানা যায়—জগন্নাথের রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে পায়ে ইটের টুকরো ঢুকে যায়—তা থেকে (ত সৃষ্টি—পরিণামে 'দেহান্ত'। অবশ্য বৈষ(ব-সমাজ কবির এই বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেননি।

9টি খণ্ডে কাব্যখানি সমাপ্ত। মূলত গানের রীতিতে—জনসাধারণের জন্যই লিখিত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের তথ্যের সঙ্গে জনশ্রুতিমূলক নানা তথ্যের মিশ্রণে কাব্য রচিত। গ্রন্থখানিতে চটকদার কিছু কিছু বর্ণনা থাকলেও তাতে ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে জনশ্রুতির আধা-সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

কৃষ(দাস কবিরাজ—'চৈতন্য চরিতামৃত' কৃষ(দাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থখানি শুধু মধ্যযুগের নয়—সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই স্মরণীয় জীবনীকাব্য। চৈতন্য জীবনীগ্রন্থাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কাব্য প্রকৃতপ(দার্শনিক তত্ত্বপ্রধান ভক্তি(ভাব-সমন্বিত কাব্য। কবি রূপ-সনাতন, দাস রঘুনাথ, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং জীব গোস্বামী এই 'ষট্ গোস্বামী' বা ছয় গোস্বামীর নির্দেশেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব, জীবনী, ভক্তি(ভাব ও ভাবনার স্বরূপ ও তটস্থ বিচার, ব্যাখ্যা ও বি(-ষণ করেছেন নিগূঢ় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা। কৃষ(দাস কবিরাজের মহাগ্রন্থখানির প্রতিটি ছত্র বৈষ(ব সমাজে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত।

কবি পরিচিতি কৃষ(দাস কবিরাজ অকৃতদার ছিলেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ঝামটপুর গ্রামে কবির জন্ম। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে ভক্তি(ভাব জাগ্রত হয়, তারপর নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। সেখানে বৈষ(ব আচার্যদের সাহায্যে কবি সমগ্র ভক্তি(শাস্ত্র ও বৈষ(ব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনের আচার্য ও গু(দের আদেশেই তিনি চৈতন্যদেবের অন্ত্যখণ্ড বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে উদ্যোগী হন। বৃন্দাবন দাসকে কবি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি(করতেন। এইজন্য তাঁর খ্যাতি যাতে বিন্দুমাত্র (ুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে চৈতন্যদেবের অন্ত্যখণ্ডটিকেই বিশেষ গু(ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা-বি(-ষণ করেছেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে।

কাব্য বিচার কৃষ(দাস কবিরাজের গ্রন্থখানিতেই চৈতন্য জীবনের সমগ্র রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। বিরাট গ্রন্থটি আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডে বিভক্ত(। আদি খণ্ডে সতেরোটি পরিচ্ছেদ আছে। এই অংশের প্রথমে বৈষ(ব দর্শনের নানাদিক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবার পর, সং(পে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের নানা কথা প্রকাশ পেয়েছে। বৃন্দাবন দাস এই অংশটি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন বলে কবি এই অংশটি সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন। মধ্যখণ্ডটি পঁচিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। বৃন্দাবন ভ্রমণ ও সেখান থেকে নীলাচলে ফিরে আসা পর্যন্ত সং(প্ত নানা ঘটনা ও চৈতন্যের জীবন-কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ। জীবনের শেষ সতেরো-আঠারো বছরের ভাব-লীলা স্থান পেয়েছে অন্ত্য খণ্ডে। এই খণ্ডটি খুবই গু(ত্বপূর্ণ। প্রেমোন্মাদ চৈতন্যদেবের জীবনচর্চা কবি ভক্তি(ভরে বর্ণনা করেছেন। অন্তরধর্মে ভাবুক ও অসীম কবিত্ব শক্তি(র অধিকারী কৃষ(দাস ভক্তি(-সুবাসিত হৃদয়ে চৈতন্য লীলামৃত প্রকাশ করেছেন। 32টি পরিচ্ছেদে খণ্ডটি সমাপ্ত। বৃদ্ধ বয়সে অতি কঠোর পরিশ্রম করে কৃষ(দাস তাঁর গ্রন্থ শেষ করেন। কাব্যের ভাষায় বৃন্দাবনী ছাপ পড়লেও পাণ্ডিত্যের অভাব কোথাও নেই। গ্রন্থকারের বৈষ(ব জনোচিত বিনয় উল্লেখযোগ্য—

"চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে
তাঁহার চরণ ধুএ(া করো মুঞি(পানে।।"

গ্রন্থটিতে মূলত প্রেম ও ভক্তি(বাদের দর্শন ব্যাখ্যা হয়েছে। সে যুগে বাংলা ভাষায় দুরূহ তত্ত্বের প্রাঞ্জল প্রকাশ সত্যই বিস্ময়কর। উপমা অলংকারাদিও সার্থক, যেমন,

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীবন গোবিন্দের অংশ পরকাশে।।"

কৃষ(দাস কবিরাজের গ্রন্থ সম্পর্কে ড. (ে ত্র গুপ্ত লিখেছেন,—"কৃষ(দাস কবিরাজের বই শুধু চরিতকাব্যই নয়, বৈষ(ব তত্ত্বকোষ বিশেষ।" দার্শনিকের মন নিয়ে কৃষ(দাস তত্ত্ব আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় মগ্ন হয়ে কাব্যখানি লিখেছেন। তবে এই দর্শনের আলোচনাও তিনি করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। চৈতন্য জীবনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে

সুযোগমতো তিনি গৌড়ীয় বৈষ(বদের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের নানা দিক আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর কাব্যে কৃষ(তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব সহজভাবে বিচার করেছেন। বাংলা জীবনীকাব্য হিসাবে এ গ্রন্থ তুলনা রহিত। তত্ত্বনিষ্ঠ জীবনীগ্রন্থের উৎসরূপে গ্রন্থটি সু-চিহ্নি(ত।

আলোচ্য কবিগণ ছাড়াও চূড়ামণি দাসের লেখা 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক একখানি চৈতন্য জীবনীকাব্য পাওয়া গেছে। কবি নিত্যানন্দের জনৈক অনুচরের শিষ্য, চৈতন্য তিরোধানের পর এটি লিখিত। কবির খণ্ডিত যে পুঁথিটি পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে কবি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়।

চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ ছাড়া অদ্বৈত জীবনীগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল', ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' ইত্যাদি গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থের তথ্যমূলক মূল্য ছাড়া সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই বলে বাংলা সাহিত্যের জীবনীগ্রন্থ শাখায় গু(ত্বহীন।

8.7 সারাংশ

প্রাচীনকালে রাজ-রাজড়াদের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে তাঁদের জীবনী নিয়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় জীবনীগ্রন্থ রচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর সমগ্র জাতির জীবনে যে ভক্তি(-ভাবের আন্দোলন সৃষ্টি হয় তা স্মরণীয়। এই মহামানবের জীবিতকালেই তাঁর জীবনী নানা তত্ত্ব-তথ্যে সমৃদ্ধ করে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত হয়। চৈতন্যজীবনী কেন্দ্র করেই 'চরিত সাহিত্য' শাখার উদ্বোধন ঘটে বাংলা সাহিত্যে। জীবনের রেখাচিত্ররূপে সংস্কৃত ভাষায় যে জীবনী-গ্রন্থগুলি লেখা হয় তার নাম ও গ্রন্থকারদের নাম নিম্নে বর্ণিত হ'লো।

(ক) মুরারি গুপ্তের—শ্রীকৃষ(চৈতন্য চরিতামৃতম্ বা মুরারি গুপ্তের কড়চা।

(খ) কবি কর্ণপুর বা পরমানন্দ রচিত—'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' ও 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'।

(গ) স্বরূপ দামোদরের কড়চা।

(ঘ) প্রবোধানন্দের—'চৈতন্য চরিতামৃত'।

বৈষ(ব ভক্ত(গণ ভক্তি(র আলোকে শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য লিখেছেন। বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিবৃন্দ হলেন—বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ(দাস কবিরাজ। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' প্রথম চৈতন্যজীবনী গ্রন্থরূপে চিহ্নি(ত। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কৃষ(দাস কবিরাজ, তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' বৈষ(ব তত্ত্ব-তথ্য সমৃদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। কবির অন্ত্য খণ্ডটি মূল্যবান। লোচনদাস ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য দু'খানি চৈতন্য জীবনীকাব্য হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' ও কৃষ(দাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণকারী। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের আদি-মধ্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ দান করে অন্ত্যলীলাটি অতি সং(েপে লেখার ফলে যে অসম্পূর্ণতা দেখা দিয়েছিল, কৃষ(দাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যের অন্ত্যলীলাটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা-বি(-ষণ করে সে অভাব পূর্ণ করেছেন। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ(দাস কবিরাজের গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলে চৈতন্যদেবের সামগ্রিক জীবন কাহিনীর তত্ত্ব-তথ্য সমৃদ্ধপূর্ণ রূপটি আস্বাদিত হবে। আলোচ্য চার জন কবি ছাড়া চূড়ামণি দাসের চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ ও অন্যান্য জীবনী গ্রন্থকাররূপে হরিচরণ দাস, ঈশান নাগর, নিত্যানন্দ দাস প্রমুখের নাম মাত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের গ্রন্থাদির কাব্যমূল্য তেমন নেই।

8.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্রশ্নগুলি নির্দেশমত উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 113 পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকজন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্ত(স্থানে লিখুন।

গ্রন্থ		রচয়িতা
(ক) চৈতন্য চরিতামৃত	—	লোচন দাস
(খ) চৈতন্যমঙ্গল		বৃন্দাবন দাস
(গ) চৈতন্য ভাগবত	—	কৃষ(দাস কবিরাজ
(ঘ) অদ্বৈতমঙ্গল		নিত্যানন্দ দাস
(ঙ) প্রেমবিলাস	—	হরিচরণ দাস
(চ) চৈতন্যচন্দ্রোদয়	—	পরমানন্দ সেন

গ্রন্থ	রচয়িতা
(ক)	
(খ)	
(গ)	
(ঘ)	
(ঙ)	
(চ)	

2. নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য 3টি উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্((✓) দিন

(ক) চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' কাব্যের ভাষা	1. সংস্কৃত
	2. প্রাকৃত
	3. পালি
(খ) বৃন্দাবন দাসের কাব্যের বিন্যাস	1. 2 খণ্ডে
	2. 4 খণ্ডে
	3. 3 খণ্ডে
(গ) চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো	1. চৈতন্য ভাগবত
	2. চৈতন্য চরিতামৃত
	3. চৈতন্য মঙ্গল
(ঘ) লোচন দাসের কাব্যের রীতি হ'লো	1. যাত্রা
	2. পাঁচালী
	3. নাট্য
(ঙ) কৃষ(দাস কবিরাজের গ্রন্থ রচনাকাল	1. পঞ্চদশ শতাব্দী
	2. ষোড়শ শতাব্দী
	3. সপ্তদশ শতাব্দী

3. শূন্যস্থানগুলিতে যথাযথ শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ ক(ন।
   (ক) বাণভট্ট রচনা_____করেন।
   (খ) রাম পালের সভাকবি_____রামচরিত লিখেছেন।
   (গ) কৃষ(দাস কবিরাজের কাব্যে_____তত্ত্বের নানা দিক আলোচিত হয়েছে।
   (ঘ) কৃষ(দাস কবিরাজের অন্ত্য খণ্ডে_____পরিচ্ছেদ আছে।
   (ঙ) লোচন দাস_____ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।
   (চ) চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক আদি চরিত্র গ্রন্থ_____।

8.9 মূলপাঠ বৈষ(ব পদসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের একক 4-এ প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ(ব-পদাবলি সাহিত্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তনে'র পরই এই এককে চণ্ডীদাস সমস্যা ও পদাবলি সাহিত্যে কবি চণ্ডীদাস ও 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির কবি-পরিচিতি ও কবিকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ঐ একক পাঠ করে বৈষ(ব পদসাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি যে ধারণা জন্মে থাকবে তাকে পটভূমিকা হিসাবে রেখে, চৈতন্যযুগে যে সব পদকর্তা বৈষ(বপদ রচনা করেছেন—এই এককে তাঁদের পরিচিতি ও কবি-কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এই আলোচনায় প্রাক্-চৈতন্যযুগের সঙ্গে চৈতন্যযুগের কবিদের মৌলিক পার্থক্যের নানা দিক জানতে পারা যাবে।

রাধাকৃষে(র লীলাকে নিয়ে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' থেকে শু(করে সংস্কৃত ও ব্রজবুলি ভাষায় যে পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তার পথ ধরেই সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চৈতন্যোত্তরযুগের কবিগণ পদরচনা করলেও নিজেদের গৌড়ীয় বৈষ(বধর্মের বি(্বাসকে সহজে মেলাতে পারেননি চৈতন্যপূর্ব কবিদ্বয়ের সঙ্গে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ(প্রেমলীলার ভাবনার উৎস কোনো ধর্মীয় দর্শন নয়, সমাজজীবনের নর-নারীর প্রেমভিত্তিক রচনা প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য। তবে, বিদ্যাপতির পদগুলি সচেতন শিল্পীর অলঙ্কার-সজ্জিত, যৌবনাবেগে প-াবিত(পদগুলি মানবিক প্রণয় কবিতার রূপেই বাঙালি লেখক ও পাঠককে মুগ্ধ করেছে। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দ দাসের হাতে তা আরও সমৃদ্ধ হয়। রোমাণ্টিক ভাবতন্ময় কবি চণ্ডীদাসের প্রভাব পরবর্তীকালে বহু পদকর্তার মধ্যে দেখা যায়। চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস এ ব্যাপারে সার্থক কবি। এই এককে চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ(ব কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদকর্তাদের পদসমূহের সঙ্গে এই এককের কবিদের সৃষ্টিসম্ভারের তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হবে।

চৈতন্যসমকালে ও পরে বৈষ(বপদ রচনার (ে ত্রে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ল(্য করা যায়। তবে চৈতন্যোত্তর যুগেই এর স্বর্ণফসল ফলেছে। চৈতন্যদেবের সমকালে গৌড়ীয় বৈষ(ব দর্শনের তত্ত্বাদির প্রভাব তেমন দেখা যায়নি যা চৈতন্যোত্তরকালে গভীর ও ব্যাপকরূপে দেখা যায়। শ্রীকৃষ(পূর্ণ ভগবান এবং রাধিকা তাঁর (াদিনী শক্তি(র সার—এই ধর্মীয় ভাবনা জাত চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ(ব পদাবলি। তবে এই ভাব-বি(্বাসের মূল তত্ত্বটির শৈল্পিক চেতনার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলেই এ যুগের পদগুলি এতো সমৃদ্ধ। এ যুগের বেশীর

ভাগ পদই কান্তাপ্রেম আশ্রয়ী মধুর রসে স্নাত। এই পর্যায়ের বৈষ(ব কবিগণকে দু'টি স্তরে ভাগ করে নীচে আলোচনা করা হ'লো।

1. চৈতন্যসমকালীন কবি চৈতন্যদেবের বহু ভক্ত(বৈষ(বপদ রচনা করেছেন এ সময়। রাধা-কৃষে(র প্রেমলীলার সঙ্গে গৌরাঙ্গবিষয় পদ রচিত হয় চৈতন্যসমকালে। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচিত হয়েছে। বৈষ(বীয় তত্ত্ব দর্শন তেমন প্রাধান্য পায়নি। তবে প্রেমে ভক্তি(ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব গভীররূপেই পড়েছে।

(ক) মুরারি গুপ্ত চৈতন্য জীবনীকার মুরারি গুপ্তের হাতে রাধাপ্রেমের কবিতাও প্রকাশ পেয়েছে চৈতন্যদেবের অনুচরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তই প্রথম পদাবলি রচনা করেন। বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় তিনি সাত-আটটার বেশি গান (পদাবলি) লিখেছেন বলে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন। তাঁর রচিত পদগুলির মধ্যে—

'স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসিয়েছি।
কি করিবে কুলের কুকুরে।।'

পদাংশে প্রেমবিপন্নার সর্বত্যাগী দুঃসাহসের প্রকাশ ঘটেছে। আর একটি হৃদয়স্পর্শী গানে বিরহিণীর গভীর মর্ম যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ(লীলা ও গৌরীলীলার পদগুলিতে কবির কবিত্বশক্তি(র প্রকাশ ঘটেছে।

(খ) নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত(ছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বংশে কবির জন্ম। তিনি পঁচিশটির মতো পদ রচনা করেন। তবে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনাতেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। গৌরাঙ্গকে নাগর এবং নিজের নাগরীরূপে কল্পনা করেই ভাবাবেগে আপ্-ুত হয়ে তিনি পদ রচনা করেছেন। ভাষা সহজ সরল। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে ছিটেফোঁটা আদিরসও আছে। উচ্চাঙ্গের কবিগুণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

বাসুদেব ঘোষ বাসুদেব ঘোষও নরহরি সরকারের মতো 'গৌর নাগরী' ভাবে বি(্বাসী ছিলেন। তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি সার্থক হয়েছে। নিমাইসন্ন্যাসের পদগুলি ভাষার সারল্যে ও ক(ণ রসের ছোঁয়ায় হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। চৈতন্য সমকালীন অন্যান্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন শিবানন্দ সেন, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং সামান্য কিছু পদ রচনা করেন। তবে, তিন জন ঘোষ ভ্রাতার মধ্যে বাসুদেব ঘোষই বৈষ(ব সাহিত্যে অধিকতর খ্যাতি লাভ করেন। এই সব কবি ছাড়া যদুনন্দন, গোবিন্দ আচার্য, বাসুদেব দত্ত প্রমুখ চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তা সামান্য কিছু পদ রচনা করলেও কবিত্বের দিক থেকে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বাংলা সাহিত্যের (ে ত্রে আলোচ্য কবিগণের আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

2. চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের আমরা দেখতে পাই। এই সময়সীমায় বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর ও গোবিন্দ দাস প্রমুখ পদকর্তারা বৈষ(ব পদাবলিকে এক সমৃদ্ধ স্তরে নিয়ে গেছেন। কলিযুগে কৃষ(াবতার চৈতন্যদেবকে জ্যোতির্ময় ভাগবত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গৌড়ীয় বৈষ(ব দর্শনের আলোয় আলোচ্য কবিগণ নতুন ভাবরসে মগ্ন হয়ে যে সব পদ উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে কাব্য সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বলতে গেলে এঁরাই বৈষ(বপদাবলির ঐ(্বর্যযুগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। নীচে আলোচ্য কবিদের সম্পর্কে সং(প্ত আলোচনা করা হ'লো।

1. **বলরাম দাস** বৈষ(বপদাবলি সাহিত্যে একাধিক বলরামের উল্লেখ থাকলেও প্রাচীনতর বলরাম দাসই আমাদের অলোচ্য। কবি কৃষ(নগরের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত তিনি নিত্যানন্দের কাছে দী(াগ্রহণ করেছিলেন।

কবির ভণিতায় 'পদকল্পত('তে 136টি এবং হরেকৃষ(মুখোপাধ্যায়ের সংকলন গ্রন্থে 176টি পদ পাওয়া যায়। কবির বাৎসল্যলীলার পদগুলি অতুলনীয়। রাধা-প্রেমের সকল বৈচিত্র্য নিয়েই তিনি পদ লিখেছেন। বলরাম দাসের কিছু কিছু পদ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল।

'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি(বলরামের পহুঁর চিত নহে থির।'

—এই দুটি চরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ল(ণীয়। বাৎসল্য রসের পদগুলিতে মা যশোদার স্নেহবিহ্বল দৃষ্টির সঙ্গে শিশু গোপালের চুরি করে ননী খাওয়ার চিত্র কবি কোমল মধুর রূপে এঁকেছেন। কবির রচনারীতিতে চণ্ডীদাসের প্রভাব ল(্য করা যায়। প্রচলিত শব্দের মালা গেঁথে কবি বহু পদকে সৌন্দর্যদান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাধার রূপানুরাগের পদাংশ তুলে ধরা হ'লো—

"কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপন দেখি কালা রূপখানি।।"

1. **জ্ঞানদাস** চৈতন্যোত্তর যুগের প্রথম শ্রেণীর কবি জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। তবে কবির কাব্য-প্রতিভার সার্থক স্ফূরণ ঘটেছে বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলিতে।

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের ভক্ত(এবং নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ(বীদেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কাছে 'কাঁদড়া' গ্রামে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত 'খেতুরী উৎসবে' কবি উপস্থিত ছিলেন।

জ্ঞানদাস ভাবের কবি, হৃদয়ধর্মের কবি। পূর্বরাগ, অনুরাগ পর্যায়ে কবির অনন্ত প্রেমের কড়িধরা স্বপ্নমুহূর্তে সা(াৎ দর্শনে আত্মাবিহ্বলা রাধিকার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।।"

রূপানুরাগ আ(পানুরাগের পদসমূহেও কবি রাধার অন্তরের আর্তি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। এই আর্তি প্রকাশে জ্ঞানদাস তাঁর কল্পনার রাধার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেছেন। এইজন্য রাধার হৃদয় বেদনায় কবিহৃদয় বেদনরসে স্নাত হয়েছে। চণ্ডীদাসের মতোই প্রেমবোধের জগৎ উদঘাটনে জ্ঞানদাস গভীর ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের মতোই সারল্য ও আন্তরিকতা জ্ঞানদাসের পদগুলির পরতে-পরতে আছে। কবির লেখনীতে কৃষ(রূপের বর্ণনায় রাধার অনুভূতিই যেন ভাষারূপ পেয়েছে।

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।"

এই দুই চরণ রবীন্দ্রভাবনাকেও আপ্লুত করেছিল। রূপের সরোবরে আঁখি ডুবে যাওয়া ও যৌবনের বনে পথ হারিয়ে যাওয়া—ছবি হিসেবে অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে ভরা বলেই এই চিত্ররূপের মধ্যে জ্ঞানদাসের ভাব ব্যাকুলতা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রূপকল্প সৃষ্টিতে কবিকৃতির স্বা(র তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের পদেই পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদ রচনার (ে ত্রে কবি বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন। তবে এই পদগুলি তেমন সার্থক হয়নি। কিন্তু চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করে জ্ঞানদাস বাংলা ভাষায় যে পদগুলি রচনা করেছেন সেইসব পদেই কবির প্রতিভা ও কবিকৃতি অনেকটা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রসগত বিচারে উভয় কবির মধ্যে গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৈষ(ব পদাবলির সাহিত্যে জ্ঞানদাস 'চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য'

রূপেই পরিচিত। এই পরিচিতি অনেকাংশেই সার্থক। কিন্তু জ্ঞানদাস রূপশিল্পী, ভাবশিল্পী(অন্যদিকে চণ্ডীদাস সাধক মরমিয়া কবি। জ্ঞানদাসের নিজের বিরহ পদটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

জ্ঞানদাসের রচনায় গভীর অকৃত্রিম ভাব আছে। কবি ভাব ও ভাবের প্রকাশরীতির মধ্যে সার্থক সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাস বৈষ(ব রসতত্ত্ব অনুযায়ী পদ রচনা করলেও ভাব প্রকাশের ((ত্রে সচেতন কবি যে ভাব, ভাষা ও চিতকল্পের মধ্য দিয়ে ভাবপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন তা অধুনিক মনকেও স্পর্শ করে।

3. **গোবিন্দদাস** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক, পরম বৈষ(ব চিরঞ্জীব সেন ছিলেন গোবিন্দদাসের পিতা। মাতামহ দামোদর সেন ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত সংগীত সাধক ও শাত্ত(মতে বি(্বাসী। বৈষ(ব ও শাত্ত(দুই বিপরীত বি(্বাস ও সাধনধারার উত্তরাধিকারী গোবিন্দদাস। ষোড়শ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে কবির জন্ম। প্রথম জীবনে শাত্ত(মতে বি(্বাসী এবং পরবর্তীকালে বৈষ(বধর্মের গু(শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি বহু পদ ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেছেন। ব্যত্তি(গতভাবে কবি মঞ্জরী ভাব-সাধনার অংশীদার অর্থাৎ সখীর সাহায্যকারিণী। 'প্রার্থনা'র পদে এই রূপটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হরেকৃষ(মুখোপাধ্যায়ের সংকলন গ্রন্থে কবির 297টি পদ আছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বজন স্বীকৃত কবি গোবিন্দদাস।

কবি-কৃতি ভাষার দিক থেকে গোবিন্দদাস 'বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য' এবং বাংলা সাহিত্যে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' রূপে পরিচিত। শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন।

ছন্দের ঝঙ্কারে, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারের প্রয়োগে, শব্দবিন্যাসের লালিত্যে গোবিন্দদাসের তুলনা নেই। আপন মনের ভত্তি(ও কবিত্বশত্তি(র দ্বারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ।

কবির, "নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।" পদটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গোবিন্দদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর 'অভিসার' পর্যায়ের পদগুলি। মেঘমেদুর বর্ষণক্লান্ত বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে অভিসারিকা রাধা কবির লেখনীতে অনন্যরূপ পেয়েছে। বর্ষাভিসারে কবি শ্রেষ্ঠ। 'ঘন ঘন ঝন ঝন বরজ নিপাত' মুহূর্তে দুঃসাহসিক রাধিকা প্রাণ তুচ্ছ করে প্রিয় মিলনের জন্য সংকেতস্থানে গমনের যে দৃঢ় পদ(েপ নিয়েছে, তা অতুলনীয়। কবি মূলত চিত্ররসের কবি। এই চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে কবি সংগীতের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর চিত্র বস্তুধর্মী, ভাবধর্মী নয়। প্রসাধনকলার দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়াতে ভাবগভীরতা তেমন দেখা যায় না।

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।****" পদটি গোবিন্দদাসের অভিসারের অন্যতম পদ। রাধিকার প্রিয়মিলনের এই প্রস্তুতিচিত্রে গভীর আর্তির সঙ্গে মিশে গেছে হৃদয়ের প্রত্যাশামুখী মিলন উল্লাস। এর সঙ্গে যুত্ত(আছে অনন্ত প্রেমের পিপাসা যা, বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে তেমনভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় না। উত্তর-চৈতন্য যুগের অন্যান্য কবির লেখনীতে গোবিন্দদাসের প্রভাব ল(্য করা যায়।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ছাড়া চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ(ব কবিদের মধ্যে রয়েছেন গোবিন্দদাস চত্র(বর্তী,

রায়শেখর (কবিশেখর) লোচনদাস, ঘনশ্যামদাস কবিরাজ, হরিবল্লভ প্রমুখ কবি। এঁদের মধ্যে অন্যতম পদকর্তা রায়শেখর (কবিশেখর)। কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। প্রকৃত চিত্র রচনার পাশাপাশি, শব্দ ঝঙ্কারের প্রতি কবির বিশেষ ঝোঁক ল(্য করা যায়। তাঁর মাথুর পর্যায়ের একটি অনবদ্য পদ—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।

এখানে শব্দ ঝঙ্কার যেমন আছে, তেমন চিত্রও ধ্বনি অনুগামী হয়েছে।

লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা। তিনি কয়েকটি পদও রচনা করেছেন। তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে 'গৌরনাগরী' ভাবের অনুসরণ আছে। ইনি ছন্দ ব্যবহারে শ্বাসাঘাতযুক্ত(ছড়ার ধরনের ত্রিপদী ছন্দ যা 'ধামালি' নামে পরিচিত, ব্যবহারে আকর্ষণ বোধ করতেন। ফলে পদগুলিতে লঘু চটুলতা প্রকাশ পেত যেমন,

বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা
বিনোদ গলে দোলে।
কোন্ বিনোদিনী গাঁথিলে মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে।

এ ছাড়া অন্যান্য কবি পদ রচনায় তেমন সাফল্য লাভ করেননি।

8.10 সারাংশ

প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ(ব পদকর্তা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশে ভক্তি(রসের যে বন্যা প্রবাহিত হয়, তার প্রভাবে বৈষ(বপদাবলি সাহিত্য বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পঞ্চরসের ধারায় স্নাত বৈষ(বপদাবলির মূল রস—মধুর রস। বৈষ(বধর্মে প্রেমই প্রধান সুর। মধুর রসের আলিঙ্গনে এই প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে পদাবলি সাহিত্যে। এই সৃষ্টি সম্ভার একাধারে গান ও বৈষ(ব সাধন-ভজনের দর্শন। তবে চৈতন্যোত্তর যুগের কবিগণের হাতে গৌরাঙ্গবিষয়ক ও বাৎসল্য রসের পদগুলি বৈষ(ব সাহিত্যে নব সংযোজন।

চৈতন্য সমকালের কবি মুরারি গুপ্ত ও বাসুদেব ঘোষ উল্লেখযোগ্য কবি। প্রত্য(অভিজ্ঞতার কারণে কৃষ(লীলা ও গৌরাঙ্গলীলার পদগুলিতে মুরারি গুপ্তের কবিত্বের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনায় এবং সহজ সরল ভাষায় রচিত বাসুদেব ঘোষের পদগুলি উল্লেখের দাবি রাখে।

চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তাদের মধ্যে 'চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য' জ্ঞানদাস ও বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বৃন্দাবনদাসের নাম স্মরণীয়। এঁদের সঙ্গে বলরামদাসের নামও যুক্ত(করতে হয়। প্রচলিত শব্দের দ্বারা তিনি বহু পদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। তাঁর বাৎসল্যরসের পদগুলি অনবদ্য।

নিত্যানন্দের ভক্ত(ও তাঁর স্ত্রী জাহ(বীদেবীর মন্ত্রশিষ্য জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষায় পদ রচনা করলেও বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি ছিলেন ভাবের কবি, হৃদয়ের কবি। চিত্ররূপকল্পতায় কবির স্বাতন্ত্র্য ল(ণীয়। তাঁর 'মাথুর' অর্থাৎ বিরহ পর্যায়ের পদগুলি হৃদয়স্পর্শী। ভাব ও ভাবের প্রকাশরীতির ((ত্রে কবি সার্থকভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

বৈষ(ব ও শাক্ত(—দুই বিপরীত বি(াস ও সাধনার ধারা কবি গোবিন্দদাস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কারে, অলঙ্কারের যথাযথ সজ্জায় সজ্জিত কবির ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি হৃদয়ে অনুরণন জাগায়। ভাষা ও রীতির দিক থেকেই গোবিন্দদাস 'বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য'। বাংলা সাহিত্যে কবি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত। 'অভিসার' পর্যায়ের পদগুলি কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। চৈতন্যোত্তর যুগের বহু বৈষ(ব কবি গোবিন্দদাসের ভাব-ভাবনা ও প্রকাশরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই পর্যায়ের অন্যান্য বৈষ(ব কবিতার স্রষ্টা হলেন লোচনদাস, রায়শেখর, শ্যামদাস, কবিরাজ গোবিন্দদাস চক্র(বর্তী হরিবল্লভ(এঁদের মধ্যে অন্যতম পদকর্তা রায়শেখর (কবিশেখর)। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। প্রকৃতিচিত্র কবির হাতে জীবন্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি শব্দঝঙ্কার সৃষ্টিতেও কবি সার্থক। লোচনদাস একাধারে চৈতন্য-জীবনী রচয়িতা ও পদকর্তা। তাঁর পদে লঘু চটুলতার পরিচয় আছে।

8.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর লেখা হয়ে গেলে 113 পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. নীচে প্র(গুলির তিনটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে পর পর। যেটি সঠিক উত্তর তাতে টিক চিহ্((✓) দিন

(ক) জ্ঞানদাস ভাবশিষ্য ছিলেন—
1. বিদ্যাপতির
2. চণ্ডীদাসের
3. লোচনদাসের

(খ) গোবিন্দদাসের কাব্য-প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে—
1. প্রাক্-চৈতন্য যুগে
2. চৈতন্য সমকালে
3. চৈতন্য পরবর্তীকালে

(গ) বলরামদাসের শ্রেষ্ঠ পদ হ'লো—
1. মধুর রসের
2. বাৎসল্য রসের
3. শান্ত রসের

(ঘ) গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি রচিত হয়েছে—
1. ব্রজবুলি ভাষায়
2. প্রাকৃত ভাষায়
3. বাংলা ভাষায়

2. শূন্যস্থানগুলি যথার্থ শব্দযোগে পূরণ ক(ন।

(ক) 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' পদটির রচয়িতা ———।

(খ) বৈষ(বপদাবলির ঐ(র্য যুগের প্রমাণ পাওয়া যায় ———।

(গ) 'পদকল্পত(তে' বলরামদাসের——— পদ পাওয়া যায়।

(ঘ) জ্ঞানদাস———শিল্পী————শিল্পী।

(ঙ) গোবিন্দদাসকে——— 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।

3. নীচের বক্তব্যগুলি/ঘটনাগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

		ঠিক	ভুল
(ক)	জ্ঞানদাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি।	☐	☐
(খ)	গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন।	☐	☐
(গ)	চৈতন্য সমকালীন কবি বাসুদেব ঘোষ।	☐	☐
(ঘ)	'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে' পদটির রচয়িতা লোচনদাস।	☐	☐
(ঙ)	বাসুদেব ঘোষ 'গৌরনাগরী' ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।	☐	☐

8.12 উত্তর সংকেত

8.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) (3) 1486, (খ) (2) ঈশ্বরপুরী, (গ) (3) শেষ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশের শুরু, (ঘ) (1) কাজী।

2. (ক) 1553 খ্রিঃ, (খ) জগন্নাথ মিশ্র, শচীদেবী, (গ) কেশব-ভারতী, (ঘ) সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, (ঙ) হরিদাস।

8.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) লোচনদাস—চৈতন্যমঙ্গল, (খ) বৃন্দাবনদাস—চৈতন্য ভাগবত, (গ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্য চরিতামৃত, (ঘ) নিত্যানন্দদাস—প্রেমবিলাস, (ঙ) হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল, (চ) পরমানন্দ সেন—চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

2. (ক) (1) সংস্কৃত, (খ) (3) আদি, মধ্য, অন্ত্য খণ্ডে, (গ) (2) চৈতন্য চরিতামৃত, (ঘ) (2) পাঁচালীর ঢঙে, (ঙ) (2) ষোড়শ শতাব্দী।

3. (ক) হর্ষচরিত, (খ) সন্ধ্যাকর নন্দী, (গ) অচিন্ত্য ভেদা-ভেদ, (ঘ) 32টি, (ঙ) নরহরি দাস, (চ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতম্ (মুরারি গুপ্তের কড়চা)

8.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) (2) চণ্ডীদাসের, (খ) (3) চৈতন্য পরবর্তীকালে, (গ) (2) বাৎসল্যরসের, (ঘ) (1) বাংলা ভাষায়।

2. (ক) জ্ঞানদাস, (খ) ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, (গ) 136টি, (ঘ) রূপ, ভাব, (ঙ) শ্রীজীব গোস্বামী।

3. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক।

8.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

একক 9 ❑ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি—ভারতচন্দ্র রায়—শাক্ত(পদাবলি—কবিগান

গঠন

9.1 উদ্দেশ্য
9.2 প্রস্তাবনা
9.3 মূলপাঠ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি
9.4 সারাংশ
9.5 অনুশীলনী 1
9.6 মূলপাঠ ভারতচন্দ্র রায়
9.7 সারাংশ
9.8 অনুশীলনী 2
9.9 মূলপাঠ শাক্ত(পদাবলি আখ্যান
9.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)
9.11 অনুশীলনী 3
9.12 উত্তর সংকেত
9.13 গ্রন্থপঞ্জি

9.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি সপ্তদশ শতাব্দীর—

- মুসলমান কবিদের বাংলা সাহিত্যে নানা অবদানের কথা জানতে পারবেন। বিশেষ করে, আরাকান রাজসভার কবিদ্বয়—দৌলত কাজী ও আলাওল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত-যুগোচিত শিল্পমার্জিত রচনাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে তাঁর কবি-কৃতির মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- শাক্ত(পদাবলির অনন্য স্রষ্টা রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত চত্র(বর্তীর পদ রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন। এর সঙ্গেই কলকাতা নগরের পত্তন ও অব(য়ী সংস্কৃতির পরিবেশ কবিওয়ালাদের সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

9.2 প্রস্তাবনা

সপ্তদশ শতাব্দীতে চাটিগ্রাম ও আরাকানের অধিবাসী সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান, হাজি মহম্মদ প্রমুখ লেখকগণ নানা বিষয়ে পুস্তিকা ও কাব্য লিখেছেন। তবে এ-যুগেই আরাকানের রাজসভার কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত সমগ্র বাঙালি জাতির কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন—উভয় কবির 'লোরচন্দ্রাণী' ও 'পদ্মাবতী' কাব্যের জন্য। সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যও সর্বজনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

রাজা কৃষ(চন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায় নিন্দা ও প্রশংসা—দুই-এর ভাগী। বহু রচনার মধ্যে তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিন্দি, ফারসি, সংস্কৃতে সমৃদ্ধ ভারতচন্দ্র শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যকে তিনি নাগররীতির বৈদগ্ধ্যে শিল্পমাধুর্যমণ্ডিত করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'রূপে চিহ্নি(ত। অব(য়ী যুগেও রাজসভাকবি হয়েও তাঁর সৃষ্টি সচেতনভাবে বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দিতে পেরেছেন। ভারতচন্দ্রকে আমরা আধুনিকতার অগ্রদূত বলতে পারি।

রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত চত্র(বর্তী দুজনেই সমাজের দুঃখ-বেদনা-আশা-আকাঙ(ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে শাক্ত(পদাবলি রচনা করেছেন। শক্তি(তত্ত্বের চেয়ে সমাজকেন্দ্রিক ভাবনাই শাক্ত(পদাবলিতে ল(্য করা যায়। শাক্ত(সংগীতের পাশাপাশি বাউলসংগীতের কথাও সং(েপে আছে। কলকাতা নগরের পত্তন। 'হঠাৎ গজিয়ে ওঠা' রাজ-রাজড়াদের অব(য়ী চিন্তা-চেতনার খোরাক হিসেবে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগানের মূল্যায়ন সং(িপ্তাকারে আছে। সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ধারাগুলি সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হবে এই এককে।

9.3 মূলপাঠ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহম্মদ সগির রচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম পর্যায়ে) -এর একক-(3)-এ আলোচনা করা হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে চৈতন্য প্রভাবে সমৃদ্ধ যুগেও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত(নানা ধরনের কাব্য-কবিতা প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—চরিত সাহিত্য, জঙ্গনামা, ধর্ম সাহিত্য ইত্যাদি। সুফিবাদের প্রভাব বাংলা ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যে দেখা যায়। তবে, সুফিদের সাহিত্যকে ইসলামি সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত(করা চলে না। আলোচ্য কাব্য-কবিতার লেখকরূপে সৈয়দ সুলতান, শেখ চাঁদ, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রমুখ লেখকগণ আছেন।

আরাকানের মুসলিম কবিদের রচনা, বাংলায় প্রচলিত অনুবাদ, মঙ্গলজীবনী ও পদাবলি সাহিত্যধারার পর এর নূতন সংযোজন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এখানে নূতনত্ব তো বটেই, মানবিক জীবনবোধ—জগৎ-জীবন চিন্তা, মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী, বস্তুত দেবতা ও দেবকল্প মানুষের আদর্শায়িত ধর্মাশ্রিত সাহিত্য থেকে ভিন্নতর স্বাদ নিয়ে এসেছে। এতদিনের কাব্যে মানুষের কথা মাঝে-মধ্যে এলেও তা ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত(হতে পারেনি। আরাকানের কবিরা ধর্মনিরপে(মানবিক মহিমাকে তাঁদের নূতন সৃষ্টির মধ্যে তুলে ধরেছেন। ফলে, ভক্তি(র বদলে প্রেম, দেবতার পরিবর্তে মানুষ—মানুষের কামনা-বাসনা, জীবনের শত-সহস্র অনুভব এই কাব্যগুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আরাকান-রোসাঙ্গ রাজসভার আনুকূল্যে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের সৃষ্টিসম্ভারই মূলত বর্তমান পাঠের আলোচ্য বিষয়। আরাকানের রাজারা বর্মী হলেও স্থানটি অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্নিহিত থাকায় এবং রাজসভার অমাত্যবর্গের মধ্যে বহু জ্ঞানী-গুণী বাঙালি—এই দুটি কারণে বাংলা ভাষার শুধু চর্চা নয়, বলতে গেলে এই অঞ্চলে দ্বিতীয় মাতৃভাষারূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীচে উভয় কবির পরিচিতি ও কবি-কৃতির আলোচনা করা হলো

1. **দৌলত কাজী** চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুলতানপুরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবির জন্ম। তিনি আরাকানের

বৌদ্ধ নরপতি থিরি-থু-ধম্মার (শ্রী সুধর্ম) রাজসভায় উপস্থিত হন। আরাকানরাজ তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য সমাদরে গ্রহণ করেন। সেখানে প্রভাবশালী রাজকর্মচারী সেনাপতি আশরফ খানের নজরে পড়েন এবং নানাদিক থেকে কবি তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পান। থিরি-থু-ধম্মার শাসনকাল 1621 খ্রিঃ—1638 খ্রিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের মধ্যে দৌলত কাজী 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়নার গান' রচনা শু(করেন। কবির অকালমৃত্যুতে কাব্যখানি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরে আলাওল শেষ করেন 1659 খ্রিস্টাব্দে।

কবি-প্রতিভা মিয়া সাধনের 'সতী মৈনাবত' হিন্দি ভাষায় রচিত(এই কাব্য অবলম্বনে দৌলত কাজী কাব্যখানি লেখেন। অনেকের ধারণা কবি মুল্লা দাউদের 'চন্দায়ন' কাব্যের দ্বারাও কবি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দৌলত কাজীর আখ্যানকাব্যখানি বাংলা ভাষায় পাঁচালীর রীতিতে রচিত বলেই এর গল্পরসের প্রতি বাঙালির এতো আকর্ষণ। দৌলত কাজী লোক-কাহিনীকে আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত(পূর্ণাঙ্গ আখ্যানরূপে তাঁর কাব্যে বিন্যস্ত করেন। যদিও তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাব্যখানি সমাপ্ত করার পূর্বেই মারা যান। তাঁর অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করেন সৈয়দ আলাওল।

কাব্য-কাহিনী গোহারীর রাজকুমারী চন্দ্রাণীর সঙ্গে এক নপুংসক বামনের বিয়ে হয়। মৃগয়াসূত্রে চিরদুঃখী চন্দ্রাণীর সঙ্গে রাজা লোর-এর সা(াৎ হয় ও প্রেম জন্মায়। গুপ্তপ্রেম শু(হয়। এর পরিণতিতে বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে বামন নিহত হন। লোর গোহারী দেশের রাজা হন। তিনি চন্দ্রাণীকে বিয়ে করে মহানন্দে মগ্ন হন। এদিকে লোর-এর স্ত্রী ময়না বিরহযন্ত্রণায় (ত-বি(ত হয়ে শিব-দুর্গার আরাধনা শু(করেন। ছাতন নামে এক লম্পট রাজকুমারের কু-প্রস্তাব ময়না ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কবির অকালমৃত্যুতে এখানেই কবি দৌলত কাজীর কাব্যের সমাপ্তি।

কবির মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পরে (1659) সৈয়দ আলাওল কাব্যখানি সমাপ্ত করেন। দৌলত কাজীর কাহিনীর সঙ্গে পার্শ্বকাহিনী যুক্ত(করে আখ্যানভাগকে রূপকথাধর্মী রূপ দিয়ে লোর-চন্দ্রাণীর পুত্রসহ ময়নার কাছে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা এবং দুই স্ত্রী নিয়ে লোরের সুখের জীবন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে আলাওল কাব্যের মিলনান্তক সমাপ্তিরেখা টেনেছেন।

দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়নামতী' কাব্যখানি হঠাৎ যেখানে শেষ হয়েছে— সেই অসমাপ্ত অংশটি কবি আলাওল দ(তার সঙ্গে শেষ করেছেন। এই অংশটিই কবির মৌলিক রচনা। 'সতী ময়না'র যে অংশটুকু তিনি সংযোজন করেছেন তা হ'লো— দৌলত কাজীর বিয়োগান্তক পরিণতির শেষে মিলনান্তক সংযোজন। তাঁর লেখায় দেখা যায়, বিরহযন্ত্রণায় কাতর ময়নাকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল কুট্টনী। কিন্তু তার প্রলোভনের ফাঁদে ধরা না দিয়ে 'সতী ময়না' তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। একাকীত্বের হাহাকার থেকে কবি 'সতী ময়না'র জীবনে কিছুটা স্বস্তি দিতে সৃষ্টি করেছেন এক সখীর চিত্রকে। এই সখীর নানা উপকথার মধ্য দিয়েই কবি ময়নার বিরহযন্ত্রণা লাঘব করতে চেয়েছেন। যে মিলনান্তক উপকথাটি সখী পরিবেশন করেছেন তার দ্বারাই উদ্বোধিত হয়ে 'সতী ময়না' এক ব্রাহ্মণকে দূত করে পাঠিয়েছিল স্বামীর কাছে। বহুকাল পরে স্বামী লোর-চন্দ্রাণীসহ ময়নামতীর কাছে ফিরে আসে। তারপর ভুল বোঝাবুঝির চির অবসান। দুই সতীনে স্বামীর সেবা-যত্নের মধ্য দিয়ে মহা আনন্দে বাকি দিনগুলি কাটায়। এইভাবে আলাওল দৌলত কাজীর বিয়োগান্তক কাব্যকে মিলনান্তক পরিণতি দান করেন।

আলাওল যে অংশটুকু কাব্যে সংযোজন করেছেন, তা কাব্যমূল্যের বিচারে অকিঞ্চিৎকর। কাব্যের বাঁধন-ছাঁদন তেমন নেই। অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক নানা কথার জাল বুনে তিনি কাব্যখানিকে ভারাক্র(ান্ত করেছেন।

দৌলতকাজীর কবিত্ব ও মেজাজের ধারা আলাওল সঠিক অনুসরণ করতে পারেননি। গতানুগতিক মিলনান্তিক পরিণতি টেনেছেন।

কবি-প্রতিভা বাংলা সাহিত্য দেব-দেবীর জগৎ ছেড়ে দৌলত কাজীর হাতেই রক্ত(মাংসে গড়া বাস্তব নর-নারীর কামনা-বাসনা, প্রেমাদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। মুসলমান কবির হাতে হিন্দুসমাজের আচার-আচরণ, ধর্মবি(্বাস, সতীত্বের আদর্শ বাস্তবরসে স্নাত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি উদার সুফি ধর্মাবলম্বী হয়েও তাঁর কাব্যে হিন্দু যোগ-সাধনার উল্লেখ করেছেন। কাহিনীর প্রথম অংশে অর্থাৎ লোর-চন্দ্রাণীর প্রণয় অংশে ফারসি কিস্সার ছাপ কিছুটা থাকলেও কবি তাঁর সৃষ্টিতে হিন্দু পুরাণ-দর্শনের প্রয়োগও সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। ময়নার বিরহ-বেদনার মধ্যে বৈষ(ব-পদাবলির ছায়াসম্পাত ল(্য করা যায়। আখ্যান বর্ণনায় ও বিচিত্র ভাবানুভূতি প্রকাশে কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র-চিত্রণেও কবির দ(তা দেখা যায়। সতী ময়নামতী, বীর লোরক ও ভাগ্যহতা চন্দ্রাণীর চরিত্র বাস্তবধর্মী হয়েছে।

নারী মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার হিসাবেই কবি চিহ্নি(ত। দৌলত কাজীর কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও কিছু দেখা যায়। এতে মনে হয়, কবি সংস্কৃত ভাষাও জানতেন। কবির বর্ণনারীতি যেমন প্রাঞ্জল তেমনি কাহিনী-গ্রন্থনেও গতিরাগের চিহ্(আছে।

2. **সৈয়দ আলাওল** আরাকান রাজসভার বিখ্যাত বিদগ্ধ কবি সৈয়দ আলাওল। হিন্দু-মুসলমান উভয় পাঠকের কাছে, বিশেষ করে হিন্দুসমাজে খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যটি। এ ছাড়া আরবি-ফারসি বহু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এবং দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করে তিনি তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন।

কবি-পরিচিতি 'সেকেন্দারনামা' ও 'সয়ফুলমুলুক বদি উজ্জমাল' গ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায়, কবি ফতেবাবাদের শাসকবর্গের অমাত্যপুত্র ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে কবির জন্ম এবং 1673 খ্রিস্টাব্দে কবি দেহত্যাগ করেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে জীবন-জীবিকার জন্য কবি মগরাজের সেনাবাহিনীতে চাকুরি নিতে বাধ্য হন। মগরাজ দরবারের অভিজাত মুসলমান অমাত্যগণ আলাওলের কবিত্ব, সংগীত প্রতিভা ইত্যাদির পরিচয় জেনে কাব্য-সাহিত্য চর্চার জন্য কবিকে উৎসাহিত করেন। আরাকানের মুসলমান শাসকবর্গের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি আরবি-ফারসি-হিন্দি বিভিন্ন কাব্যের অনুবাদের মধ্য দিয়ে স্বকীয় প্রতিভার দৃষ্টান্ত রাখেন। কিন্তু ভাবতেও কষ্ট হয়—এই স্রষ্টাকে বিনা অপরাধে বহুদিন আরাকানের রাজ-কারাগারে বন্দী থাকতে হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে মুক্তি(পেয়ে পুনরায় পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। যাঁরা কবিকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, বিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ মুসা এবং আরাকানের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মা-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাব্য-পরিচয় আলাওল ফারসি বা হিন্দি বই থেকে যে সমস্ত কাব্য অনুবাদ করেন, সেগুলি হ'লো— সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (1660), তোহ্ফা (1663-64) 'সয়ফুলমূলক-বদি উজ্জমাল' (1658-70), সেকেন্দারনামা (1672), পদ্মাবতী (আনুমানিক 1646 খ্রিস্টাব্দ)।

পদ্মাবতী বাদে অন্য সমস্ত উল্লিখিত গ্রন্থই মুসলমান সমাজে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর মূল কারণ—এই সব গ্রন্থ ইসলামি কাহিনী ও ধর্মতত্ত্বের নানা মূল গ্রন্থের অনুবাদ। সিংহলরাজকন্যা ও মেবারের রানী পদ্মাবতী বা পদ্মিনী অবলম্বনে রচিত কাহিনী হিন্দু সমাজে জনপ্রিয় 'পদ্মাবতী' কাব্য কবি আলাওল হিন্দি ভাষায় রচিত, অযোধ্যার সুফি মতাবলম্বী ভক্ত(কবি মালিক মুহম্মদ জারসীর 'পদুমাবৎ'

গ্রন্থের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস রোমান্সরস মিশিয়ে লিখেছেন। ইতিহাসের চেয়ে কল্পনার আধিক্য রয়েছে। এই কাব্যে ধর্মীয় ভাব-ভাবনা বা রূপকাশ্রয়ী কোনো কিছু নেই। ইতিহাসের উপাদান সামান্য থাকলেও একে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রোমান্টিক-ঐতিহাসিক' কাব্য বলে চিহ্নি(ত করেছেন। জায়সীর 'পদুমাবৎ' হিন্দি কাব্য অবলম্বনে রচিত হলেও কবি-প্রতিভার স্পর্শে 'পদ্মাবতী' মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারার নূতন দরজা খুলে দেন। পদ্মাবতীর কাহিনী, চরিত্র ও বর্ণনায় কবি আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা বৈষ(ব পদের অনুসরণে। এই গ্রন্থে 11টি আবেগ-উচ্ছ্বাসভরা গান আছে। পারিবারিক জীবনকথা ও বারমাসী বর্ণনার মধ্যে মঙ্গলকাব্য ধারার কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আলাওল বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন এই 'পদ্মাবতী' গ্রন্থের জন্যই। পয়ার-ত্রিপদীর নিখুঁত ছান্দসিক প্রকরণে ও বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশের প্রভাবে 'পদ্মাবতী' অনুবাদ গ্রন্থ হয়েও বিশেষত্বের দাবী রাখে।

দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের সৃষ্টি তেমন উচ্চাঙ্গের না হলেও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। তার কারণ — পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু কবিগণ যখন চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও বৈষ(বপদ রচনার মধ্য দিয়ে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে মগ্ন—ঠিক সেই সময় এই দুই মুসলমান কবি বাংলার জন-হাওয়া-মাটির সঙ্গে যুক্ত(সাধারণ নর-নারীর বিরহ-মিলনের কাহিনী অবলম্বনে রোমান্টিক আখ্যান লিখে বাংলা সাহিত্যের একমুখীন ধারাকে পাল্টে দিয়েছেন। বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক এই কাব্যখানি সেইজন্যই প্রশংসার দাবী রাখে। দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কবি-প্রতিভার তুলনাত্মক বিচারে বহু সমালোচকই দৌলত কাজীকেই শ্রেষ্ঠতর বলে চিহ্নি(ত করেছেন। তবে, দুই কবির মূল্যায়নে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—"বাংলায় হিন্দি ফারসী রোমান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ দরবারের দুজন সভাকবি, দৌলত কাজী ও আলাওল।"

9.4 সারাংশ

আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতাব্দীকে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল যে সৃষ্টিসম্ভার উপহার দিয়েছেন, তাতে দুই কবি সমগ্র সমাজের কবিরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে দৌলত কাজী 'লোরচন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়না'র কাব্যখানি লেখেন। তবে, গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বেই বিয়োগান্তক পরিণতিতে কাব্যখানির ছেদরেখা পড়ে কবির অকাল মৃত্যুর জন্য। হিন্দিভাষী মিয়া সাধনের গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় রচিত 'সতী ময়না'র কাহিনীর সঙ্গে প্রচলিত লোককাহিনীকে বিন্যস্ত করে আলোচ্য কাব্যটি রচনা করেন দৌলত কাজী।

নপুংসক চন্দ্রাণীর স্বামী বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ—যুদ্ধে বামন নিহত। লোর ও চন্দ্রাণীর বিবাহ—সুখে নব জীবনযাপন। স্বামী-বিচ্ছেদে লোরের প্রথমা পত্নী ময়নার বিরহযন্ত্রণা—এই পর্যন্ত কাহিনী দৌলত কাজীর গ্রন্থে আছে। কবির হাতে লোর-চন্দ্রাণী বা সতী ময়না বাস্তব জীবনরসে সমৃদ্ধ। কবির হাতে হিন্দু সমাজের প্রতিফলন, ধর্মবিশ্বাস, সতী রমণীর পবিত্র আদর্শ চিত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। চিত্রকল্প ও প্রসঙ্গ নির্বাচনেও কবি হিন্দু সমাজের পরিবেশ রচনায় সার্থক। তাঁর হাতে সতী ময়না, বীরনায়ক লোর ও বিবাহিতা ভাগ্যবঞ্চিতা চন্দ্রাণীর চরিত্র বাস্তবানুগ হয়েছে। সুফি ধর্মমতাবলম্বী কবির উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু যোগসাধনাও যুক্ত(হতে দেখা যায় এই কাব্যে। কবি যে সংস্কৃত ভাষা জানতেন তার নমুনা কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ভাষাও তিনি কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। কবির বর্ণনারীতি প্রাঞ্জল, যার ফলে কাব্যে গতি সৃষ্টি হয়েছে। নারী মনস্তত্ত্বের বাস্তবধর্মী প্রকাশ দেখা যায়।

দৌলত কাজীর পাশাপাশি সে-যুগের সর্বাধিক প্রচারিত মুসলমান কবি হলেন—'সৈয়দ আলাওল'। তিনি বহু আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। সেগুলি হলো—হপ্ত (সপ্ত) পয়কর, তোহ্ফা, সেকেন্দারনামা, সয়ফুলমূলক বদি-উজ্জামাল, পদ্মাবতী। তবে 'পদ্মাবতী' কাব্যের জন্য কবি হিন্দুসমাজের পরম আদৃত। কবির মৌলিক সৃষ্টি হলো—দৌলত কাজীর অসমাপ্ত 'সতী ময়না' কাব্যের শেষাংশ। আলাওলের সর্বোত্তম রচনা 'পদ্মাবতী'। জায়সীর কাব্য অবলম্বনে এটি রচিত হলেও কবি অনুকরণ করেননি। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় কবির অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় আছে। রোমান্টিক প্রণয়-কাব্য হিসাবে হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

স্বামী-বিচ্ছেদে আত্মহারা ময়নার কঠোর সাধনা, কুট্টনীর কু-প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান(সখীর পরামর্শে সৎ ব্রাহ্মণকে লোরকের কাছে প্রেরণ। লোরক-চন্দ্রাণীর পুত্রসহ প্রত্যাবর্তন। স্বামী ও দুই সতীনের সুখে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে কাব্যের সমাপ্তি। দৌলত কাজীর বিয়োগান্তক কাব্যকে আলাওল গতানুগতিক ধারায় মিলনান্তক করেছেন।

দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল দেব-দেবীর মাহাত্ম্যধর্মী বাংলা সাহিত্যের ধারাকে অস্বীকার করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজজীবন থেকে বাস্তবরস আহরণ করে—বাস্তবধর্মী জীবনরসস্নাত কাব্য বাংলা সাহিত্য-আঙিনায় নিয়ে আসেন। একঘেয়ে ধারাকে অস্বীকার করে বাস্তব জীবনছন্দকে বাংলা সাহিত্যে গ্রথিত করার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়।

9.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির একে একে উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 132 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্(দিয়ে নির্দিষ্ট ক(ন

	ঠিক	ভুল
(ক) দৌলত কাজী 'পদ্মাবতী' রচনা করেছেন।	☐	☐
(খ) আলাওল পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি।	☐	☐
(গ) আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্মার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন।	☐	☐
(ঘ) 'সতী ময়না'র কাহিনী বাস্তবধর্মী।	☐	☐
(ঙ) 'জায়সী'র 'পদুমাবৎ' কাব্য ফারসি ভাষায় রচিত।	☐	☐

2. শূন্যস্থানে উপযুক্ত(শব্দ বসান
   (ক) দৌলত কাজী ———————— আমলে 'সতী ময়না' কাব্য রচনা করেন।
   (খ) আলাওল 'সতী ময়না'র ———————— পরিণতি দান করেন।
   (গ) 'সেকেন্দারনামা'————————ভাষায় রচিত গ্রন্থের থেকে অনূদিত।
   (ঘ) চন্দ্রাণীর স্বামী————————ও ———————— ছিলেন।
3. নীচে কয়েকটি প্র(দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্(( ) দিন
   (ক) লোর যুদ্ধে পরাস্ত করে নিহত করে—
      1. গোহারী রাজাকে
      2. বামনকে
      3. আশরফকে

(খ) 'সতী ময়না' কাব্যটি—
1. মহাকাব্য
2. লিরিক
3. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য

(গ) সৈয়দ আলাওলের 'তোহ্‌ফা'—
1. হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদ
2. ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ
3. ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ

(ঘ) 'ময়না' চরিত্রটি—
1. দুর্বল
2. দোদুল্যমান
3. বলিষ্ঠ

(ঙ) চন্দ্রাণীর চরিত্রটি—
1. বাস্তবধর্মী
2. অলৌকিক
3. অবাস্তব

9.6 মূলপাঠ ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সমাজ-সংস্কৃতির জগতে তেমন কোনো স্মরণীয় কিছু নেই। এই সময় মৌলিক সাহিত্যও কিছু রচিত হয়নি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালির ইতিহাস, সমাজ ও পরিবার জীবনের পট পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোগল আমলের শেষের দিকে বাংলার মানুষ শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে, বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটেছে, বর্গীর হাঙ্গামা দেখা দিয়েছে, সমাজজীবনে অব(য়ী ভাবনার প্রাবল্য, লেখকগণও গড্ডলিকার স্রোতে ভাসমান—সেই যুগেই 'অমাবস্যার চাঁদ' রূপে আবির্ভূত হলেন ভারতচন্দ্র রায়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নূতন দিগন্তের নির্দেশ করেন। বলতে গেলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। তাঁকে আমরা প্রথম শ্রেণীর বিদগ্ধ কবিরূপে চিহ্নি(ত করতে পারি। নীচে কবির ব্যক্তি(-পরিচিতি ও তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন সং(েপে তুলে ধরা হ'লো।

কবি-পরিচিতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 1847 খ্রিস্টাব্দে কৃষ(নগর রাজবাড়িতে র(িত পুঁথি অবলম্বনে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি প্রকাশ করেন। এর কিছুকাল পরেই কবি ঈশ্বরের গুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও চরম নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।

কবির জন্ম সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে, কিন্তু ধনীর সন্তান হয়েও তাঁকে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত হতে হয়েছে। হাওড়া হুগলি জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতা বিখ্যাত জমিদার নরেন্দ্র রায়। তিনি বর্ধমানরাজের দ্বারা সর্বস্বান্ত হলে কবিকে বাল্যবয়সেই বাধ্য হয়ে মাতুলালয়ে চলে যেতে হয়। সেখানে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই কবি সংস্কৃত ভাষায় দ(তা অর্জন করেন। পরে ফারসি ভাষাতেও তাঁর বিশেষ অধিকার জন্মে। নিজ পছন্দমতো বিয়ে করার জন্য পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হন। জীবন-জীবিকার প্র(ে কবি হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে কিছুদিন থাকেন এবং ফারসি ভাষা শি(ায় মনসংযোগ করেন। তাঁকে এরই মধ্যে কিছুদিন বর্ধমানরাজের কারাগারেও বন্দী জীবনযাপন করতে হয়। কারাগার থেকে পালিয়ে বৈষ(ববেশে পুরীতে শঙ্করাচার্যের মঠে থেকে এক কীর্তনদলের সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ান। পথিমধ্যে শালিপতির সঙ্গে দেখা—তিনি জোর করে কবিকে

গৃহে ফিরিয়ে আনেন। কবি সস্ত্রীক চন্দননগরে ফারসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে বসবাস করেন। দেওয়ানজীর চেষ্টায় এবং কবির নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভায় মহারাজা কৃষ(চন্দ্র রায়ের রাজসভায় চাকরি লাভ করেন। মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা। ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি(তে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং 'চণ্ডীমঙ্গলে'র আদর্শে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার জন্য প্রেরণা জোগান। মাত্র 48 বৎসর বয়সে কবি দেহর(া করেন। 1760 খ্রিস্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। "ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে"—কাব্য পঙ্‌ক্তি(টি যথার্থ।

কাব্য-পরিচয় আনুমানিক 1712 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1760 খ্রিস্টাব্দ—এই 48 বছর কালের মধ্যেই শত ঝড়-ঝঞ্ঝার পাথার পেরিয়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রতিকূল পরিবেশ-পটভূমিকাতেও কবি তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। নিন্দা-প্রশংসা দুইয়েরই অধিকারী কবি। প্রথম জীবনে সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও ব্রতকথাজাতীয় লেখার মধ্য দিয়ে কবির আত্মপ্রকাশ। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা ও রতিমঞ্জরীর আদর্শে তিনি 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এ-সব সৃষ্টির সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই। ভারতচন্দ্রের খ্যাতির ভিত্তিমূলে রয়েছে তাঁর রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি। এ ছাড়া 'বসন্ত বর্ণনা', 'বর্ষামঙ্গল' ও 'কৃষে(র উক্তি(' ইত্যাদি কিছু (ুদ্র কবিতাও রচনা করেন। 'রায় গুণাকর' উপাধি কবিকে দেন মহারাজা কৃষ(চন্দ্র রায়।

অন্নদামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যটি রচনা করে কবি মহারাজা কৃষ(চন্দ্রের কাছ থেকে 'রায় গুণাকর' উপাধি পান। এই কাব্যের প্রধান গুণ এই যে, পরস্পর গভীর সম্পর্কান্বিত তিনখানি কাব্য এর সঙ্গে সংহতরূপে সংযুক্ত(। কাব্য তিনখানি হ'লো—(1) 'অন্নদামঙ্গল', (2) 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' ও (3) 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' বা 'মানসিংহ'।

প্রথম খণ্ড—'অন্নদামঙ্গল' চিরাচরিত মঙ্গলকাব্যের রীতিতে কাব্যোৎপত্তির কারণ, আত্মচরিত, সমকালীন দেশের ঐতিহাসিক-সামাজিক বর্ণনা ও রাজা কৃষ(চন্দ্র রায়ের সভার চিত্র—এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এই খণ্ডের আখ্যানটি পূর্ব প্রচলিত 'কালিকামঙ্গল' অনুসৃত। নিমতার কবি কৃষ(রাম দাসের 'কালিকামঙ্গলে'র আদর্শ কবি গ্রহণ করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যা ও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, নানা বিপত্তি, শেষে কালিকার প্রসাদে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ—বহুল প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনেই এই খণ্ড রচিত। কাব্যের আরম্ভে ভবানন্দ মজুমদার ও মানসিংহের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমি রচনার চেষ্টা থাকলেও মূল কাহিনী-অংশের সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের যোগ নেই।

তৃতীয় খণ্ড ভারতচন্দ্র বাংলাদেশে মোগল অভিযানের পটভূমিতে ভবানন্দের প্রতি দেবীর কৃপা এবং ভবানন্দের 'রাজা' উপাধিলাভের বর্ণনা করেছেন। এই খণ্ডটিকে আমরা অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য প্রচার কাব্যরূপে চিহ্নি(ত করতে পারি।

মূল্যায়ন মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারা ও সংস্কার পরিত্যাগ করে, (ুদ্র (ুদ্র কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে কবি দেব-দেবী বা শাপভ্রষ্ট নর-নারীর জগৎ ছেড়ে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ জীবনের চিত্র এঁকেছেন। হিন্দি-ফারসি মিশ্রিত কবিতাগুলির স্বাদ-বৈচিত্র্যই ল(ণীয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার পূর্ণ মুক্তি(ঘটেছে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেই। এই কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হলো এই যে, পূর্ণ পৌরাণিক ছাঁদের কাব্য হয়েও, বাংলাদেশের সমকালীন সমাজ ও মানুষের চিত্র সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'দেবখণ্ডের' বর্ণনায় মুকুন্দরামের প্রভাব ল(ণীয়। পুরাণ থেকে নানা প্রসঙ্গ সংকলিত হলেও কাশীধামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় নূতনত্ব

আছে। এই অংশটি কবি 'কাশীখণ্ড' নামক একটি উপপুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রথম খণ্ডের হরিহোড়ের কাহিনী সংি(প্ত। ভবানন্দ চরিত্রটি ঐতিহাসিক।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের সংযোগ ীণ নয়। বিদ্যাসুন্দরের প্রাণয়-কাহিনী মানসিংহের কাহিনীর সঙ্গে ীণসূত্রে গ্রথিত। দ(যজ্ঞ নাশ, উমা-মহেশ বিবাহের উৎসে পুরাণ ও মহাকবি কালিদাসের প্রভাব থাকলেও বিষয় দুটি নির্বাচনে মুকুন্দর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। মুকুন্দর কালকেতুর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে হরিহোড়ের দারিদ্র্যের চিত্রের মধ্যে। ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর কলহ মুকুন্দরামের ধনপতি উপাখ্যানের লহনা-খুল্লনার কলহের দ্বারা প্রভাবিত। এই সব নানা প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র যে প্রতিভাধর কবি ছিলেন—তা সর্বজনস্বীকৃত।

যুগসন্ধি পর্বের কবি ভারতচন্দ্র স্পষ্টভাবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বাহ্যিক আঙ্গিককে অবলম্বন করে নূতন কাব্যরীতির আভাস দিয়েছেন। কবির সৃষ্টি প্রসাদগুণসম্পন্ন ও রসপূর্ণ হয়েছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত সংসার জীবনের নানা নীচতা, ইন্দ্রিয়বিলাস, ভোগপিপাসা, বাঙালির গৃহবধূর কৌতুহল, হিংসা-দ্বেষ, দুই সতীনের কোন্দল, হীরা-মালিনীর বেসাতির হিসেব-নিকেশ ইত্যাদিতে কবি স্নিগ্ধ-রসোজ্জ্বল জীবনদর্শনের প্রতি আলোক সম্পাত ঘটাতে পেরেছেন। আদর্শ ক(চ্যুত আকর্ষণীয় চরিত্র হলো হীরা-মালিনী। কবির ভাষায়—

"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।।"

আলঙ্কারিক চাতুর্যপূর্ণ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র অনন্য। প্রমথ চৌধুরী বি(খ্যাত হাস্যরস শিল্পী 'Cervantes'-এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের মিল খুঁজে পেয়ে লিখেছেন—"এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি।" স্নিগ্ধোজ্জ্বল জীবনের পূজারী ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অবচেতচিত সেই সদা দুখী।।"

ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসকে জয় করতে পারেননি বলেই তীব্র-তী(ব্যঙ্গের তীর তিনি নি(প করেছেন। দুঃখদীর্ণ জীবনচিত্র আঁকতে কবিচিত্তের অবাধ উল্লাস ল(্য করা যায়। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে হাসির ঢেউ-এ ঢেউ-এ সমাজভিতকে আঘাত করেছেন।

চরিত্র চিত্রণে কবির স্বকীয়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতচন্দ্রের হাতে দেব-দেবী স্বর্গের মহিমা ত্যাগ করে বাংলাদেশের অতি চেনা চরিত্র হয়েছেন। তাই দেবতারা শ্রদ্ধা-ভক্তি(-ভয়ের পাত্র না হয়ে—আমাদেরই একজনা হয়েছেন। মহাদেব, অন্নপূর্ণা, ব্যাসদেব ইত্যাদি চরিত্র পৌরাণিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে কবির রঙ্গ-রসিকতার ধারায় স্নাত হয়ে আমাদের জীবনসাথী হয়েছেন। এক কথায় কবির হাতে দেবতা দেবত্ব হারিয়ে মানব-মানবী হয়েছেন। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের হীরা-মালিনী ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র তেমন সার্থক হয়নি। 'মানসিংহ' বা 'অন্নদামঙ্গল' খণ্ডের অতিরঞ্জন ও ইতিহাস বিকৃতিকে গু(ত্ব না দিয়ে এই খণ্ডের অপ্রধান চরিত্রগুলি সার্থক হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষা অতুলনীয়। ড. (ে ত্র গুপ্তের ভাষায়—"ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাষাশিল্পের তাজমহল। ছন্দনির্মাণ, শব্দচয়ন ও বয়নে, চিত্র ও সংগীতরস সৃজনে, অলঙ্করণের পারিপাট্যে তিনি বাংলা কাব্যের অতি সচেতন কবিদের মধ্যে অন্যতম।" কবি তাঁর 'যাবনী মিশাল' ভাষায় রূপদ(শিল্পীর মতো মনের ভাবকে ব্যক্ত(করেছেন। হিন্দি, ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষায় কবির ছিল বিশেষ দখল। কবির ভাষা দ(তার নিদর্শন—

"মহা(দ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভবম্বম্ ভবম্বম্ শিঙা ঘোর বাজে।।
লটাপট্ জটাজুট্ যংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ কলক্কল্ টলট্টল্ তরঙ্গা।।"

গীতিরসের মূর্ছনার নিদর্শন—

"কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে।।
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।"

সচেতন মননঋদ্ধ কবি ভাষা প্রয়োগে পাণ্ডিত্য দেখাননি। সকলের উপযুক্ত(ভাষায় কাব্য লিখেছেন।

কবির লেখায় রাজ সভাকবির মণ্ডনকলা অ(ুণ্ণ আছে। যার ফলে 'বিদ্যাসুন্দরে'র মতো কাহিনীও নাগররীতির বৈদগ্ধ্যে শিল্পসম্মত হয়েছে। গ্রামীণ ও আবেগবহুল ভাষাকে কবি নাগরিক ও মননপ্রধান করে তুলেছেন। ফারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে তিনি বহু শব্দকে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার প্রকাশ(মতা বাড়িয়েছেন। ভারতচন্দ্র রচিত বহু প্রবাদ আজও চমৎকারিত্ব ও বুদ্ধির প্রাখর্যে দেদীপ্যমান।

উদাহরণ—

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'
'বড়োর পীরিতি বালির বাঁধ।'
'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।'
'বাঘের বিত্র(ম সম মাঘের হিমানী'—ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য অ(ীলতার দায়ে যেমন অভিযুক্ত(—তেমনি কবি ঈ(্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই শব্দব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধকাম কবির ভাষা সংযোজনার সার্থকতাকে অকপটে স্বীকার করে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বি(্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "রাজ সভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কা(কার্য।"

শুচিবায়ুগ্রস্ত না হয়ে নিরপে(-নিরাসক্ত(দৃষ্টি দিয়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যকে যদি রসবোধ ও সৌন্দর্যদৃষ্টি দিয়ে বিচার করা যায় তাহলেই ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। কবির 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে আমরা 'নতুনমঙ্গল' কাব্যরূপেই চিহ্নি(ত করব। সরসতা, কৌতুকপ্রিয়তা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ইত্যাদি গুণের জন্যই ভারতচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন।

9.7 সারাংশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতির সংকট মুহূর্তে হাওড়া-হুগলি জেলার ভুরশুট পরগনার পেড়ো গ্রামে বর্ধিষ্ণু(জমিদার বংশের সন্তান শৈশব লগ্নেই ঘরছাড়া হয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। প্রতিকূল অবস্থা, কারাবাস, অন্তর্ধান আবার গৃহী হয়ে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় দ(কবি—মহারাজা কৃষ(চন্দ্র রায়ের সভাকবিরূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অমর কীর্তি 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। তবে এর পূর্বেই সত্যনারায়ণের পাঁচালী, রসমঞ্জরী

ও ছোট ছোট কবিতা তিনি রচনা করেন। কবির প্রতিভা বৈশিষ্ট্যের চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'অন্নদা-মঙ্গ ল' কাব্যে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার বাহ্যিক কাঠামোর মধ্যে তিনি বাস্তব জীবনরসস্নাত 'নতুন- মঙ্গ ল' কাব্য রচনা করেছেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ড 'অন্নদামঙ্গল', দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' আর তৃতীয় খণ্ড হ'লো 'মানসিংহ'। প্রথম খণ্ডের শু(তে 'মঙ্গলকাব্যে'র রীতি অনুযায়ী কাব্যোৎপত্তির কারণ, আত্মচরিত ইত্যাদি থাকলেও কাব্যের গভীরে ধীরে ধীরে সুখ-দুঃখ বেদনামথিত বাস্তব জীবনই চিত্রিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের সঙ্গে তৃতীয় খণ্ডের কাহিনী ীণ সূত্রে গ্রথিত নয়—যতটা দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে দেখা যায়।

নূতন কাব্যরীতির আভাস ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেখা যায়। কবির কাব্যখানি প্রসাদগুণসম্পন্ন রসপূর্ণ। কবি জীবনকে হাস্যোরসোজ্জ্বল করে এঁকেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তী্ হলেও তা হৃদয়রসে জারিত। এর উৎস কবির হৃদিগভীরে। তাঁর কাব্য ভাষাসম্পদে পরিপূর্ণ। হিন্দি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে তিনি বহু শব্দ বাংলা ভাষা শব্দভাণ্ডারে অনায়াসে সংযোজন করেছেন। গ্রামীণ কথ্যভাষাও তাঁর লেখনী স্পর্শে গৌরবের স্থান দখল করেছে। তাঁর কাব্যে অলঙ্করণ মণ্ডলকলার যথাযথ প্রয়োগও দেখা যায়। কবির বহু বাণী প্রবাদবাক্যের মহিমালাভ করেছে। চরিত্র চিত্রণে, ভাষা ও অলঙ্কার প্রয়োগে, সরসতা, কৌতুকপ্রিয়তা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যগুণে ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি আকর্ষণীয় হয়েছে। রাজসভার মনোরঞ্জন করেও কবি যুগের অব(য়কে গভীরভাব উপলব্ধি করে তাঁর কাব্যকে অনুভূতির জগৎ থেকে সচেতনভাবে বুদ্ধির প্রাখর্যে সুশোভন করেছেন। কবির বাক্-বিভূতি, ছান্দসিক ও আলঙ্কারিক প্রকরণ অনবদ্য। এইজন্যই ঈ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ—সবাই তাঁর কাব্যের ভাষা-শিল্পের প্রশংসার পঞ্চমুখ।

9.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্র্গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 133 পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকটি প্র্ দেওয়া হলো। ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে সঠিক উত্তর বেছে টিক চিহ্(( ) দিন

(ক) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য—
1. তিন খণ্ডে বিন্যস্ত
2. দুই খণ্ডে বিন্যস্ত
3. চার খণ্ডে বিন্যস্ত

(খ) ভারতচন্দ্র দ(ছিলেন—
1. ইংরেজি ভাষায়
2. হিন্দি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায়
3. প্রাকৃত, গ্রিক ভাষায়

(গ) ভারতচন্দ্র রাজসভা কবি ছিলেন—
1. ভবানন্দের
2. বর্ধমান মহারাজার
3. কৃষ(চন্দ্র রায়ের

(ঘ) 'রসমঞ্জরী' কাব্যখানি—
1. মহাকাব্য
2. গীতিকাব্য
3. অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থ

(ঙ) ভারতচন্দ্রের মৃত্যু—

1. 50 বছর বয়সে
2. 48 বছর বয়সে
3. 60 বছর বয়সে

2. শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত(শব্দ বসিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ ক(ন

(ক) ভারতচন্দ্র_____পরগনার_____গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) ভারতচন্দ্র দেওয়ান_____ চৌধুরীর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন।

(গ) বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী_____এর আদর্শে রচিত।

(ঘ) "কথায় হীরার ধার_____তার নাম।"

(ঙ) ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'_____প্রকাশ করেন।

3. নীচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্(দিয়ে নির্দিষ্ট ক(ন

	ঠিক	ভুল
(ক) ভারতচন্দ্র আধুনিক যুগের কবি।	☐	☐
(খ) ভারতচন্দ্র 'রায় গুণাকর' উপাধি পান।	☐	☐
(গ) ভারতচন্দ্র যথার্থ ভাষাশিল্পী ছিলেন।	☐	☐
(ঘ) 'অন্নদামঙ্গলে'র তৃতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর'।	☐	☐
(ঙ) কৃষ(নগরের মহারাজা ভারতচন্দ্রকে বন্দী করেন।	☐	☐
(চ) দেবখণ্ডের বর্ণনায় মুকুন্দরামের প্রভাব আছে।	☐	☐

9.9 মূলপাঠ শাক্ত(পদাবলি আখ্যান

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যালোচনায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র পাশাপাশি কাব্যরস বৈচিত্র্যে শাক্ত(পদাবলি উল্লেখযোগ্য। বৈষ(ব পদাবলির জগৎ চারশ' বছরের ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ কিন্তু শাক্ত(পদাবলির উৎপত্তিও মধ্যযুগের শেষ পাদে—সীমা মাত্র একশ' বছর। শাক্ত(পদাবলি ও বাউল সংগীতের উদ্ভব লগ্নের সামাজিক পটভূমি বি(-ষণ করলে দেখা যায়—চরম অব্যবস্থা-অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ বাংলার মানুষ বরাভয়দাত্রী মা কালিকার আশ্রয় অনুসন্ধানী হয়। বর্গির হাঙ্গামা, রাজ-কর্মচারীদের শোষণ-শাসন সর্বস্তরে ভীতিসঞ্চার করেছিল। এ-সবের হাত থেকে র(া পাবার জন্য 'পরম ক(ণাময়ী', 'কালভয়হারিণী' দেবী কালিকার প্রতি ভক্ত(সন্তানদের অভিযোগ, আবদার, আর্তি ও মুক্তি(প্রার্থনা ইত্যাদি শাক্ত(পদাবলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে শাক্ত(পদ ও পদকর্তাদের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তন্ত্রের ত্রি(য়াদি ও তার গৌপনীয়তা ও রহস্যের মধ্যে যে অনুভূতির ব্যাপারটি ছিল রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত শাক্ত(সংগীতের মধ্য দিয়ে তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তন্ত্রের তত্ত্ব-রহস্যকে নানা রূপকের মোড়কে মুড়ে অলঙ্করণ সজ্জায় ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। যে-সব গানে কবি-চিত্তের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিই সংগীত বা সার্থক পদ হয়েছে। আর যে-সব পদে তত্ত্বকথা, গূঢ় সাধনার কথা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি সঠিক পদ হয়ে ওঠেনি। জমিদার, দেওয়ান থেকে সাধারণ স্তরের মানুষও শাক্ত(পদ রচনা করেছেন। তবে এই সাহিত্য ধারার স্মরণীয় কবিদ্বয়—রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, সুফিধর্মের প্রচার, চৈতন্যদেবের সর্বজনীন লোকধর্ম—সমাজজীবনে ধর্ম সমন্বয়ের

যে ধারার সৃষ্টি করেছিল তার পথ ধরেই বাউল সংগীতের সৃষ্টি। এর উদ্ভবকাল অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"আনুমানিক 1625 খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করিয়া 1675 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউলধর্ম এক পূর্ণ রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।" বাউলেরা 'মনের মানুষে'র অনুসন্ধানী। সংকীর্ণ আচার-বিচার, প্রথা-প্রকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এঁরা। বাউল সঙ্গীত জগতের মধ্যমণি হলেন লালন ফকির। নিম্নে শাক্ত পদাবলির স্মরণীয় কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত এবং বাউল সংগীতের মধ্যমণি লালন ফকির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'লো

শাক্ত পদাবলি শাক্ত পদাবলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি **রামপ্রসাদ সেন**। 'কবিরঞ্জন' উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন। রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। কবির পিতার নাম রামরাম। উত্তর 24-পরগনার হালিশহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে ছিল কবির বাসস্থান। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে তিনি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। কিছু কৃষ্ণকীর্তনও তিনি লিখেছেন। তবে কবির খ্যাতি মূলত শ্যামাসংগীতের স্রষ্টারূপে। তাঁর এই সংগীত সাধক কবির ভক্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত। ঐকান্তিক ভক্তি ও ভালবাসার মিশ্রণে কবির শ্যামাসংগীতগুলিতে আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে সুমধুর সম্পর্কের সেতুবন্ধন ঘটেছে। ভাবসমৃদ্ধ সরল বাচনভঙ্গি রামপ্রসাদের গানগুলিকে হৃদয়স্পর্শী করেছে। শাক্ত পদাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর পদগুলি আত্যন্তিক সুরে রঞ্জিত হয়েছে। কবির কাব্য-পরিচিতি ও কবি-কৃতির পরিচয় নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'লো

বিদ্যাসুন্দর অনেকের ধারণা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মনোরঞ্জনের জন্য রামপ্রসাদ 'কালিকামঙ্গলে'র মোড়কে আদি রসাত্মক বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কবিকে, 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' বিদ্যাসুন্দরের অনুসরণে রামপ্রসাদ কাব্যখানি রচনা করেন। চরিত্র পরিকল্পনায় কবির কিছুটা কৃতিত্ব থাকলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যের জনপ্রিয়তায় এই কাব্যখানি প্রায় হারিয়ে গেছে।

কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন কবির দুই ক্ষুদ্র কাব্য হলো কালীকীর্তন কৃষ্ণকীর্তন। কালীকীর্তনে কবি বৈষ্ণব পদাবলির ঢঙে উমার বাল্য ও গোষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যে কবি-প্রতিভার বিকাশ মোটেই হয়নি। কৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কেও একই বক্তব্য। কবির কবিত্বের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির মূলে রয়েছে শাক্তসংগীত।

শাক্ত পদাবলী বর্তমানে রামপ্রসাদের প্রায় তিনশত পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। পদাবলির বিভিন্ন স্তরের পদগুলিকে আমরা কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করতে পারি—

1. উমা-বিষয়ক, 2. সাধন-বিষয়ক, 3. কালিকার স্বরূপ-বিষয়ক, 4. শাক্ত তত্ত্ব দর্শন ও নীতি বিষয়ক।

কৌলীন্যপ্রথা, গৌরীদান প্রথা, সতীদাহ প্রথা—এককথায় যুগটি ছিল 'নারীমেধ' যুগ। এর পাশাপাশি সমাজে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, সত্যভ্রষ্টতা, শাসকবর্গের অত্যাচার—সব মিলিয়ে সমাজজীবনের পীড়ন-লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তির প্রার্থনা করে কবি অন্ধকারবিনাশী মহাশক্তির উদ্বোধনসংগীত রচনা করেন।

মাতৃজাতির বেদনার ছবিটি 'আগমনী' ও 'বিজয়া' অংশে কবি 'হিমালয়-মা মেনকা-উমা' এবং 'শিব-উমা-গঙ্গা'র সংসারজীবনের চিত্র যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনের সজীব চিত্র ফুটে উঠেছে। বাৎসল্য রসের ধারায় এই পর্যায়ের পদগুলি মধুর ও করুণ রসে স্নাত। তবে কবির এই পর্যায়ের পদসংখ্যা অল্প এবং গুণগত উৎকর্ষও প্রথম শ্রেণীর নয়।

'ভক্তে(র আকূতি' পর্যায়ের পদগুলির মধ্য দিয়ে কবি সমাজের দুঃখদীর্ণ জীবনের আর্তিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'মা আমায় ঘুরাবি কত' কিংবা এখন সন্ধ্যেবেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল' ইত্যাদি চরণে হৃদয়ের আর্তি ও ভক্ত(কবির ঐকান্তিক আকূতি প্রকাশ পেয়েছে।

সাধনরীতি-সংক্র(ান্ত কবিতাগুলির শিল্পরূপ তেমন নাই। তবে তত্ত্বভাবনা ও ভক্তি(সাধনার বিষয় রূপকের মধ্য দিয়ে কবি যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে তৎকালীন সমাজচিত্র জীবন্তভাবে প্রকাশ পেলেও কাব্য কৃতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত শ্যামারূপ চিত্রণে কবির মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিত্ব শক্তি(ও সাধন-ঐ(র্যের নিবিড় প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভক্তি(রস সৃজন করেছেন কবি। উদাহরণ—

"ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।।"

সংসার জ্বালায় জর্জরিত কবিকণ্ঠে বেদনমথিত বাণী উচ্চারিত হয়েছে—

"আমি কি দুখেরে ডরাই।
তবে দাও মা দুঃখ আর কত চাই।।
আগে-পাছে দুখ চলে মা যদি কোনখানেতে যাই
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।।"

রামপ্রসাদের প্রকাশরীতি সহজ-সরল-হৃদয়স্পর্শী। ভাবসমৃদ্ধ সরল বাচনভঙ্গীই রামপ্রসাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন—

"মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।।"

শ্যামার সঙ্গে ভক্ত(কবির মা-ছেলের সম্পর্ক। মান-অভিমান কটুকথার মধ্য দিয়ে তাঁর কোনো কোনো পদ আমাদের একান্ত সামগ্রী হয়ে উঠেছে। ঘুড়ি, কলুর বলদ, কলুর ঘানি ও চাষাবাদ ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত(জিনিসগুলি রূপকের মধ্যে এনে ভক্তি(রস সৃষ্টি করেছেন। গ্রাম-বাংলার কথ্যরীতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ডিক্রি(, ডিসমিস, আসামি ও নিলাম ইত্যাদি ইংরেজি ফারসি শব্দের সংযোজন করেছেন। রামপ্রসাদের বহু পদ প্রবাদ বাক্যের মতো দেশবাসীর কণ্ঠে আজও ধ্বনিত হয়। দৃষ্টান্ত—

"রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধুমত্ত হলি বিষয় রসে।।"

কিংবা—

"মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা— যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।"

শাক্ত(তত্ত্ব সাধনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মিশিয়ে সহজ-সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় রচিত রামপ্রসাদের গানগুলি আজও আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধভাবে তন্ময় করে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"তাঁর (রামপ্রসাদের) গানগুলি উদার আকাশের মতো বিশাল, সরল সুরের হাওয়ায় মনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, বি(োভ-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। বাঙালির হৃদয়ে তাঁর আসন চিরদিন অটুট থাকবে।"

কমলাকান্ত চক্র(বর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি হলেন কমলাকান্ত চক্র(বর্তী। তিনি বর্ধমান জেলার

কালনা মহকুমার অম্বিকা-নগরবাসী ছিলেন। কবি নিজে ছিলেন ভক্ত(সাধক। রামপ্রসাদের কবিতার প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হলেও তাঁর পদগুলিতে গভীর আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর অলৌকিক জীবনকথা রামপ্রসাদের মতোই সমাজজীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাল্যকালে টোলে পড়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শি(ালাভ করেন। মাতুলালয়ে চলে আসার পর তাঁর চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের রাজা তাঁকে সভা-পণ্ডিত করেন। তাঁর জীবনের সন-তারিখাদি সঠিক পাওয়া না গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে মাত্র 50 বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্ত প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্র-সাধনার গ্রন্থ রচনা করেন। এতে কবির সামান্য আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি তন্ত্র-সাধনামূলক হলেও তত্ত্বের আড়ালে-আবডালে কবির কবিত্বশক্তি(র পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানীয় মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধন-ভজন করতেন, টোল খুলে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা পড়াতেন এবং সময়-সুযোগে শ্যামাসংগীত রচনা করতেন। বস্তুত শ্যামাসংগীত রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্ত স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কবি-প্রতিভা কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশ পদ আছে। শাক্ত(পদাবলির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে 'আগমনী ও বিজয়া' অংশের গানগুলিই কবিকে অমর করে রেখেছে। এ অংশে কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনাদগ্ধ মা-মেনকার হৃদ্‌বেদনা কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বিজয়া' অংশে আসন্ন বিচ্ছেদ আশঙ্কাকুল মাতৃহৃদয় কবি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। দৃষ্টান্ত—

"ফিরে চাওগো উমা তোমার বিধুমুখো হেরি,
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাওগো।"

স্নেহবিহ্বল বাঙালি মাতৃ হৃদয়ের ছবি মানবিক মাধুর্যে ফুটে উঠেছে। রামপ্রসাদের প্রভাবে প্রভাবিত কবিতার নমুনা—

"কালী সব ঘুচালী লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন রাখবি কিনা রাখবি সেটা।।"

কমলাকান্তের সংগীতের ভাষা ও বিন্যাসরীতি পরিচ্ছন্ন—সংহত। জগজ্জননীর স্বরূপ এবং কবির অনুভূতি সঞ্জাত গানগুলিও অনবদ্য। যেমন—

"শুকনো ত(মুঞ্জরে ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।
ত(পবনতলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকলে গাছে।।"
"তাই শ্যামারূপ ভালবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী।।"

আবেগ, কল্পনা-রচনারীতির সঙ্গে ভক্তি(রসধারা একাকার হয়ে কমলাকান্তের বহু সংগীত কাব্যগুণে উন্নত হয়েছে।

শাক্ত(পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়—রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ছাড়াও কৃষ(চন্দ্র, রামদুলাল, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, দাশরথি রায় কিছু কিছু শাক্ত(পদ লিখেছেন।—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কাব্যধারার রেশ দেখা যায়। মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিশেষ করে কাজী নজ(ল ইসলামের শ্যামাসংগীতগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বাউল গান সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ 'বাউল'। বাউল সম্প্রদায় ভাবমগ্ন মানুষ। তাঁরা গু(বাদী। বাউল গানে জাতিগত ভেদাভেদশূন্য অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ঝরণাধারা দেখা যায়। বাউল গানের জগতে

উজ্জ্বল ন(ত্র হলেন—**লালন ফকির**। 1891 খ্রিস্টাব্দে 116 বছর বয়সে তিনি দেহর(া করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতের পরম মুগ্ধ ভক্ত(। তিনিই প্রথম লালনের সংগীত প্রকাশ করেন। এখনও বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া অঞ্চল জুড়ে তাঁর বহু হিন্দু-মুসলমান ভক্ত(আছেন। হিন্দুর সন্তান বসন্ত রোগে আত্র(ান্ত হওয়ায় সঙ্গীদল দ্বারা পরিত্যক্ত(হন। সিরাজ তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে এসে সুস্থ করেন এবং বাউলধর্মে দী(া দেন। তাঁর স্ত্রী—মুসলমান ঘরে স্বামী ছিলেন বলে তাকে পরিত্যাগ করেন। সংসারমুক্ত(লালন বাউল সংগীতের কর্ণধার হয়ে গ্রামে গ্রামে সংগীত গেয়ে বেড়ান। গু(র মৃত্যুর পর তাঁর কন্যাকে বিয়ে করে একই সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম ও সাধনকর্ম করতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লালনের 20টি গান প্রকাশ করেন। বর্তমানে তাঁর 201টি সংগীত গবেষক, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর আরও সংগীতের অনুসন্ধান চলছে।

তত্ত্বকে প্রাধান্য না দিয়ে লালন তাঁর গানে মানবিক আবেদনকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবিত্ব ও ধর্মভাবের সমন্বয়ে তাঁর গানগুলি অপরিসীম সাহিত্যমূল্যের অধিকারী। মানুষের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও ভালবাসায় তাঁর গানগুলি আকর্ষণীয় হয়েছে। যেমন—

"মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।"

জাত-পাতের সংকীর্ণ ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে কবির গানে কাব্যিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে—

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।।"

লালনের—'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।'

"সামাল সামাল তরী, ভব-নদীর তুফান ভারী।।"

ইত্যাদি গানগুলি যেমন ভাবতন্ময়তার স্বর্ণ-ফসল, তেমনি কবিত্বশক্তি(র দ্যোতক। লালন রূপক প্রয়োগে সার্থক। তাঁর গানে মাটির ভাষার সঙ্গে ফারসি শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে নূতন ভাষার সৃষ্টি করেছে। প্রাণের সজীব স্পর্শ তাঁর সংগীতে লিরিক মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করেছে।

গাথা সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কাব্যরূপে গাথা-গীতিকা—ঐতিহাসিক ছড়া ও কাব্য পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার, শোষণ, শায়েস্তা খাঁ, মুর্শিদকুলি খাঁর জমিদারদের ওপর অত্যাচার, সিরাজ ও মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে বহু ছড়া রচিত হয়। তবে সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, বন্যা, কোম্পানির অত্যাচার-কেন্দ্রিক ছড়াগুলি জনপ্রিয় ছিল।

ঐতিহাসিক কাব্যের মধ্যে 'রাজমালা' ও 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' উল্লেখযোগ্য। এর পাশাপাশি দীনেশচন্দ্র সেন প্রচারিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'—বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী গীতিকা সংকলন। গীতিকাগুলি কোন্ সময়ে রচিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না, তবে রচনাগুলির মধ্যে গোষ্ঠী-জীবনের আশা-আকাঙ(া, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-কল্পনা, লোকাচার-দেশাচারের পরিচয় আছে। ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার আখ্যায়িকাগুলি নর-নারীর ব্যর্থ প্রেমের আত্মত্যাগ ও অশ্রু-বেদনায় উজ্জ্বল। এগুলি প্রধানত লৌকিক-প্রণয়, ইতিহাসনির্ভর রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানমূলক রচনা। এতে প্রেমের আবেগ যেমন আছে তেমনি প্রেমের জন্য ত্যাগ-তিতি(ার পরিচয়ও আছে। সর্বোপরি মানবিক আবেদনে গীতিকাগুলি অসামান্য সৃষ্টি হিসেবে রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নব-গঠিত কলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে 'হঠাৎ গজিয়ে ওঠে রাজার দল।' অর্থাৎ কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তি(দের (চি নিম্নগামী হয়। এই বিশেষ সমাজে এক ধরনের গীতিবাদ্য—যাত্রা-পাঁচালী সমাদৃত হয়। এদের বিশেষ (চির উপযোগী কবিগান, টপ্পা, যাত্রা-পাঁচালী রচিত হতে থাকে। এই কবিওয়ালারা শি(ায়-দী(ায় উন্নত না হলেও স্বভাব-কবিশক্তি(বলে মুখে মুখে রচনা করে আসর মাতিয়ে রাখত। 'চাপান' ও 'উতরে'র মাধ্যমে কবিগান গীত হত। স্থূল অমোদ-প্রমোদের খোরাকরূপে দাঁড়াকবি, হাফ-আখড়াই, তর্জা ইত্যাদি দেখা দিল। এই সব গানের ভাষা অনেক (ে ত্রে অশিষ্ট ও গ্রাম্য স্থূলরসে পূর্ণ।

নিতাই, বৈরাগী, নীলমণি পাটনী, ভোলা ময়রা, কেষ্টা মুচি, এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী প্রমুখ কবিওয়ালারা বাজার মাৎ করেন। তবে কবিওয়ালাদের মধ্যে রাম বসু, হ(ঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ কিছুটা উচ্চমানের ছিলেন। রাম বসুর 'সখীসংবাদ' ও 'বিরহসঙ্গীত' এর দৃষ্টান্ত। নিম্নে প্রাচীন কবিওয়ালা গোঁজলাগুই-এর কবিসংগীতের নমুনা দেওয়া হ'লো।

"তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী, আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি ভূজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতন মণি।"

এর পাশাপাশি গীতিমূর্ছনায় নায়িকার হৃদয়-বেদনা সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন রাম বসু।

"যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি-ছি ধরো না।"

যাত্রাগানে কৃষ(যাত্রা, শিবযাত্রা, রামযাত্রা, চৈতন্যমঙ্গল বেশ জম-জমাটভাবে বিকশিত হয়েছিল। টপ্পাগানের জগতে নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালীমির্জার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দাশরথি রায়ের পাঁচালীও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ মুহূর্তে সন্ধিলগ্নের কবি ঈ(ের গুপ্ত।—তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিহারীলাল চত্র(বর্তীর হাতে বাংলা সাহিত্যে নূতন স্রোতধারার সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী খণ্ডে আছে।

9.10 সারাংশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শাক্ত(-গীতি কবিতার সৃষ্টি হয়। সমকালীন রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় আত্মমুক্তি(র তাগিদে—বিভেদকামী সমাজে সমন্বয় আনতে, দিশেহারা জাতীয় জীবনে শক্তি(, শান্তি ও স্বস্তি আনতে শাক্ত(কবিগণ 'কালভয়হারিণী' 'পরম ক(ণাময়ী' মায়ের অভয় চরণে আশ্রয় নিলেন। ভক্ত(সন্তানদের আর্তি ও প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে শাক্ত(পদাবলিতে। বৈষ(ব পদাবলি, প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনসংগীত, তান্ত্রিক তত্ত্ব ও সাধনা, শিব-দুর্গাকেন্দ্রিক পৌরাণিক ও মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কাহিনী ইত্যাদির প্রত্য(ও পরো(প্রভাবের ফলেই শাক্ত(পদাবলির সৃষ্টি। উমাসংগীত ও শ্যামাসংগীত এই দুই প্রধান শ্রেণীর পদগুলিই সমাজজীবনকে আন্দোলিত করেছিল। শাক্ত(

পদাবলির অমর স্রষ্টা হলেন রামপ্রসাদ সেন কমলাকান্ত চত্র(বর্তী। দুই কবিই গৃহী-মানুষ হয়েও হয়েছেন সমাজ-জীবনের শরিক। বিদ্যাসুন্দরের স্রষ্টা রামপ্রসাদ শাক্ত(সংগীতের জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনশ'র ওপর গান রচনা করে কবি নিরাবরণ-নিরাভরণ প্রাণের বাণী যেভাবে শুনিয়েছেন—তা হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। তাঁর সংগীতে অধ্যাত্মবাদের চেয়ে ধূলি-ধূসরিত বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বলতে গেলে অধ্যাত্মসাধনা, বাস্তবতা ও কাব্যরসের মিশ্রণে তাঁর সৃষ্টি কালজয়ী হয়েছে। কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক হয়েও শাক্ত(সংগীত রচনায় রেখে গেছেন প্রতিভার উজ্জ্বল স্বা(র। তাঁর ভণিতায় প্রায় তিন'শ পদ পাওয়া যায়। রূপকের মোড়কে, মার্জিত বিন্যাসরীতিতে রচিত তাঁর সংগীতগুলি হয়েছে গাঢ়বদ্ধ। রামপ্রসাদের মতই কমলাকান্তের লেখাতেও আবেগ, কল্পনা, ভক্তি(ভাব ও রচনারীতির মধ্যে সার্থক সমন্বয় ল(্য করা যায়। শাক্ত(গীতিধারার ঐতিহ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতেও প্রবাহমান। কাজী নজ(ল ইসলাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই রহস্যবাদী 'বাউল'-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব(গু(নিষ্ঠ বাউলগণ মানবজীবন ও মানবদেহকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারক-বাহক এই বাউল সম্প্রদায়। বাংলার শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও বাউল সংগীতের রচনাকাররূপে লালন ফকিরের নামটি স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর ভাবময়, মরমী বাউলসংগীত আজও প্রত্যেকের প্রাণে দোলা দেয় এবং মানবিক চেতনাবোধ জাগ্রত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু গীতিকা এবং ঐতিহাসিক ছড়া ও কাব্য রচিত হয়। কল্পনার জগৎ থেকে সরে এসে, সমকালীন যুগের প্রত্য(ঘটনার দ্বারা আন্দোলিত ও অনুপ্রাণিত হয়েই অনেকে এই জাতীয় রচনায় হাত দেন। তবে প্রকৃত তথ্যনিষ্ঠা এ সব লেখায় তেমন নেই। ময়মনসিংহ, পূর্ববঙ্গ গীতিকা গ্রন্থদ্বয়, গীতিকার উজ্জ্বল নিদর্শন। রাজমালা, মহারাষ্ট্র পুরাণ দু'খানি কাব্য কিছুটা প্রশংসার দাবী রাখে।

কলকাতা নগরীর পত্তন। হঠাৎ ধনিক-বণিক সমাজের আবির্ভাব। তাদের (চি মেটাতে নিম্নমানের কবিগান, যাত্রা টপ্পা, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির সৃষ্টি।—এর পরবর্তী সময়ে যুগসন্ধিকালে কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব—অতঃপর নবজাগরণে আন্দোলিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ।

9.11 অনুশীলনী 3

নীচের সমস্ত প্র(্ন একে একে উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 133 পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. নীচে কয়েকটি প্র(্ন দেওয়া হলো। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন ( ) দিন

(ক) শাক্ত(পদাবলির উদ্ভব—
1. সপ্তদশ শতাব্দীতে
2. ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে
3. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

(খ) কমলাকান্ত ছিলেন—
1. তন্ত্র সাধক
2. বৈষ(ব সাধক
3. নাস্তিক

(গ) 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন—
1. কমলাকান্ত
2. রামপ্রসাদ
3. লালন ফকির

(ঘ) 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' গানটির রচয়িতা—
1. লালন ফকির
2. হ(ঠাকুর
3. রামপ্রসাদ

(ঙ) 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' হ'লো—
1. গীতিকাব্য
2. ঐতিহাসিক কাব্য
3. মহাকাব্য

2. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক কিংবা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

		ঠিক	ভুল
(ক)	শাক্ত তত্ত্ব কোনো ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে গড়ে ওঠেনি।	☐	☐
(খ)	সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি।	☐	☐
(গ)	কৃষ্ণরাম দাস অষ্টাদশ শতকের কবি।	☐	☐
(ঘ)	'আমি কি দুখেরে ডরাই'—পদ্যাংশটির রচয়িতা রামপ্রসাদ।	☐	☐
(ঙ)	রামপ্রসাদের প্রকাশরীতি জটিল।	☐	☐
(চ)	আধুনিক যুগের অন্যতম শ্যামাসংগীত রচয়িতা জীবনানন্দ দাস।	☐	☐
(ছ)	এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী—যাত্রাগান করতেন।	☐	☐
(জ)	'মৈমনসিংহ গীতিকা' লোকসাহিত্য।	☐	☐
(ঝ)	'রাজমালা' পৌরাণিক কাব্য।	☐	☐

3. নীচের শূন্যস্থানগুলি শব্দ বসিয়ে পূরণ ক(ন।
(ক) অনেকের ধারণা রামপ্রসাদ_____মনোরঞ্জনের জন্য বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন।
(খ) রামপ্রসাদের দুই (দ্র কাব্য হলো _____ _____।
(গ) কমলাকান্ত প্রথম জীবনে _____ তন্ত্রসাধনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।
(ঘ) দাশরথি রায় _____গানের জন্য বিখ্যাত।
(ঙ) গোঁজলাগুই ছিলেন _____ কবিওয়ালা।
(চ) রাম বসুর _____ ও _____ গান উচ্চমানের।

9.12 উত্তর সংকেত

9.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) ভুল, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।
2. (ক) শ্রীসুধর্মা, (থিরি-যু-ধম্মা), (খ) মিলনান্তক, (গ) ফারসি, (ঘ) বামন-নপুংসক।
3. (ক) বামন, (খ) রোমান্টিক প্রণয় কাব্য, (গ) ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ, (ঘ) বলিষ্ঠ, (ঙ) বাস্তবধর্মী।

9.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) – (1) তিন খণ্ডে, (খ) – (2) হিন্দি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায়, (গ) – (3) কৃষ(চন্দ্র রায়ের, (ঘ) – (3) অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থ, (ঙ) – (2) 48 বছর বয়সে।
2. (ক) ভুরশুট, পেঁড়ো, (খ) ইন্দ্রনারায়ণ, (গ) কালিকামঙ্গল, (ঘ) হীরা, (ঙ) 1847 খ্রিঃ বিদ্যাসাগর।
3. (ক) (ভুল), (খ) (ঠিক), (গ) (ঠিক), (ঘ) (ভুল), (ঙ) (ঠিক)।

9.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) – (3) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, (খ) – (1) তন্ত্রসাধক, (গ) – (2) রামপ্রসাদ, (ঘ) – (1) লালন ফকির, (ঙ) – (2) ঐতিহাসিক কাব্য।
2. (ক) (ভুল), (খ) (ঠিক), (গ) (ভুল), (ঘ) (ঠিক), (ঙ) (ভুল), (চ) (ভুল), (ছ) (ঠিক), (জ) (ভুল)।
3. (ক) কৃষ(চন্দ্র রায়, (খ) কালীকীর্তন—কৃষ(কীর্তন, (গ) 'সাধকরঞ্জন', (ঘ) পাঁচালী, (ঙ) প্রাচীন, (চ) সখীসংবাদ-বিরহসংগীত।

9.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. ((ত্র গুপ্ত।

একক 10 ❑ আধুনিক বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্য

গঠন

10.1 উদ্দেশ্য
10.2 প্রস্তাবনা
10.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মিশনারিদের অবদান
10.3.1 ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
10.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
10.5 অনুশীলনী 1
10.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
10.6.1 সাময়িক পত্র পদ্যচর্চার বিকাশ
10.7 গদ্যশিল্পী ও গদ্যশিল্পের বিবর্তন
10.7.1 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **(1820-1891)**
10.7.2 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় **(1787-1848)**
10.7.3 প্যারীচাঁদ মিত্র **(1814-1883)**
10.7.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ **(1840-1870)**
10.7.5 অ(য়কুমার দত্ত **(1820-1886)**
10.7.6 দেবেন্দ্রনাথ ভূদেব মুখোপাধ্যায়
10.7.7 বঙ্কিমচন্দ্র **(1838-1895)**
10.8 গদ্য, প্রবন্ধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা
10.9 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
10.10 অনুশীলনী 2
10.11 উত্তর সংকেত
10.12 গ্রন্থপঞ্জি

10.1 উদ্দেশ্য

ইতিহাস জিজ্ঞাসা সচেতন মনের পরিচায়ক। একটি জাতি—তার দেশ, দেশের ইতিহাস, সমাজ, মানুষের জীবনাচরণ, তার ভাষা, সাহিত্য লোকবিবরণ জানবার আগ্রহ থেকেই ইতিহাস রচনার সূচনা। জাতির জীবনভাবনার রূপ রূপান্তর সাহিত্য শিল্পীর মননে অনুভবে ধরা পড়ে। সে সম্পর্কে ধারণা দেবার অভিপ্রায় থেকেই সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

তাই সাহিত্য-ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জাতিকে জানবার বিশেষ সুযোগ থাকে। আত্মান্বেষণের জন্য মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের গু(ত্ব অসীম। সেই বোধ থেকেই স্নাতকস্তরের ভাষার পাঠ পরিকল্পনায়

সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা মান্যতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পাঠ্য হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষ গু(ত্বসহকারে নির্বাচিত হয়েছে।

- এই অংশটি পাঠ করে আপনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সাধারণভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।
- আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা গদ্যের বিকাশ ও গদ্যে লেখা প্রথম পর্বের প্রধান বইগুলির পরিচয় হবে।
- এই জানা, বোঝা ও পরিচয় থেকে আপনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে ও লিখতে পারবেন।

10.2 প্রস্তাবনা

23শে জুন, 1757 পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার নবাবের পরাজয়ে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্যের পথ প্রশস্ত হয়। পরিশেষে দেশ বিদেশীর পদানত হয়। ঠিক এর 3 বৎসর পর (1760) অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু বাংলা সাহিত্যেও মধ্যযুগের সমাপ্তি।

এতদিন দেশের শাসকরা হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম নির্বিশেষে ছিল ভারতবাসী। তাঁরা দেশের মানুষের শুভাশুভ, ভালমন্দ, সুখ-দুঃখের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার যাঁরা শাসকের আসনে এলেন, তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ দেশ পরিচালনার দিশারী হয়ে গেল। ইংরেজ অধিকার বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক বিনষ্টির ইতিহাস। এরই মধ্যে বাঙালির দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জারকরসে বাঙালির চিত্তলোকের উদ্বোধনে, মননে-চিন্তনে ফল্গুধারার মত নূতন যুগের নূতন ভাবনা অঙ্কুরিত হচ্ছিল। ফলে, উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে বাঙালির মানসলোকে কতকগুলি বিশেষ ল(ণ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার প্রতিফলন তার ধ্যান-ধারণা, জীবন-দর্শনে, সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্য(হয়ে উঠেছে। ফলত, ইংরেজ বিজয়ে বাংলাদেশ ও তার সাহিত্য মধ্যযুগের অবসানে নব্যযুগের অবসানে নব্যযুগে পৌঁছল। এ হল অন্তহীন কালপ্রবাহে নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ত অগ্রসর হওয়া।

নবাবের পতনে ইংরেজাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ঔপনিবেশিক শোষণ, সমাজের সর্বস্তরে অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, ভূমিব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে। দেশে মধ্যস্বত্বভোগী নতুন জমিদার, ইজারাদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ফলে, প্রজার ভূমিস্বত্ব বিলোপ পেল। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন ধরল। দেশজ সনাতনী শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হ'লেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনও নতুন শিল্প গড়ে তোলা হ'ল না। এদেশ বিলিতি পণ্যের বাজারে পরিণত হ'ল।

ফলত, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় বাঙালির মনে ও মননে ভৌম চেতনা সঞ্চারিত হয়। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী প্রথাসিদ্ধ গীতিধর্মিতার অন্তঃসলিল ধারাটিও সমানভাবে এ সময় বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নতুনতর ভূমিব্যবস্থার অভিঘাতে এতদিনকার গ্রামীণ সংস্কৃতির পোষক-বাহক স্থানীয় ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষণার অভাবে লোকায়ত কবি-শিল্পীরা বৃত্তি হারিয়ে শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত হ'লেন। অপরদিকে, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম সংস্কৃতি সর্বত্র নতুন চেতনার প্রবল আঘাত, সংঘাত জাতির জীবনে যে অনুভবের সঞ্চার করে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন তাতে সমিধ

জোগায় আর তারই পরিণতিতে আধুনিক জীবনবোধের উদ্বোধন ঘটে। বাঙালির জীবন-ভাবনায় আধুনিক শি(াজাত যুক্তি(বাদ, মানবহিতবাদ, ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যবোধ, নারী চেতনা এবং স্বাদেশিকতার পাশাপাশি রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বাস্তব বোধজাত কতকগুলি ধারণা জন্মে(পরিণতিতে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের চিন্তাগুলি বাঙালির একাংশকে সক্রি(য় করে তোলে। মিশনারি সিভিলিয়ানদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ অতিক্র(ম করে বাঙালি তার মানসমুক্তি(র কারণেই নিজের উপলব্ধিকে সকলের বোধগম্য করে ব্যক্ত(করবার জন্য দৈনন্দিন জীবনের ভাষা—বাংলা গদ্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। দোম আন্তোনিও মনোএল, কেরি, মার্শম্যানের গদ্য চর্চা থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা তাই স্বরূপে স্বতন্ত্র। শেষোক্ত(গদ্য লেখকরা লোক সংস্কার থেকে চেতনার মুক্তি(ও যুক্তি(বাদের প্রতিষ্ঠার পর সাহিত্য ও শিল্পভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী অংশে এর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হবে।

10.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মিশনারিদের অবদান

বাংলা গদ্যচর্চা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জগৎ-জীবন সম্পর্কে নতুন চেতনার ফল। বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপাদান উপস্থাপনা দেবমাতৃকার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় এবং অপৌ(যেয়তা আরোপের ফলে দৈবীভাষা হিসেবে পদ্যের বহুল ব্যবহার ছিল। পদ্য ছিল সেদিনের আবেগের ভাবপ্রকাশের ভাষা। বিচার বি(ে-ষণের কাজটি চলত পর্যায়ের ব্যবহারে, তার স্থিতিস্থাপকতার গুণে। কিন্তু য়ুরোপের অভিঘাতে সমাজজীবনের ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন(মানববোধ, ভৌমচেতনা, যুক্তি(বাদ প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যিক গদ্য ভাষার প্রয়োজনবোধ প্রবল হয়ে উঠল। সমাজ-সংস্কার, শি(া ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় গদ্য অপরিহার্য হ'ল। সাহিত্যও হয়ে উঠল বহুমুখী ও বৈচিত্র্যসম্পন্ন। গদ্যচর্চায় ইংরেজ সংস্পর্শ যেমন বাঙালির চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি একাধিক খ্রিস্টিয় মিশনারির অবদানও এ (ে ত্রে কম নয়। এদের রচনায় চিন্তার স্বচ্ছতার অভাব ও এলোমেলো বিন্যাসের বাহুল্য থাকায় গদ্যের শৈশব উত্তাল হতে পারেনি।

এই গদ্যশিল্প ও সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিচয় নেবার পূর্বে পূর্বসংস্কারটির কিছু সন্ধান নেওয়া দরকার। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গদ্য ছিল অনেকটা ব্রাত্য। এর ব্যবহার হোত সহজিয়া বৈষ(ব কড়চায় আইন-আদালতে, দলিল-দস্তাবেজে, চিঠিপত্রে। এ সময়ে রচিত "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি", 'দেহ-কড়চা', চুক্তি(অভিযোগ, আত্মবিক্র(য় পত্রাদিতে ব্যবহৃত ভাষা একদিকে ক্রি(য়াকর্ম বর্জিত, কাটাকাটা, ভাঙাভাঙা, অপরদিকে ইসলামি শব্দ, আরবি-ফার্সির বাহুল্য—গদ্যের স্বচ্ছন্দ বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ধর্ম প্রচারের তাড়নায় বিদেশী মিশনারিদের গদ্যগ্রন্থগুলিও এ ধরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্র(ম করতে পারেনি।

প্রসঙ্গক্র(মে পর্তুগীজ মিশনারিদের তিনটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বইগুলি বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে রোমান ক্যাথলিক পাদরিদের দ্বারা রচিত। দেশীয় ভাষা ব্যতিরেকে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে খ্রিস্টের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি থেকে দোম আন্তোনিও রোজারিও ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, এবং মনোএল-দা আসসুম্পসা ও কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (Crepar Xaxtrer Orth Bhed) এবং বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ, পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। প্রথমটির পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেলেও কোনো মুদ্রিতরূপ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। দোম আন্তোনিও-র পুস্তিকাটির মুল ল(্য হিন্দুধর্মের অসারতা এবং খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। এজন্য তিনি

বৈষ(ব কড়চার ঢঙে পাদ্রী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর বক্ত(ব্য তুলে ধরেছেন। আন্তোনিও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান বলে হিন্দুধর্মের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে জানতেন, তাই তাঁর গ্রন্থে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তীব্র আত্র(মণ আছে। মনোএল-এর গ্রন্থদুটি 1743 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। তখনও বাংলা হরফে ছাপার এদেশে বা অন্যত্র কোনো অবকাশ ছিল না। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারার্থে মিশনারিরা বাংলা ভাষা শিখে এ দেশবাসীর বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায়ে ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেন। বইটির প্রথমাংশে বাংলা ব্যাকরণের শব্দ, ধাতু, অব্যয়, বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে বহু বাংলা পর্তুগীজ শব্দ সংগ্রহ করেছেন। মনোএল পর্তুগীজ ধর্মযাজক(তাঁর বাংলা ভাষায় অবাঙালিসুলভ ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ে(ত্রবিশেষে দোম-আন্তোনিয়র থেকে তাঁর রচনায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বেশি ল(্য করা যায়। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ কথোপকথনের ঢঙে গু(-শিষ্যের প্র্নোত্তরচ্ছলে বিতর্কাশ্রয়ী রচনা। মনোএল-র রচনা সাধুভাষার ধাঁচে গড়া। তাঁর পদবিন্যাস ও বাক্য গঠনে সাধুভাষার মত সর্বনাম, ত্রি(য়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আন্তোনিয়র রচনা—গু(—"অনেক লোক প্রতিদিনে একবার মালা জপে, ইহার কারণ কি?"—শিষ্য—"কারণ এহি, বিনে ভক্তি(তে জপে। ভক্তি(তে যে জপে, সেই যেমন ধ্যান তেমত লাভ পাইবে।"

পর্তুগীজ মিশনারিরা ধর্মান্তরীকরণের প্রয়োজনেই বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন কিন্তু পলাশীর পর, বিশেষত 1765 খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানির পর, ইংরেজ বণিক ও কোম্পানির কর্তৃপ(অনুভব করেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ও প্রশাসনের স্বার্থেই দেশীয় ভাষা শি(া আবশ্যক আর এ জন্য দরকার গদ্যের অনুশীলন। এই উদ্যোগের পেছনে যেহেতু কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়নি, তাই বঙ্গ জনসমাজ এ ধরনের গদ্য চর্চায় অনেকটা পৃষ্ঠপোষণাও করেছে। 1774 সালে এ দেশে বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনে ইংরেজি আইনের বঙ্গানুবাদ করা হয়। হ্যালহেড বাংলা ভাষা শি(ার জন্য Grammar of the Bengali Language (1778) প্রকাশ করেন। বইটি বৈয়াকরণের দৃষ্টি দিয়ে লেখা। বইটি ইংরেজিতে রচনা করলেও কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র থেকে প্রচুর উদাহরণসহ প্রথম ছেনিকাটা বঙ্গা(রে মুদ্রিত হয়। এ বইতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এ সময় কতকগুলি আইনের বই ইংরেজি থেকে অনূদিত হয়, যেমন—ইম্পেকোড (1785), বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ফৌজদারি কার্যবিধি (1791) কর্ণওয়ালিস কোড (1793) প্রভৃতি। এই বইগুলির সাহিত্য মূল্য উল্লেখযোগ্য না হলেও বাঙালির ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত(।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কলকাতায় খ্রিস্টিয় যাজকদের মিশন স্থাপন ও ধর্মপ্রচারে বাধা দেওয়া হয়, তাই কেরি ও তাঁর সহকর্মীরা দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুরে 1800 খ্রিস্টাব্দে মিশন প্রতিষ্ঠা করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারার্থে বাইবেলসহ অন্যান্য প্রচার গ্রন্থ বাংলায় রচনা করেন। কেরি অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর' (St. Mathers Gospel) 1800 খ্রিস্টাব্দে পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাংলা অ(রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 1801 খ্রিস্টাব্দে নিউ টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ ও ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশত মুদ্রিত হয়। পরে সমগ্র গ্রন্থ 1809 খ্রিস্টাব্দে ধর্মপুস্তক নামে প্রকাশিত হয়। বাইবেলের প্রথমদিকের অনুবাদের ভাষা ছিল জড় এবং কৃত্রিম। স্বভাবত আ(রিক অনুবাদের জন্য এমনটি ঘটেছে। ফলে বাক্যবিন্যাস ও পদান্বয়ে উগ্র ফিরিঙ্গীয়ানা আছে। অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে এগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীরামপুর মিশন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতসহ কতগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা এবং ব্যাকরণ অভিধান সাময়িক পত্র প্রকাশ করে বাংলার সারস্বত সাধনায় গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

10.3.1 ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

বাংলাদেশে দেওয়ানি পাওয়ার পর ভারতব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্(ায় ইংরেজ এ দেশের আচার-ব্যবহার, ভাষা-ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনবোধ করে। স্বল্পশি(িত বিদেশী বিভাষী যে সমস্ত সিবিলিয়ান এ দেশে ব্যবসা বা প্রশাসনের পরিচালনার জন্য আসেন, তাঁদের শি(ার জন্য ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (4ঠা মে, 1800 খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের কাজ ছিল ইংলন্ড-আগত ত(ণ সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা। এ কাজে কেরির সঠিক উদ্যোগে 1814 সাল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ খুবই সক্রি(য় ছিল। 1854-তে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা গদ্যের সূচনালগ্নে এই কলেজের অবদান উল্লেখযোগ্য। সিবিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা শেখাবার দায়িত্ব উইলিয়ম কেরির ওপর ন্যস্ত হলে তিনি কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ও কলেজের অধ্য(পদে যোগ দেন। কলেজের ভাষাপাঠের সামগ্রিক বিকাশের জন্য পরিকল্পনা রচনা ও শি(ক নিয়োগে তাঁর মনস্বীতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্য তিনি মালদহ, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী থেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ফারসিনবীশ মুন্শী নিয়োগে উদ্যোগী হন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্শী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কলেজ স্থাপনের একবছরের মধ্যে নিযুক্ত(হয়েছিলেন। এ ভাবে কেরির প্রেরণায় বাংলা গদ্যের অনেক লেখক তৈরি হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের উৎকর্ষেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

কেরি ল(করেছিলেন, এ দেশে তৎকালে প্রচলিত কাব্য বা সাহিত্য, সিবিলিয়ানদের ভাষা শি(ার প্রয়োজনে আদৌ কার্যকরী নয়। তাই তিনি ভাষাবৈচিত্র্য ও সরস উপস্থাপনার কথা মনে রেখে গ্রন্থ পরিকল্পনা করেন। তদনুসারে কেরি স্বযং ও সহযোগী পণ্ডিত মুন্শীদের গদ্যগ্রন্থ রচনা ও অনুবাদে উৎসাহিত করলেন। ফলশ্রুতিতে কেরির বাংলা শি(ক মুন্শী রামরাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (1801), 'লিপিমালা', (1802) স্বয়ং কেরি 'কথোপকথন' (1801), 'ইতিহাসমালা' (1812), প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (1802), 'হিতোপদেশ' (1808)—দুটি অনুবাদ এবং 'রাজাবলি' (1808) ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (রচনা 1813, প্রকাশ 1833)—দুটি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈশপ ফেব্ল্সের' অনুবাদ 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (1803), চণ্ডীচরণ মুন্শীর ফারসি তুতিনামার অনুবাদ 'তোতা ইতিহাস' (1805), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক রচনা 'মহারাজ কৃষ(চন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (1805), হরপ্রসাদ রায়ের বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ 'পু(ষ পরী(া' (1815), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পৌরাণিক রচনা 'পদার্থতত্ত্ব কৌমুদী' (1812) উল্লেখ্য প্রকাশন। গোলোকনাথ শর্মা কলেজের সঙ্গে যুক্ত(না থাকলেও তার বই 'হিতোপদেশ' (1802) কেরির উদ্যোগে শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত ও কলেজ পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। সিবিলিয়ান পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা পাঠ্য তালিকা বি(-ষণ করলে কেরির ভাষা-সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে ধ্যানধারণাটি স্পষ্ট হবে। কেরি বুঝেছিলেন কোনো ভাষা শেখাতে হলে সেই ভাষার বাচনভঙ্গী, গঠন-রীতি, যাতে শি(ার্থীর বোধগম্য হয় এবং দেশীয় ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা জন্মে সেদিকেও নজর রাখতে হবে, তাই কেরিপরিকল্পিত গ্রন্থের মধ্যে—(1) আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্যযুক্ত(বাক্যবিন্যাসের ইসলামিক গদ্য, (2) চলিত কথোপকথনের গদ্য (এর বাক্যগুলি সং(িপ্ত, দ্রুত এবং প্রায়শ,

একই শব্দের বারবার প্রয়োগযুক্ত(), (3) কথকতাসুলভ বর্ণনামূলক গদ্য (এটি সাধারণত একটি সুনির্দিষ্ট বনিয়াদের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, এর ভাষা কখনও লঘু, কখনও দ্রুতসঞ্চারী), তেমনি (4) কিছু সংস্কৃত প্রভাবিত গু(গম্ভীর সাধু ভাষায় রচিত গ্রন্থও আছে।

প্রকাশিত বইয়ের শ্রেণীবিন্যাস নীচে দেওয়া হল

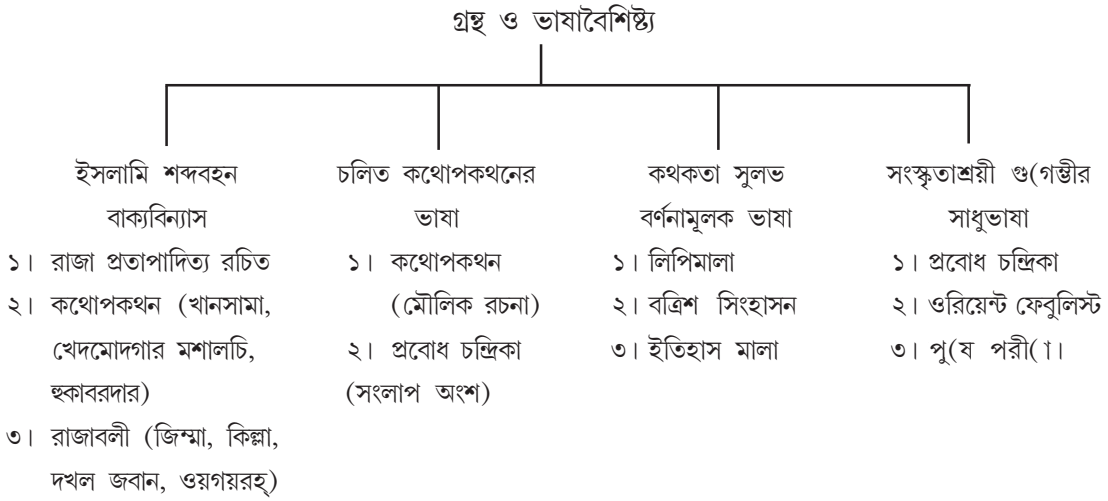

কেরি পরিকল্পিত বইগুলিকে আবার মৌলিক অনুবাদ হিসেবে বিভাজন করলে দেখা যাবে তা ছিল খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। মৌলিক গ্রন্থগুলি আবার ভাষা ও লিপিশি(া(জীবনী, ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন(অনুবাদ— ইংরেজি, সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী থেকে অনুবাদ, বস্তুত গদ্য রচনার প্রথমযুগ থেকেই বিষয় বৈচিত্র্যে ছিল অনন্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তিন জন প্রধান গ্রন্থকারের পরিচয় দিতে গেলে কেরির বাংলা ভাষা শি(ক ফারসিনবিশ মুন্সী রামরাম বসুর কথা বলতে হয়। তিনি শ্রীরামপুর থেকেই কেরির ঘনিষ্ঠ। সেখানে কেরির ঘনিষ্ঠ হিসেবে মিশন প্রকাশিত গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি কেরির সহযোগী হিসেবে শি(ক পদে নিযুক্ত(হন। এ যুগে তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (1803)। বাঙালি রচিত বাংলা ভাষার ও বাঙালির মুদ্রিত এবং প্রকাশিত প্রথম বই। এটি মৌলিক রচনা এবং প্রথম রচিত ঐতিহাসিক জীবনীর নিদর্শন। এই বইটিতে সংস্কৃত-ফারসি-আরবি-বাংলা শব্দ যেমন, তেমনভাবে পদ বাক্য বিন্যাসে চরম অমনোযোগের পরিচয় আছে। এ কথা ঠিক তখন গদ্যের কোনো আদর্শ সামনে ছিল না। রামরাম সে পথে বিচরণে প্রয়াসীও হয়নি। তাঁর গদ্যে সৃষ্টিশক্তি(বা শৃঙ্খলার পরিচয় নেই।

রামরামের অপর বই লিপিমালা (1802) চল্লিশটি চিঠির সংকলন। এক রাজার অন্য রাজাকে লেখা দশটি, রাজা কর্তৃক চাকরকে লেখা পাঁচটি ও অন্যান্য পঁচিশটি চিঠি আছে। চিঠিগুলির মাধ্যমে লেখক পুরাণ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এ দিক থেকে রচনা রীতি মৌলিক। বইটি বিবরণধর্মী। ভাষা ফারসি বর্জিত অনেকটা সহজ ও সংযত।

কেরি 'কথোপকথন' (1801) এবং 'ইতিহাসমালা'র (1812) গ্রন্থকার হিসেবে পরিচিত। কথোপকথনে পল্লীবাংলার কথ্যভাষা ও ইতর জনসাধারণের মুখের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কোম্পানির কাজ পরিচালনার জন্য জনসংযোগ জ(রি, তাই ইংরেজ সিবিলিয়ানদের কাজ চালাবার উপযোগী আলাপচারিতার ভাষা, চলিত কথোপকথনের ভাষা শেখাবার জন্যই মনে হয় কথোপকথনের পরিকল্পনা। বইয়ের একত্রিশটি অধ্যায়ে মজুর, ঘটক, মেয়েলি কথোপকথন, মেয়ে-কোন্দল, মেয়েদের হাট করা, জমিদার-রায়ত প্রভৃতি প্রতিদিনের দিন-যাপনে যে মানুষগুলির সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়, তাদের কথোপকথন সংকলন করা হয়েছে। ফলে এর মধ্যে সমাজের জীবন্ত মানুষগুলোর একটি বাস্তব ছবি, অনেকটা তাদেরই কথ্যভাষায় ফুটে উঠেছে।

যেমন, "আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।
ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।
আমরা মাচ আর কলাইর ডাল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।"
(স্ত্রীলোকের কথোপকথন)

বইটির মধ্যে বাংলা প্রবাদ প্রবচন, হাস্যপরিহাস, গ্রাম্য অ(ীল শব্দ প্রয়োগ, মেয়েলি কোন্দল প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এগুলি ধর্মপ্রচারক কেরির জনজীবন সম্পর্কে প্রত্য(অভিজ্ঞতার ফল। অনেকে অবশ্য মনে করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই ভাষাগ্রন্থের রচয়িতা। বইটি যদি কেরির নিজের রচনা নাও হয়, তথাপি এর পরিকল্পনায়, ভাষা ও বিষয় সম্পর্কে যে মনস্বীতার পরিচয় আছে, তাও একজন বিদেশী পাদরির প(বিস্ময়ের। 'ইতিহাসমালা' ইতিহাসের বই নয়, দেশী-বিদেশী 14টি গল্পের সমষ্টি। ভাষা পরিচ্ছন্ন। এগারো বছরে গদ্যরূপের যে বিবর্তন ঘটেছে তার পরিচয় আছে। সম্ভবত বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম গল্প বলার গৌরব কেরিরই প্রাপ্য।

কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বইয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। 'বত্রিশ সিংহাসন' (1802) , 'হিতোপদেশ' (1808), 'রাজাবলি' (1808), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (1813, প্রকাশ, 1833) ছাড়াও রামমোহনের ব্যাকরণ' তাঁর শিল্পীসত্তা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ভাষা সংস্কৃতানুসারী হলেও আড়ষ্ট নয়। বরং সংস্কৃতের প্রভাবে গু(গম্ভীর সাধুভাষা রীতির একটি ছাঁদ গড়ে দিয়েছে। 'রাজাবলি' সংস্কৃত থেকে অনুবাদ অনুসরণে রচিত। ভারতবর্ষের রাজা ও রাজবংশের এক ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিচয় এতে পাওয়া যায়। বইটিতে পৌরাণিক থেকে ইতিহাসের মধ্যযুগের সুলতান বাদশাদের কথা, শেষে কোম্পানির কাজের সং(প্ত কাহিনী আছে। ভাষা সংস্কৃতবহুল হলেও, স্থানে স্থানে 'যাবনী মিশাল' আছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভার স্মারক। রচনা ও প্রকাশের মধ্যে 20 বছরের ব্যবধান। লেখক বইটিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ থেকে উপাখ্যান ও রচনারীতি সংগ্রহ যেমন করেছেন, তেমনি লৌকিক কাহিনীও এর সঙ্গে যুত্ত(হয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টিরূপে পরিগণিত। তাঁর রচনায় কলেজে অনুসৃত চলিত-কথ্য-সাধু সংস্কৃতানুসারী সবকটি গদ্যরীতির প্রয়োগ আছে। কথ্যরীতির বাস্তব ভিত্তিটি মেনে নিলেও সাধু গদ্যরীতির প্রতি তাঁর প(পাত ছিল। সেই পথ ধরেই বিদ্যাসাগরের পর সাধুরীতি অগ্রসর হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের কথ্যরীতির গদ্যের উদাহরণ "মোরা চাষ করিব ফসল পাব রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অল্প করিয়া খাবো, ছেলেপিলাগুলি পুষিব।...শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি।"

10.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

নবাবি আমলের অবসানে ইংরেজ অধিকারের ফলে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ায়, নূতন সমাজ-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় এ দেশের শাসককুলের প্রয়োজনে অর্থকরী ও ইংরেজি শি(ার বিস্তার ঘটল। দেশী ও বিদেশী ভাবধারার দ্বন্দ্বে-সংঘাতে ধর্মসংস্কার স্বদেশচেতনার মধ্য দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে লাগল। ফলে বাঙালির জীবনবোধেরও পরিবর্তন ঘটল। সাংস্কৃতিক চেতনায় নূতন বোধ সঞ্চারের ফলে বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার হোল। এ সময়ে সাহিত্যে বস্তুজগত ও মানুষ প্রাধান্য পেল। ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে গদ্যভাষা ও সাহিত্যিক গদ্যরীতির উদ্ভব ঘটল। গদ্যভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ গদ্যে অনুবাদ প্রকাশের তাগিদে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রপাত।

10.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 155 পৃষ্ঠায় দেওয়া উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন
   (ক) সাহিত্য ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে .....জানবার বিশেষ.....থাকে।
   (খ) অন্নদামঙ্গলের কবি..... মৃত্যু, বাংলা সাহিত্যেও.....সমাপ্তি।
   (গ) দোম আন্তোনিও রচিত গ্রন্থের নাম.....।
   (ঘ) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থের রচয়িতা.....।
   (ঙ) হ্যালহেডের বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচিত হয়..... খ্রিস্টাব্দে।
   (চ) কেরি অনূদিত প্রথম বই.....।
   (ছ) কেরির ভাষা শি(কের নাম.....।
   (জ) রামরামের বই.....40টি চিঠির সংকলন।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্(দিন।

(ক) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু	(1) 1757 (2) 1750 (3) 1860
(খ) শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা	(1) 1800 (2) 1801 (3) 1760
(গ) কেরির কথোপকথন প্রকাশিত হয়	(1) 1812 (2) 1801 (3) 1800
(ঘ) রামরাম বসুর লিপিমালার প্রকাশ	(1) 1802 (2) 1801 (3) 1806
(ঙ) প্রবোধচন্দ্রিকার রচয়িতা	(1) উইলিয়ম কেরি, (2) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (3) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

3. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্((✓) দিন।

(ক) কেরির কথোপকথনের ভাষা	1. কথ্যরীতির (2) ইসলামি গদ্যরীতির (3) সংস্কৃত প্রভাবিত

(খ) মৃত্যুঞ্জয়ের প(পাত ছিল (1) কথ্যরীতির প্রতি (2) সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতির প্রতি (3) সাহিত্যিক চলিত ভাষার প্রতি।

4. (ক) শ্রীরামপুর মিশনে থাকাকালীন কেরি দুখানি বই অনুবাদ করেন।—বই দুটির নাম উল্লেখ ক(ন।

(খ) বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ, পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ রচয়িতা কে? বইটি কোন্ বছর প্রকাশিত হয়?

(গ) ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট কে রচনা করেন? প্রকাশকাল উল্লেখ ক(ন।

(ঘ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বৈচিত্র্য ছিল। উদাহরণ দিন।

(ঙ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে অন্তত দুটি 'হিতোপদেশ' অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক কে কে?

10.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

10.6.1 সাময়িক পত্র গদ্যচর্চার বিকাশ

মার্সম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে 1818 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে প্রথম বাংলা মাসিক দিগ্‌দর্শন এবং ঐ বছর মে মাসে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। বাঙালি পরিচালিত প্রথম সাময়িক পত্র 'বাঙাল গেজেটি' (সাপ্তাহিক) 1818 জুনে প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়। সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। মিশনারি পরিচালিত সাময়িক পত্র সমাচার দর্পণ 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' প্রকৃতপ(ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। 1819 সালে শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁরা আরও একটি বাংলা মাসিক পত্র 'গস্পেল ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন। অল্প কিছুদিন চলেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

1821 খ্রিস্টাব্দের 14ই জুলাই 'সমাচার দর্পণ'-এ হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করে কিছু প্র(্ন তোলা হয়। রামমোহন তার উত্তর পাঠান। 'দর্পণ' কর্তৃপ(তা প্রকাশ না করায় তিনি শিবপ্রসাদ শর্মা নাম নিয়ে সেপ্টেম্বরে 1821 দ্বিভাষিক পত্রিকা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ করেন। পরে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'সম্বাদ কৌমুদী' (1821 ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয়। এখানে খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান সব ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বি(দ্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। র(ণশীল ভবানীচরণ অসন্তুষ্ট হয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (মার্চ ১৮২১) সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সমকালীন র(ণশীল হিন্দুদের মুখপত্রে পরিণত হয়। রামমোহন ভবানীচরণের মতাদর্শগত বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক তাঁদের দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। সে সময় এ বাদানুবাদ মধ্যবিত্ত শি(িত জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রামমোহনের যুক্তি(ও বি(ে-ষণী শক্তি(র পাশাপাশি ভবানীচরণের সাংবাদিক নিষ্ঠা, রসজ্ঞ জীবনদৃষ্টি ও মননশীলতা তাদের আলোচনার প্রধান আকর্ষণ ছিল। অতঃপর প্রকাশিত দুটি পত্রিকা 'প(াবলী' (ফেব্রুয়ারি 1822) ও 'বঙ্গদূত' (মে 1829)-এর উল্লেখ করতে হয়। প্রথমোক্ত(টি পাদ্রী লসন সংকলিত পশুবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিক, সম্পাদনা করেন নীলরত্ন হালদার। রামমোহন, দ্বারকানাথ পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চেতনা সঞ্চারে এই পত্রিকার কিছু ভূমিকা আছে।

'সংবাদ প্রভাকর' (জানুয়ারি 1823) ঈ(রের গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত। তাঁর সমকালে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জনপ্রিয়তার কারণে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ত্র(মে সপ্তাহে তিনবার, পরে দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় 'প্রভাকরই' প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। পত্রিকাটি সাংবাদিকতার একটি মান তৈরি করেছে। এতে দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হোত। প্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনী, অ(য় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি ত(ণ কবিদের পৃষ্ঠপোষণায় তাঁদের কবিতা ও সমকালের অনেক রচনা প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে। রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সমকালে বাংলা ভাষায় আরও কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রাচীনপন্থী 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (মার্চ, 1831)—সম্পাদক শেখ আলীমুল্লা—প্রথম মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ও ফারসি দ্বিভাষিক পত্রিকা। গুণমানে উল্লেখযোগ্য নয়। ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (জুন 1831) ইংরেজি-শি(িত উদার মতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন দ(িণানন্দন (পরে দ(িণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়। 'বিজ্ঞান সেবধি' (এপ্রিল 1832)-তে ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরে প্রকাশ করা হোত। আগস্ট, 1843-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসাবে অ(য়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানে "লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। বিজ্ঞান ও মানবিকীবিদ্যা চর্চার, বিশেষত অ(য়কুমারের দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চমানের প্রবন্ধ প্রকাশের সুবাদে পত্রিকাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাময়িকের মর্যাদা পায়। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু পত্রিকাটির সঙ্গে যুত্ত(ছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের বি(দ্ধে প্রথম প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালির চিত্তলোকের উদ্বোধন এই পত্রিকার অন্যতম অবদান। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সচিত্র মাসিক—'বিবিধার্থ সংগ্রহ' অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এতে পুরাবৃত্ত, প্রসিদ্ধ ব্যত্তি(দের কথা, তীর্থ বৃত্তান্ত, জীবসংস্থান খাদ্যদ্রব্য, বাণিজ্যদ্রব্য, নীতিগর্ভ কাহিনী, নূতন বইয়ের সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হোত। ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (নভেম্বর, 1858) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা হোত। সংবাদ প্রকাশে নির্ভীকতা, সংবাদ নির্বাচনে দ(তা এবং সংবাদ পরিবেশনে নৈপুণ্য—সাংবাদিকের এই গুণগুলি দ্বারকানাথের থাকায় 'সোমপ্রকাশ' একটি আদর্শ পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। কু(চিপূর্ণ ভাষায় গালাগালি করবার পূর্বতন ধারাটি বর্জন করে সংযত, (চিসম্মত ভাষায় দ্বারকানাথ অন্যকে সমালোচনা করে সমাজ ও দেশের স্থায়ী কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন। সোমপ্রকাশের চোদ্দ বছর পর 'বঙ্গদর্শন' (এপ্রিল 1872) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করে নিয়েছিল বঙ্গদর্শন সাময়িক পত্রের জগতে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিল। ধর্ম, তর্ক বা নূতন নূতন বিষয়ে অবতারণা ছাড়াও সাহিত্যের অনুশীলনেও যে সাময়িক সাংবাদপত্রের ভূমিকা আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এ কথা কেউ তেমন উপলব্ধি করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' তাঁর প্রতিভা বিকাশের যেমন পোষকতা করেছিল, তেমনি সাহিত্য(ুধা দূর করতে বাঙালির ঘরে ঘরে স্থান পেল। পত্রিকার প্রয়োজনে, ভিন্ন(চি পাঠকের তৃপ্তি সাধনের প্রয়োজনে তিনি যেমন ইতিহাস, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিচিত্র (ে ত্রে পদচারণা করেছেন, তেমনি সমকালের বহু লেখককে অনুপ্রাণিতও করেছেন। ফলে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে মননশীল শত্তি(শালী একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল।

10.7 গদ্য শিল্পী ও গদ্য শিল্পের বিবর্তন

রামমোহন (1774-1833) রামমোহন ডিগবীর দেওয়ানি ছেড়ে কলকাতায় আসেন 1814 খ্রিস্টাব্দে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রামমোহন এ সময় অভিজ্ঞতায়, বিদ্যায় বিত্তে সমৃদ্ধ। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত-ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। যুক্তি(বাদী, শাস্ত্রজ্ঞানী এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারক। দীর্ঘদিন ইংরেজ সাহচর্যে ও ইংরেজি জ্ঞানবিদ্যাচর্চার প্রভাবে এবং নূতন যুগধর্মের প্রেরণায় সুবেদী রামমোহন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। এ(ে ত্রে তাঁর ব্যক্তি(ত্বের প্রতিটি ধারার স্ফুরণ আমরা ল(্য করি। তাঁর যুক্তি(বাদ, ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যবোধ মানবাধিকারবোধ, জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ(া ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী ছিল সেদিন অনেকটা অভাবিত। রামমোহন এই আন্তরিক তাড়না থেকেই জাতির মানসমুক্তি(র বাসনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে যুক্তি(বুদ্ধির সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও ঐতিহ্যের সরণী দিয়ে খোলা হাওয়া বইয়ে দেবার আয়োজন করেছিলেন। 1815 থেকে 1830 এই পনেরো বছরের মধ্যে অনুবাদ, টীকাভাষা, প্রচারপত্র, বিতর্কমূলক রচনাসহ ব্রহ্মসংগীত, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, গায়ত্রীয় অর্থ প্রভৃতি মিলিয়ে তিরিশটি বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ছাড়াও তাঁর ইংরেজিতে রচনার সম্ভারও খুব কম নয়। সর্বত্র তিনি (রধার মনীষার পরিচয়বাহী যুক্তি(পথ অনুসরণ করেছেন। কখনও বিপ(ে র বি(দ্ধে কটূক্তি(করেননি বরং বি(দ্ধের কটূক্তি(র উত্তরে যুক্তি(দিয়ে নিরসনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর রচনায় আশ্চর্য সংযম ও (চিবোধের সঙ্গে স্মিত হাস্যরস বোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহনের সমগ্র রচনাকে তিনটি ধারায় বিন্যস্ত করা যায়—অনুবাদ-ভাষ্য, বিতর্কমূলক ও মৌলিক। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (1815)(ঈশ, কঠ, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষৎ অনুবাদ-ভাষ্য (1815-1819)(অনেকটা বোধগম্য ও রচয়িতার মননশীলতার পরিচায়ক। যেমন, "প্রার্থনায় যে কর্মফল সে অনিত্য, আমি তাহা জানি। অনিত্য বস্তু যে কর্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মাতেই প্রাপ্ত হয়েন না।"—এর অনুবাদ মূলানুগ, যথাস্থানে যতি ব্যবহারে অর্থ বোধ হয়। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (1817), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (1818), সহমরণ-বিষয়ক, প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ (সহমরণ বিরোধী পুস্তিকা) 1818, 1819, কবিতাকারের সহিত বিচার (1820) প্রকৃতি বিতর্কমূলক রচনায় তাঁর মনস্বীতার পরিচয় আছে। কোথাও কোথাও সংবেদনশীলতার কারণে তাঁর গদ্য হয়ে উঠেছে সুখপাঠ্য "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরী(া কোন্‌কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?...আপনারা বিদ্যাশি(া জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" 'গায়ত্রীর অর্থ' (1818), 'ব্রহ্মসংগীত' (1828), 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 1833) প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থ। প্রথম দুটি বেদান্ত ও উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে ব্রহ্মবাদ প্রচারার্থে রচিত। ব্রহ্মসংগীতের 'স্মরপরমে(ের অনাদিকারণে" এবং "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর" প্রভৃতি গানে লেখকের একান্ত ব্যক্তি(গত বৈরাগ্য ও বি(ের প্রতি বৈদান্তিক ঔদাসীন্যের প্রকাশ ল(করা যায়।

রামমোহনই প্রথম বেদেশী-দেশী গদ্যকারদের গদ্য চর্চাকে ধর্মপ্রচার বা পাঠ্যবইয়ের সীমা থেকে বাহিরে নিয়ে এসেছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থে'র "অনুষ্ঠান" বা ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছেন কেমন করে গদ্য লিখতে ও পড়তে হয়। তিনি গদ্যের শৈশবেই বেদান্ত উপনিষদ অনুবাদ করে, গদ্যরূপকে একটা শক্ত(-ভিতে প্রতিষ্ঠা

দিয়েছিলেন। গু(গম্ভীর বিষয় বাংলায় আলোচনা যে সম্ভব তা দেখিয়েছিলেন, তথাপি তাঁর রচনা বিতর্কমূলক হওয়ায় সাবলীলতার অভাব ছিল। কৃত্রিম ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার পদন্বায় ও দূরান্বয়দোষ ও যতিপাতে শৃঙ্খলার অভাব এবং সংস্কৃতানুসারী সুদীর্ঘ জটিল বাক্য সর্বত্র সাবলীল ও স্বচ্ছন্দচারী হয়নি।

10.7.1 ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর (1820-1891)

রামমোহন সংস্কৃতপ্রভাবিত গদ্যরচনার যে ধারা সূচনা করেছেন, সেই পথেই ঈ(রচন্দ্রের পদচারণা। রামমোহনের প্রথম প্রেরণা ধর্মসংস্কার, পরে ত্র(মশ তা সমাজসংস্কার থেকে বি(চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর কর্মসূত্রে শি(ার সঙ্গে যুক্ত(হওয়ায় শি(া থেকে সমাজ সংস্কারে লিপ্ত হন। শেষোক্ত(কাজে তিনি নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় প্রতিবাদী প্রতিপ(ের উদ্দেশ্যে তাঁকে ছদ্মনামে একটি সরস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করতে হয়েছিল। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় অবদান গদ্যছন্দ আবিষ্কার। পদ্যের মত গদ্যের ছন্দ আছে এবং তা "পদ্যের ছন্দ-সুষমা অপে(াও স্পষ্টতর ও স্বাভাবিক।" হৃদয়ের সংবেদনার ফলে যে উচ্চারণ সৌকর্যের সৃষ্টি বাক্যের ভেতর স্বাভাবিক যতিপাতে তা ছোট বড় ছেদ সৃষ্টি করায় একটি 'সুষম বাক্যগঠনরীতি' গড়ে ওঠে, বিদ্যাসাগর সেটি 'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস' (1860) রচনাকালে অনুভব করেছিলেন। ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা গদ্যের এক অনন্য শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।" পরেই মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।" দুটি বাক্য বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যায় খুবই গু(ত্বপূর্ণ। তাঁর চরিত্রে অনমণীয় পৌ(ষে "বহমান সংবেদনশীল ক(ণার্দ্র প্রাণ, সর্বংসহ মানবপ্রেম" যেমন দেখতে পাই, তেমনি অন্যদিকে তিনি বাংলার গদ্যভাষায় 'উশৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত(, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত' করে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান করেছেন। শি(ার আধুনিকীকরণ ও বিস্তার, আর্তজনের দুঃখমোহন বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের স্পর্শেই সার্থক হয়ে উঠেছিল। সমাজসংস্কার, ভাষাসংস্কার প্রভৃতি (ে ত্রে বিদ্যাসাগরকে রামমোহনের উত্তরসাধক মনে করা হয়। কিন্তু ভাষাচর্চায় রামমোহন গদ্যকে ব্যবহার করেছিলেন শাস্ত্র ও ধর্মতর্কের প্রয়োজনে, বক্ত(ব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে বহু (ে ত্রেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ বাংলায় অনুবাদ করে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে বিদ্যাসাগর শি(াপ্রসারের উদ্দেশ্যে শি(াদানের সুবিধার জন্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি যে সমস্ত বই অনুবাদ করেছেন, তা ছিল প্রধানত সংস্কৃতে লেখা। এখানে তাঁর রামমোহনের থেকে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ ছিল।

বিদ্যাসাগরের সমস্ত রচনার মধ্যে মৌলিক ও অনুবাদ এই দু'ধরনের বই দেখতে পাই। প্রথম বই 'বাসুদেব চরিত' পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (1853) ভারতীয় রচিত প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দুই খণ্ড) (1855), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' (প্রথম) 1871, ঐ (দ্বিতীয়) 1873, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (রচনা ১৮৫৩, প্রকাশ 1892), 'বিদ্যাসাগর চরিত' (1891) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগরের মরমী হৃদয়ের বেদনা-ভারাত্র(ান্ত অনুভবগুলিকে অসামান্য ভাবরসে প্রকাশ করেছে।

1847 সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে হিন্দুস্থানী 'বৈতাল পচ্চীশী'কে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে অনুবাদ করেন। 'শকুন্তলা' (1854) কালিদাসের নাটকের কাহিনীর গদ্য অনুবাদ। 'সীতার বনবাস' (1860)

ভবভূতির উত্তররামচরিত্রের দুটি অঙ্ক ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অংশবিশেষ সংবলিত। অনুরূপে কয়েকটি ইংরেজি বই থেকেও তিনি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন, যেমন—শ্রীরামপুরের যোশুয়া মার্সম্যানের History of Bengal অবলম্বনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (1848), ঈশপ থেকে 'কথামালা' (1856), সেক্সপিয়রের Comedy of Errors থেকে 'ভ্রান্তিবিলাস' (1869)। অনুবাদেও বিদ্যাসাগরের স্বকীয়তা ছিল। তাঁর অনুবাদ মূলানুসারী হলেও আ(রিক আনুবাদ নয়। এখানে তাঁর সাহিত্যিক সততা ও শুদ্ধ রসবোধ তাঁর রচনাগুলিকে মৌলিক রচনার মতই রমণীয় সুখদ করেছে। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। রচনার কিছু উদাহরণ দিয়ে ভাষা-শিল্পী হিসেবে বিদ্যাসাগরের গদ্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হোল।

(1) "কিয়ৎ(ণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ?"—(শকুন্তলা)

(2) "তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনো প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না।"—(বিদ্যাসাগর চরিত)

বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা ভাষায় পদসংস্থানরীতি, তাই পদবিন্যাসে শৃঙ্খলা এনে ভাষায় শ্রী এনেছিলেন। অনুভব করেছিলেন গদ্যছন্দের অস্তিত্ব, আলোচ্য উদাহরণে যথাযথ বিরামচিহ্(ব্যবহার করে ছন্দোস্পন্দন সৃষ্টি করেছেন, ফলে রচনাংশ অভিধাকে অতিত্র(ম করে অসামান্য রূপ রস লাভ করেছে।

এ ছাড়াও তাঁর বিতর্কমূলক পুস্তিকা আছে। এগুলি তিনি ছদ্মনামে ('কস্যচিৎ উপযুক্ত(ভাইপোস্য', 'ভাইপো সহচরস্য') লিখেছেন। 'অতি অল্প হইল' (1873) 'আবার অতি অল্প হইল' (1873) রচনা দুটি বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্ক-বাচস্পতির প্রতিবাদের উত্তর। 'ব্রজবিলাস' বিধবা বিবাহ বিরোধী ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বক্তৃ(তার উত্তর। এ সব পুস্তিকায় ঈ(রচন্দ্রের সরস কৌতুকপ্রিয়তা, ব্যঙ্গের তী(্ণতা এবং শুভ্র হাস্যরস সৃষ্টির অসামান্য (মতার পরিচয় পাওয়া যায়।

10.7.2 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (1787-1848)

(বাবুসকল) "পোষাক পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন। কাহার দুই কাহার কাহার চারি পাশ বালিশ আছে, পিতলবান্ধা, কেহ বা রূপাবান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহ বা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন"। (নববাবুবিলাস পৃঃ 163)

রামমোহন সাধু গদ্যের ভিত গড়েছেন বিদ্যাসাগর তার ছাঁদ বেঁধে দিয়েছেন। তাঁরা সংস্কৃত প্রভাবিত সাধু গদ্যরীতিকে হাতিয়ার করে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণাকে ও সাহিত্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন। এই সাধু গদ্যতেই রামমোহন যুগের অন্যতম শক্তি(শালী লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গ -ব্যঙ্গ-নক্সা রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একটা যুগ থেকে আরেকটা যুগে উত্তরণকালে চিরাভ্যস্ত সমাজজীবনে একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয়ই। রামমোহন, ভবানীচরণ, এ(ত্রে দুটি ভিন্ন পথের পথিক হওয়ায় ভবানীচরণ প্রাচীন পন্থী 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে প্রধানত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকেই তাঁর হাতিয়ার করেন। উনিশ শতকের প্রথমপাদের মোসাহেব পরিবৃত অশি(ত বাবু সমাজের স্বরূপ উদঘাটনে ভবানীচরণ

বাস্তনানুগ একটি চিত্র উদ্ধৃত অংশ তুলে ধরেছেন। তাঁর পদবিন্যাসের সাবলীলতা গদ্যরীতিকে স্বচ্ছন্দচারী করেছে, ফলে ব্যঙ্গরস সহজেই ফুটে উঠেছে। 'কলিকাতা কমলালয়' (1823) প্রশ্নোত্তরের আকারে কলকাতার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী "জ্ঞাত" করার জন্য নক্‌সা জাতীয় রচনা। 'নববাবুবিলাস' (1825) বাবু সমাজের জীবন্ত বর্ণনা—উপন্যাস রচনার একটি প্রাথমিক খসড়া বলা যেতে পারে। 'দূতীবিলাস' (1825) ও 'নববিবিবিলাস' (1830) গল্প ও নক্‌সার সংমিশ্রণে উশৃঙ্খল বাবুদের মতই নারীজীবন ও তার পরিণতির ছবি এতে এঁকেছেন।

10.7.3 প্যারীচাঁদ মিত্র (1814-1883)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লঘু রঙ্গরসের নক্‌সাজাতীয় রচনার কতকটা অনুসরণ আছে প্যারীচাঁদের (ছদ্মনাম—টেকচাঁদ ঠাকুর) আলালের ঘরের দুলাল-এ। বইটির মধ্যে ব্যঙ্গ প্রণোদিত হাস্যরস সত্ত্বেও বইটি স্মরণীয় হয়েছে তার ভাষা বৈশিষ্ট্যের জন্য। যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সে ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "সেইদিন হইতে বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি।" এ ভাষার ভঙ্গি সহজ ও সরল। সাধু ক্রি(য়ায় সর্বনাম পদের আশ্রয়ে তদ্ভব-দেশী শব্দ বেশি ব্যবহার করে মুখের ভাষার আদলে সর্বজনবোধ্য একটি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। ছোট ছোট বাক্য, কোনো কোনো পদের পুনরাবৃত্তি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ করে ভাষাকে অনেকটা সজীব ও উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। যেমন—

"একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গ(দুটো হন হন করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে ঘোড়া দুটো বেটো ঘোড়ার বাবা—প(ীরাজের বংশ—টঙ্‌স টঙ্‌স ডঙ্‌স ডঙ্‌স করিয়া চলিতেছে—পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে, কিন্তু কোন ক্র(মেই ঢাল বেগড়ায় না।"—

—উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কথ্যরীতি লেখকের আদর্শ। বাংলা গদ্যকে সাবলীল করে তোলবার সাধনায় প্যারীচাঁদের এ হোল সচেতন প্রয়াস।

ইতোপূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আমরা ল(্য করেছি কেরি মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্যোগে চলিত কথোপকথনের গদ্যরচনার প্রচেষ্টা, রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকের' (1853) সংলাপে কথোপকথনের ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। এ সবই বলা যেতে পারে কতগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। প্যারীচাঁদের এ প্রয়াস ছিল গদ্য শিল্পের প্রয়োজনের তাগিদে। তাঁর রচনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত(ছিল না,—যেমন অভিশ্রুতির পরিবর্তে অপিনিহিতের ব্যবহার, একই সঙ্গে ক্রি(য়াপদের সাধু-চলিত রূপের ব্যবহার (ধেয়ে আইল) বা চলিত ক্রি(য়াপদকে সাধুরূপ দেবার চেষ্টা ['উঠতেছেন' (উঠছেন) = উঠিতেছেন], [পালিয়া (পালিয়ে) = পালাইয়া] ফারসি আরবি শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদের প্রথম বই 'আলালের ঘরের দুলাল' (1858) সামাজিক নক্‌সা। কলকাতার নব্য ধনী পরিবারের ছেলে মতিলালের নষ্ট হয়ে যাওয়ার চিত্র বইটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলাল ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শে প্রথম বাংলা উপন্যাসের ল(ণাক্র(ান্ত রচনা। তাঁর অন্যান্য রচনা 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (1859), 'রামারঞ্জিকা' (1861), 'কৃষিপাঠ' (1861), 'অভেদী' (1871) প্রভৃতি। সমকালের পানদোষ প্রভৃতি সমালোচনার পাশাপাশি কৃষি বিজ্ঞানচর্চা ছাড়াও সমাজ-কল্যাণ, নারীশি(া,

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। প্যারীচাঁদ বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহায়তার নারীশি(া প্রচারার্থে সহজ চলিত ভাষায় 1854 সালে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিলেন।

10.7.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ (1840-1870)

কালীপ্রসন্ন তাঁর তিরিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনেই কিছু স্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। গদ্য শিল্পে তাঁর কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপতা সত্ত্বেও আজও মান্য। বিদ্যানুরাগী কালীপ্রসন্ন কিশোর বয়সেই 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (1855) প্রকাশ করেন। সেখানে তাঁর কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এ ছাড়াও সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা মাসিক পত্রিকা, পরিদর্শক নাম দৈনিক, পরিশেষে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদনা করেন। এই সব পত্র-পত্রিকায় তিনি বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধ বিষয়োপযোগী গু(গম্ভীর সাধুভাষায় লিখেছিলেন। নিজে বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশপ্রেমিক কালীপ্রসন্ন তৎকালীন নাগরিক জীবনের উশৃঙ্খলতা, নূতন বিত্তবানদের বিকৃত জীবনযাপন আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ হাস্যরসাত্মক বর্ণনা কলকাতার সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় (প্রথম খণ্ড 1862) প্রকাশ করেছেন। বইটিতে 'বারোইয়ারী পূজা', 'গাজনের সঙ', 'হুজুগ', 'সাত-পেয়ে গ(', 'মাহেশের স্নানযাত্রা' প্রভৃতি নিখাদ চলিতে লেখা কতকগুলি রচনা স্থান পেয়েছে। সহজবোধ্য কথোপকথনের গদ্যরীতি অনুসরণ করলেও প্যারীচাঁদ সাধুর কাঠামোটি একেবারে বিসর্জন দিতে পারেননি। এই দ্বিধাই তাঁর ভাষাকে কিছুটা দুর্বল করেছে। কালীপ্রসন্ন এই ব্যাপারে একেবারে স্বচ্ছন্দ। তাঁর গদ্য ত্রি(য়াপদ বা সর্বনাম, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার ও বাক্য গঠনরীতি সবদিক থেকেই ছিল চলিত অনুসারী। যেমন—"শহরে সকল দোকানেই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘনিয়ে আসচে ততই বাজারের কেনাবেচা বাড়চে, ততই কলকাতা গরম হয়ে উঠচে।"

10.7.5 অ(য়কুমার দত্ত (1820-1886)

ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অ(য়কুমার দত্ত একই বছর জন্মেছেন। দু'জনেরই বাংলা গদ্যভাষা নির্মাণে ও তার সমৃদ্ধিতে সবিশেষ অবদান আছে। গ্রন্থ প্রকাশের দিক থেকে অ(য়কুমারের 'ভূগোল' (1841), 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (1847)-র পুরোগামী হলেও বিদ্যাসাগরের রচনার বহুগামিতা ও সৃষ্টিশীল রচনার প্রাথমিক আয়োজন হিসেবে বিশেষ অবদান জুগিয়েছে। তাঁর গদ্যের শব্দপ্রয়োগ অভিধাকে অতিত্র(ম করে চিত্র-ধ্বনির মাধ্যমে সরস ও অনুভববেদ্য করে তুলেছে। প(ান্তরে জ্ঞানসাধক অ(য়কুমার তাঁর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব মনোভাবের দ(ণ গদ্যকে ব্যবহার করেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি(-শৃঙ্খলায়, জ্ঞানের ও মননের চর্চায়।

বাংলা সাহিত্যে অ(য়কুমারের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা গদ্যে সাধুরীতির একটি মান্যরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে। রামমোহন ও সাময়িক পত্রাদির গদ্যচর্চার মধ্য দিয়ে তা অনেকটা স্বচ্ছন্দও হয়ে উঠেছে। অ(য়কুমারের পদচারণা এই ধারাকেই অনুসরণ করেছে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মপ্রচারার্থে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে অ(য়কুমারকে তার সম্পাদক নিযুক্ত(করেন। তত্ত্ববোধিনী অ(য়কুমারের সংস্কারমুক্ত(বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা রাষ্ট্র, সমাজ ও ইতিহাস

সম্পর্কে সমসাময়িক বাঙালির মননে নূতন আলোক সঞ্চার করেছিল। তাঁর জগৎজীবন সম্পর্কে অপার কৌতূহল ছিল, অধ্যাত্মতত্ত্ব বেদান্তচর্চায় নিবদ্ধ না থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় নৃতাত্ত্বিক জর্জ কুম্বের গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেটি অনুবাদ করেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাত্র(মে 1851 ও 1853 সালে প্রকাশিত হয়। এরই পরিপূরক গ্রন্থ 'ধর্মনীতি' (1856) কুম্বের Moral Philosophy অনুসরণে রচিত।

অ(য়কুমারের অনেকগুলি পাঠ্যবই লিখেছিলেন—'পদার্থবিদ্যা' (1856), 'চা(পাঠ' তিন খণ্ড (1853-59)। শেষোত্ত(বইটিতে লেখক ছোট ছোট প্রবন্ধের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। সাধু গদ্য এতদিন যুত্তি(-বুদ্ধির পথ অনুসরণ করেছে। অ(য়কুমার সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইমারত গড়লেও তাঁর কল্পনা বিলাসেরও যে অভাব ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'স্বপ্নদর্শন' বিষয়ক রূপক কল্পনায় নিবন্ধগুলি।

অ(য়কুমারের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম 1870, দ্বিতীয় 1883) হোরেস হেম্যান উইলসনের 'The Religious Sects of the Hindus' নামের গবেষণা গ্রন্থের অনুসরণে পরিকল্পিত। বইটি ে(ত্র সমী(া নির্ভর।

ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত ধর্ম ও উপধর্ম বহু বিচিত্র রূপের পরিচয় বইটিতে পাওয়া যায়। এতে অ(য়কুমারের তথ্য অন্বেষণ, তার মূল্যায়ন, মনন ও মনীষার পরিচয় আছে। তাঁর ভাষা সরল না হলেও উপস্থাপনার গুণে জড়তাবর্জিত। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস আলোচনায় বৈজ্ঞানিক যুত্তি(নির্ভর ভাষাশৈলীর পুরোধা হিসেবে অ(য়কুমারকে গণ্য করা যায়।

10.7.6 দেবেন্দ্রনাথ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হলেও সংসারবিমুখ ছিলেন না। ভূদেবচন্দ্রের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল হিন্দু ও ভারতীয় সমাজজীবন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার গ্রন্থি রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বত্তৃ(তাধর্মী 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বি(াস' (1859-60), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (1860-61), 'ব্রাহ্মসমাজের বত্তৃ(তা' (1862) অধ্যাত্মভাবে ভাবিত ভাবুক-প্রচারকের রচনা। ভাষায় তাই কবিত্ব ও কল্পনার সৌরভ আছে। তাঁর 'আত্মজীবনী' (1895) ভ্রমণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এতে হিমালয়ের প্রকৃতি-অরণ্যানী, পাহাড়ি গ্রামজীবনের ছবি অত্যন্ত সংযত প্রকাশভঙ্গীতে কাব্যিক সুষমায় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (1882), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (1892), 'আচার প্রবন্ধ' (1895), 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি বইগুলির জন্য সমধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন শাস্ত্রনিষ্ঠ অথচ যুত্তি(বাদী, জ্ঞানে উদার অথচ সুক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, বহুদর্শী সমাজ-সংস্কারক। চিন্তাঋদ্ধ, যুত্তি(নিষ্ঠ মৌলিক সিদ্ধান্তসমৃদ্ধ এই রচনাগুলিতে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা যুগপ্রচলিত পারিবারিক আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা, শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ভারতীয় আদর্শকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনারীতিতে যুত্তি(র ভাব বেশি থাকায় ভাষা হয়েছে আতিশয্যবর্জিত গু(গম্ভীর সংস্কৃতানুগ। কাব্যরসের কিঞ্চিৎ অভাব থাকলেও অপে(াকৃত সরল ও স্বচ্ছন্দ। যেমন—"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব আছে, তাহার অনুশীলন ও সম্বর্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র উনিশ শতকে ভারত ইতিহাস অন্বেষায় যে কয়জন বাঙালি গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। বহুভাষাবিদ এই পণ্ডিত পুরাতত্ত্ব, বিশেষত উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব আলোচনার জন্য স্মরণীয়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রাকৃত ভূগোল', 'শিল্পিক দর্পণ', 'শিবাজী চরিত্র', 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (1851) ও 'রহস্য সন্দর্ভ' (1863) পত্রিকা সম্পাদনায়। প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'তে তিনি বাংলা পুস্তক সমালোচনা প্রবর্তন ও ভৌগোলিক পরিভাষা রচনা করেন। শিল্প, বাণিজ্য, শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধে তিনি নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার বিষয়ের গু(ত্ব ও বক্ত(ব্যের গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রাজেন্দ্রলাল গদ্য ভাষা ব্যবহারের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটিই বঙ্গদর্শন যুগে গদ্যের গোড়াপত্তন করেছে।

10.7.7 বঙ্কিমচন্দ্র (1838-1894)

উনিশ শতকের সূচনা থেকে অর্ধশতাব্দীর গদ্য চর্চার পরিণত রূপ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শনে পাওয়া যায়। বাংলা গদ্যভাষাশিল্পের বিবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাংলা গদ্যচর্চার প্রাথমিক আয়োজন অনেকটা বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করে শু(হলেও রচনায় স্বকীয়তার পরিচয় প্রথম থেকেই ইতস্তত ল(্য করা গেছে। বঙ্গদর্শনের যুগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধিকারে ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর গদ্যের বিবর্তনে সূক্ষ্ম ধারাটি দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী থেকে বিষবৃ(-চন্দ্রশেখর-রজনী-কমলাকান্তের দপ্তরে আবিষ্কার করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব গদ্যরীতির প্রধান বিশেষত্বগুলি ল(্য করলে দেখা যায়— 1. বাক্য ত্র(মশ সরল ও আকারে ছোট হয়েছে(2. প্রকৃতি বা পাঠক সম্বোধন করে রচনার সরসতা ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন(3. অন্তরঙ্গ বর্ণনাভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও 4. সংযোজক ও অসমাপিকা ত্রি(য়ার পরিবর্তে সমাপিকা ব্যবহার এবং নিশ্চয়াত্মক বাক্যের পরিবর্তে প্র(োত্মক বাক্য প্রয়োগ করে রচনায় নাটকীয়তা এবং পদ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আবেগ সঞ্চার করেছেন।

এভাবে বাংলা গদ্যভাষায় শতাব্দীর সূচনা থেকে দেশী-বিদেশী গদ্য লেখক প্রশাসন, সমাজ-সংস্কার, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য আলোচনার প্রয়োজনে গদ্যশিল্পের বিবর্তন ঘটিয়েছেন। অর্ধ শতাব্দীর এই আয়োজনের একটি চূড়ান্ত রূপ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রে পেয়েছি। এখন গদ্য অনেকটা মননের ভাষা, তথ্যের যুক্তি(র বাহন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় আমরা পরবর্তী অংশে পর্যায়ত্র(মে আলোচনা করব।

10.8 গদ্য প্রবন্ধ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা

গদ্য ভাষার বিকাশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধশিল্প গড়ে উঠেছে। প্রবন্ধ বস্তুত সং(প্ত পরিসরে আলোচিত বি(-ষণাত্মক গদ্য রচনা। চিন্তাসমৃদ্ধ স্পষ্ট বক্ত(ব্য উপস্থাপনা প্রবন্ধের মৌলিক ল(ণ। এই প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রয়োজন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন মন, লেখবার ভাষা হিসেবে গদ্যের ব্যবহারযোগ্যতা ও তার জন্য শি(ত পাঠক। উনিশের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ, প্রেমভক্তি(বাদের পরিবর্তে ভৌমচেতনা থেকে বর্তমান সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আকৃষ্টবোধ করে। এ থেকেই

প্রবন্ধ পড়বার মত একটি সামাজিক প্রতিবেশ গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অন্যান্য গদ্যশিল্পের মত প্রবন্ধেরও অনুশীলনের যুগ। দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে প্রথম সার্থক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত বলা যায়।

শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে জগৎ-জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও নানা বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশিত হলেও সে সমস্ত রচনা উপস্থাপনার জড়তা ও ভাষার কৃত্রিমতার জন্য সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠেনি। প্রথম যুগের ধর্ম বিষয়ক বাদানুবাদে সাধারণ পাঠক আকর্ষণ বোধ করেনি। প্রকাশ-নৈপুণ্য, প্রসাধন-সৌষ্ঠব বা প্রসাদ গুণ না থাকায় এ যুগের রচনার পাঠক ছিল নিতান্তই সীমিত। 'প্রবন্ধে' মননশীলতার সঙ্গে ভাবানুভূতির সমন্বয় ঘটায় গদ্যশিল্প হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসকে উন্মেষ, প্রত্যূষ, মধ্যাহ্ন, পরিণতি—চার ভাগে ভাগ করা যায়।

বস্তুত সচেতনভাবে গদ্য প্রবন্ধ রচনার সূচনা যুরোপীয় মিশনারিতে, পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। উন্মেষ ও প্রত্যূষপর্বের গদ্যগ্রন্থ নিবন্ধের পূর্ববর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রেই প্রবন্ধের যৌবনপ্রাপ্তি, তার মধ্যাহ্ন দীপ্তি। ঔপন্যাসিক খ্যাতি তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তাকে অনেকটা আড়াল করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাবন্ধিক হিসাবেও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হতে পারতেন। 1872 খ্রিষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রয়োজনে এবং সুশিক্ষিত পাঠক তৈরির পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে আনন্দের খোরাক যোগাতে লঘু-গুরু ভঙ্গিতে নানা রস-সংযোগে বিচিত্র বিষয় ও মর্জির প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থাবলি—'লোকরহস্য' (1874)—হাস্য রসাত্মক নক্‌শা 'বিজ্ঞানরহস্য' (1875)—বিজ্ঞানকে সাধারণ্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর' (1875), 'বিবিধ সমালোচনা' (1876), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (1879) পরি একত্রে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ভাগ, 1887), ঐ দ্বিতীয় ভাগ (1892), 'সাম্য' (1879), 'কৃষ্ণচরিত্র' (1883), শ্রীমদ্ভাগবতক গীতার ব্যাখ্যা (1881), 'ধর্মতত্ত্ব বা 'অনুশীলন' (1888)। এই তালিকা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র বিষয়চারণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির সাহায্যে তিনি নবযুগের মানুষকে নূতন চিন্তার সঙ্গে জীবনপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ বাস্তবমুখী, পরিচ্ছন্ন নৈয়ায়িক যুক্তিনির্ভর। দেশের, সমাজের মানুষের মঙ্গল কামনায় তিনি অপরাধ অসহিষ্ণু বীর্যশালী শাসক। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যে যেমন কঠোরতা আছে, তেমনি আছে নির্মল ব্যঙ্গ যা মাধুর্য ও স্মিত হাস্যের কোমল স্নিগ্ধতায় পূর্ণ।

এর সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধে যুক্ত(ছিল প্রবল স্বদেশানুরাগ ও দার্শনিকসুলভ চিন্তাশীলতা। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় এক নূতন মানের প্রবর্তক। তিনি সংযম ও শিল্পচেতনা দিয়ে সাহিত্যালোচনায় পশ্চিমী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে সমগ্রের বোধেই সৌন্দর্য উপলব্ধি সম্ভব। শব্দ ও অলঙ্কারের বি(-ষণ সমালোচনার প্রধান অবলম্বন হতে পারে না। স্বভাবানুকারিতা ও সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের প্রাণ। ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন দৃষ্টির সমন্বয়ের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তি(রসের যোগ ঘটিয়েছিলেন। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় তাঁর 'বাঙালির বাহুবল' প্রবন্ধে। লোকরহস্য ও কমলাকান্তের কতিপয় রচনায় তার পর্যাপ্ত পরিচয় আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে য়ুরোপীয় দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে সমাজবাদের প(সমর্থন করেন। সমাজতন্ত্রের প(তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম গ্রন্থ রচনা করলেও কার্ল মার্কস-এর মতবাদের সঙ্গে প্রবন্ধ দুটির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। পরিণত বয়সে তিনি গীতার মর্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন। 'কৃষ(চরিত্র' একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। এখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহাভারত কাল্পনিক আখ্যান নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টিশীল উপন্যাস ও মননসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও সমালোচনার যে ধারা প্রবর্তন করেন তা সে যুগের বহু শিল্পীব্যক্তি(ত্বকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে বঙ্গ দর্শনের আসরে স্থান করে নেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও বঙ্কিমযুগোত্তরকালে যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করে সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন তাঁরা "বঙ্কিমচন্দ্রের পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত("—বঙ্কিমানুসারী লেখকরূপে পরিচিত। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সঞ্জীবচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও, তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীজাতীয় রচনা 'পালামৌ' এক অনন্য সৃষ্টি। রচনাটি কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমষ্টি হলেও কবি-কল্পনার আশ্রয়ে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টিরূপে গণ্য। বাস্তব চিত্রানুসরণে তাঁর গভীর রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি রচনাকে স্বচ্ছন্দ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করে **চন্দ্রনাথের** আবির্ভাব। তাঁর আর্যামির জন্য তিনি এক সময় মুক্ত(দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রতিপ(হয়ে উঠেছিলেন। চন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি প্রধানত শাস্ত্র ও সমাজ সমস্যামূলক। এ(ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রেরণা হলেও, তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক প্রাচীনপন্থী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর দ্বারা। 'হিন্দু-বিবাহ-ব্যবস্থা ও আচার' সম্পর্কিত রচনাগুলি তাঁর উদাহরণ। 'ফুলের ভাষা' 'অনন্ত মুহূর্ত' প্রভৃতি রচনায় তাঁর কল্পনাপ্রবণতার পরিচয় আছে। 'শকুন্তলাতত্ত্ব' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালিদাসের নাটকের মধ্যে তিনি ভারতীয় সমাজ-আদর্শ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি ও রচনারীতিটিকে আত্মসাৎ করে প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হলেও, মননে, উপস্থাপনায় কিছুটা নূতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে সাধু হলেও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও অন্তরঙ্গতায় চলিত গতিছন্দের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর রচনা ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব-সংস্কৃত সাহিত্য আশ্রয় করলেও প্রসাদগুণযুক্ত(—সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও কৌতুকরসসমৃদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ(শিষ্য ও হিন্দুধর্মপ্রচারক। তাঁর বাংলা গদ্য নিবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী বিশিষ্টতা দাবী করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ভারতীয় ঐতিহ্যসন্ধানী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কয়েকটি বই যেমন 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' এবং

বাংলায় কয়েকটি চিঠি লিখেছেন। তাঁর ভাষা কোনো কোনো ে(ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলিত সাধুভাষা হলেও, অনেকটা কথ্যধর্মী। ত্রি(য়াপদ ও সর্বনামের পূর্ণরূপ থাকা সত্ত্বেও কথ্যভাষায় দ্রুতি তাঁর রচনাকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যদান করেছে। অন্যত্র তিনি কথ্যভাষা ও কথ্যরীতি যদৃচ্ছ ব্যবহার করে গদ্যকে অনেকটা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সহজ সর্বজনবোধ্য গতিশীল অথচ পৌ(যে দৃপ্ত করেছেন— কোথাও তারল্য প্রকাশ পায়নি। যেমন, "বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ, কলকাতার ভাষা।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (1864-1919) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরীতিকে অনুসরণ করেও তাঁর স্বকীয়তায় বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সূচনা করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় তথ্যবিচার ও তত্ত্বচিন্তা ও বি(-ষণের সুষম বিন্যাস আছে। তিনি বিজ্ঞান আলোচনা দিয়ে শু(করলেও দার্শনিক উপলব্ধিতে শেষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আলোচনার নিদর্শন আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' ও 'কর্মকথা' তার পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে। এদিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন। 'পৃথিবীর বয়স' ও 'ইংরেজি শি(ার পরিণাম' রচনায় ঘরোয়া ভাব ও পরিহাসপ্রবণতা, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় লেখকের সুগভীর স্বাদেশিকতাবোধের সঙ্গে কবিত্ব প্রকাশিত হওয়ায় রচনাগুলিকে অপূর্ব প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ করেছে। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র গদ্য রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র ছন্দোময় গদ্যের পূর্বসূরী বলা যায়। বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের কবি শিল্পী সত্তাটির মূর্ত রূপ শেষোক্ত(রচনাটির কোমল ভাবাবেগাপ্-ুত বর্ণময় চিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য পর্বের প্রাবন্ধিকদের রচনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে একটি পরিণতির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। এর পর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী প্রাবন্ধিকরা ভাষাকে অসামান্য প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ করে বিষয়ের বৈচিত্র্য ও শিল্পপ্রকর্ষে বাংলা প্রবন্ধে অসামান্য অভিনবত্ব এনেছেন।

10.9 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

বাংলার গদ্যচর্চার শু(ধর্মপ্রচারমূলক গ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক ও বিতর্কমূলক রচনার মধ্য দিয়ে শু(হলেও, সাহিত্যিক গদ্য বিভাগে সাময়িক পত্রিকার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিক্দর্শন' 'সমাচার দর্পণে' তার সূচনা হলেও, বাঙালি গদ্য-শিল্পীর হৃদয় ও মননে সৃষ্ট হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সুদৃঢ় করেছে। রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, অ(য়কুমারের তন্নিষ্ঠ গদ্য সাধনার পরিণত রূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন'।

রামমোহনের বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ—অনুবাদ ভাষ্য—বিতর্কমূলক প্রবন্ধ বাংলা গদ্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর অনুবাদ ও মৌলিক রচনার মধ্য দিয়ে তাতে প্রাণসঞ্চার করেন। অ(য়কুমার তাকে করেছেন মনন ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী। প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন কতগুলি সরস খণ্ডচিত্র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তাকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই গদ্যকে প্রবন্ধে, উপন্যাসে, চিন্তাপ্রধান ও রসপ্রধান—দুটি ধারাতেই সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র কালত্র(মে একাধারে স্রষ্টা ও অপরদিকে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাংলা সাহিত্যকে একটি সুনির্দিষ্ট মানে পৌঁছে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র এদিক থেকে যুগস্রষ্টা। তাঁর প্রভাবে বাংলার প্রবন্ধ ও সমালোচনার ধারা একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

ফলত বঙ্কিম অনুসারী ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকগণ তাঁর বিচিত্র বিষয়চারণার সূত্র ধরে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে ইতিহাস পুরাতত্ত্ব, স্বদেশপ্রীতি এবং সরস রঙ্গ-ব্যঙ্গে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

10.10 অনুশীলনী 2

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর করা হয়ে গেলে 155 পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন
   (ক) 1818 খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা মাসিক..... প্রকাশিত হয় ..... মাসে। ঐ বছরই ..... মাসে ..... সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়।
   (খ) বাঙালি পরিচালিত প্রথম.....পত্র.....1818.....প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন.....।
   (গ) রামমোহন.....শর্মা নামে সেপ্টে ম্বর.....দ্বি-ভাষিক পত্রিকা.....প্রকাশ করেন।
   (ঘ) সমাচার সভা রাজেন্দ্র সম্পাদক.....প্রথম মুসলমান সম্পাদিত.....ও.....দ্বি-ভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।
   (ঙ) ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র ..... প্রকাশ ..... ইংরেজি শি(িত যুবকদের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন.....।
   (চ) রামমোহনের প্রথম প্রেরণা.....পরে ত্র(মশ তা ..... থেকে .....রূপান্তরিত হয়েছে।
   (ছ) বিদ্যাসাগর কর্মসূত্রে.....সঙ্গে যুক্ত(হওয়ায় ..... থেকে .... লিপ্ত হন।

2. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্((✓) দিন।

(ক) 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশকাল	1821, 1822, 1824
(খ) 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক	রামমোহন, ঈ(রের গুপ্ত, অ(য়কুমার দত্ত
(গ) পাদ্রী লসন সংকলিত পত্রিকার নাম	প(াবলী, বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ
(ঘ) 'সোম প্রকাশ' পত্রিকার (1821) সম্পাদক	ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অ(য়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
(ঙ) বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র অনুবাদ প্রকাশ	1860, 1854, 1857
(চ) অ(য়কুমার দত্তের স্মরণীয় বইয়ের নাম	ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, সামাজিক প্রবন্ধ, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।
(ছ) 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা	মধুসূদন দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
(জ) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র রচয়িতা	বিনয় ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র।

3.	(ক) রামমোহন রায়ের দুটি অনুবাদ ও দুটি মৌলিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ ক(ন।	1 2	1 2
	(খ) রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের দুটি বিতর্কমূলক রচনার নাম বলুন।	1 2	1 2

(গ) প্যারীচাঁদ মিত্রের দুটি বইয়ের নাম লিখুন। 1
2
(ঘ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশিত দুটি পত্রিকার নাম 1
2
(ঙ) বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি হাস্যরসাত্মক রচনা ও দুটি ধর্ম ও 1 1
দর্শন জাতীয় বইয়ের নাম উল্লেখ ক(ন। 2 2
(চ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন। 1
2

4. সং(পে পরিচয় লিখুন।
(ক) বঙ্গদর্শন((খ) কমলাকান্তের দপ্তর((গ) পালামৌ((ঘ) শকুন্তলা তত্ত্ব((ঙ) জিজ্ঞাসা((চ) বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা।

10.11 উত্তর সংকেত

অনুশীলনী 1

1. (ক) জাতিকে, সুযোগ তার((খ) ভারতচন্দ্রের, মধ্যযুগীয়((গ) ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ((ঘ) মনোএল-দা-আস্সুম্পসাও((ঙ) 1778 খ্রিস্টাব্দে((চ) মঙ্গল সমাচার মাতিউর((ছ) রামরাম বসু((জ) লিপিমালা।
2. (ক) 1760, (খ) 1800, (গ) 1801, (ঘ) 1802, (ঙ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
3. (ক) কথ্যরীতির, (খ) সংস্কৃতানুসারী।
4. (ক) 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর', ধর্মপুস্তক।
   (খ) মনোএল-দা-আস্সুম্পসাও, 1743।
   (গ) তারিণীচরণ মিত্র 1803।
   (ঘ) ভাষা ও লিপিশি(া, জীবনী, ইতিহাস।
   (ঙ) গোলোকনাথ শর্মা (1802), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (1808)।

অনুশীলনী 2

1. (ক) দিগদর্শন, এপ্রিল, মে, সমাচার দর্পণ।
   (খ) সাময়িক, বাঙ্গাল গেজেটি, জুনে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।
   (গ) শিবপ্রসাদ, 1821, ব্রাহ্মণ সেবধি।
   (ঘ) শেখ আলীমুল্লা, বাংলা, ফারসি।
   (ঙ) জ্ঞানান্বেষণ, 1831, দ(ণানন্দ মুখোপাধ্যায়।

(চ) ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, বি(েচেতনায়।

(ছ) শি(ার, শি(া, সমাজ, সংস্কারে।

2. (ক) 1822, (খ) ঈ(ের গুপ্ত, (গ) প(াবলী, (ঘ) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, (ঙ) 1854, (চ) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, (ছ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (জ) কালীপ্রসন্ন সিংহ।

(3 নং ও 4 নং প্র(ের উত্তর সংকেত এ(ত্রে বাহুল্যমাত্র)

10.12 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (ে ত্র গুপ্ত।
4. বাংলা সাময়িক পত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।